১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

১০ নভেম্বর '৮৩ অমর হউক

১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে
১০ নভেম্বর ২০০৩

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ২
১০ নভেম্বর ২০০২ এর স্মরণ সভার বক্তব্য ❑ ৩

র চ না
এ যুগের এক শ্রেষ্ঠ মানুষ : মহান নেতা এম এন লারমা ❑ সজীব চাকমা ২৯
পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর অস্তিত্বের প্রশ্ন ❑ তাতিন্দ্র লাল চাকমা ৩৬
পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বাস্তবতা : সাধারণ লোকের ধারণা ❑ বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ৪০
ঘুতুষদের অনাক্রমণ চুক্তির প্রেক্ষাপট ❑ কীটো ৪৪
প্রসিত-সঞ্চয় - রবিশংকর - কবিতা চক্রের শত্রুমিত্র চিহ্নিতকরণের নীতি ❑ লক্ষ্মী প্রসাদ চাকমা অনীক ৪৬
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি আহত, জুম্মরা অসহায় ❑ ল্যরা চাকমা ৪৮
গৃহযুদ্ধের কথা ও আজকের ইউপিডিএফ ❑ ডাঃ সুজিত ৪৯
Recognisation of the Traditional Institutions through the 1997 CHT Accord ❑ Rupayan Dewan ৫২

ক বি তা
সবুজ পাহাড়ের কথা ❑ পারমিতা তঞ্চঙ্গ্যা ৫৪ এসো আমরা এক হই ❑ ল্যরা চাকমা শাকুরা ৫৪
তন ম্ নাদ ফুং ❑ য়াংঙান ম্রো ৫৫ আন্দোলন ❑ তনয় দেওয়ান ৫৫
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ❑ সজীব চাকমা ৫৬
জ্বলন্ত আত্মবিশ্বাস ❑ উ উইন মঙ জলি ৫৭
নিমন্ত্রণ ❑ টিপু চাকমা ৫৮ অত্যাচার ❑ অলকা চাকমা জ্যাসি ৫৮

স্মৃ তি চা র ণ
মহান নেতার শিক্ষা ❑ আশাপূর্ণ চাকমা নৈতিক ৫৯

জু ম্ম জা তি উ পা খ্যা ন
মুরুংদের ঐতিহাসিক কিছু তথ্য ❑ রাক্সোয়াপু ৬২

গ ল্প
ঘড়ি ❑ জগদীশ চাকমা ৬৪

প্র তি বে দ ন
মহালছড়ির ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত মানবিক কার্যক্রম ৬৬
আওয়ামী লীগের গড ফাদার তালিকা ও কিছু কথা ৬৭
দিনাজপুরে আদিবাসী উচ্ছেদের প্রতিবাদে সমাবেশ ঃ জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের যোগদান ৬৮
ঘাগড়ায় ইউপিডিএফ কর্তৃক ২ ব্যবসায়ী অপহরণ। সেনা কর্মকর্তার সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির অপচেষ্টা ৬৮
তিন ভুঁইফোঁড় সংগঠনের মিথ্যাচার ৭০
সরকারের ইচ্ছেতেই আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ সমূহকে দূর্বল করে রাখা হয়েছে ৭১
তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ প্রকল্প এবং শুভংকরের ফাঁকি ৭২

আ ন্ত র্জা তি ক
দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ার্ল্ড পার্ক কংগ্রেসে জনসংহতি সমিতি প্রতিনিধির যোগদান ৭৩
ফিলিপাইনে জুম্ম এবং ইগোরোত ইস্যু নিয়ে আলোচনা ফোরাম অনুষ্ঠিত ৭৪
থাইল্যান্ডে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন বিষয়ে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের কর্মশালা ৭৫

এছাড়াও রয়েছে
সংবাদ প্রবাহ

তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

মুল্য: ৩০.০০ টাকা

সম্পাদকীয়

১০ নভেম্বর ২০০৩ মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ২০তম মৃত্যুবার্ষিকী তথা জুম্ম জাতির জাতীয় শহীদ দিবস। ১৯৮৩ সালের এই দিনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ও জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাঁর আটজন সহযোদ্ধাসহ বিভেদপন্থী কুচক্রীদের এক অতর্কিত হামলায় শাহাদাৎ বরণ করেছিলেন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে প্রলুব্ধ হয়ে পার্টির অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা ক্ষমতালোভী 'গিরি-দেবেন-পলাশ-প্রকাশ' চক্র 'দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই' এর শ্লোগান তুলে জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে বিপথে পরিচালনা করার জন্য বিভেদপন্থা অবলম্বন করে গৃহযুদ্ধ অবতারণা করেছিল। তারপরও মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জাতীয় জীবনের চরম দুর্যোগ ও বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে 'ভুলে যাওয়া ও ক্ষমা করা' নীতির ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় অবিচল ছিলেন। কিন্তু মহান নেতার ক্ষমা করা নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে চরম ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছিল বিভেদপন্থী কুচক্রীরা। তাদের চরম বর্বরতা ও অপরিণামদর্শীতার কারণে জুম্ম জাতির উজ্জ্বল নক্ষত্রকে হারাতে হলো অকালে। তারপর রক্ত ঝরেছে আরও অনেকের। পরে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার সুযোগ্য নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করে ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধের অবসান করেছিল।

শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র ও নির্যাতনের কারণে জুম্ম জনগণের আন্দোলন সাময়িকভাবে ঝিমিয়ে পড়লেও আবারও দুর্বার গতিতে গড়ে উঠে। বাধ্য হয় শাসকগোষ্ঠী আলোচনার টেবিলে বসে সমাধানের পথ খুঁজতে এবং সামরিক সমাধানের পথ হতে সরে আসতে। ফলে তিনটি সরকারের সাথে ধারাবাহিক আলোচনার সূত্র ধরে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে শান্তি, উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ উন্মোচিত হয়।

শেখ হাসিনার সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের এক পর্যায়ে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া থেকে সরে এসে কল্প রঞ্জন চাকমা, দীপংকর তালুকদার, বীর বাহাদুর ও চিংকিউ রোয়াজার মতো জাতীয় বিশ্বাসঘাতক ও দালালরা চুক্তিবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পড়ে। তারা ইউপিডিএফ এর সাথে যোগসাজশ করে চুক্তিকে ল্যাঙ মেরে জনসংহতি সমিতিকে কাবু করার নীতি অবলম্বন করে। কিন্তু নির্বাচনে চিৎপটাং হয়ে তারা লেজ গুটিয়ে নেয়। পরে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট সরকার এসে এই চুক্তিকে লঙ্ঘন করার মাধ্যমে নতুন করে কালো মেঘের ঘনঘটায় পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি, উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে ঢেকে দেয়। ওয়াদুদ ভূঁইয়ার মতো চরম সাম্প্রদায়িক গডফাদারকে দিয়ে ভূমি বেদখল, হত্যা, সাম্প্রদায়িক হামলা ও সন্ত্রাসীর মাধ্যমে এক অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। শেখ হাসিনা সরকারের আমলে সৃষ্ট ইউপিডিএফকে যথারীতি পৃষ্ঠপোষকতা ও মদত দিয়ে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম জনগণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। একদিকে ইউপিডিএফকে দিয়ে অপহরণ ও সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটানো এবং অন্যদিকে সেই অপহরণ বা সন্ত্রাসী ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির নীতি এখন দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সামরিক বাহিনী তাদের পকেট সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোকে দাঙ্গা ও সন্ত্রাসে মদত যুগিয়ে যাচ্ছে। সেনাবাহিনী, সেটেলার ও সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলো সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে পার্বত্য চট্টগ্রামের আকাশ বাতাস ভারী করে তুলছে।

চুক্তি লঙ্ঘন করে প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখায় তার পোষ্যপুত্র ওয়াদুদ ভূঁইয়া ও তার গং চুক্তিবিরোধী ও সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ড লাগামহীনভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশের সচেতন, মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ ও সংগঠন এবং প্রগতিশীল শক্তিকে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসা আজ জরুরী। ❑

**'ক্ষমা গুণ,
শিক্ষা গ্রহণের গুণ,
পরিবর্তিত হওয়ার গুণ-
এই তিন গুণের অধিকারী
না হলে প্রকৃত বিপ্লবী
হওয়া যায় না।'**

- মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

**পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী
সকল ষড়যন্ত্রকারী ও
প্রতিক্রিয়াশীলদের নির্মূল
করতে ঐক্যবদ্ধ হউন।**

-পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

**আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার
প্রতিষ্ঠার
লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি
বাস্তবায়নের সংগ্রামে
সামিল হউন।**

- পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

**পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন
বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ
থেকে ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে
অপসারণ করতে হবে।**

- পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

গত ১০ নভেম্বর ২০০২ খাগড়াছড়ি জেলা সদরের মহাজনপাড়াস্থ এম এন লারমা ভাস্কর্য পাদদেশে প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে এই স্মরণ সভায় আমন্ত্রিত অতিথিদের প্রদত্ত বক্তব্য তুলে ধরা হলো। উল্লেখ্য যে, আরও কয়েকজনের বক্তব্য এখানে সন্নিবেশিত করতে না পারার কারণে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। - তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মাধ্যমে এম এন লারমার মৃত্যু দিবস পালন করতে হবে।

সঞ্জীব দ্রং, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

এদেশের শোষিত, নিপীড়িত মানুষের অন্যতম নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আজকের এই শোক সভার মাননীয় সভাপতি, ঢাকা থেকে আগত জাতীয় নেতৃবৃন্দ, সুধীমন্ডলী এবং আমার পাহাড়ের প্রিয় মানুষেরা। আমি প্রথমে প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করছি। আমি যে এলাকা থেকে এসেছি তা বাংলাদেশের গারো পাহাড় - যে এলাকার মানুষের কথা বলার চেষ্টা করছি, সামান্য লেখালেখির চেষ্টা করছি; সেই দুঃস্থ মানুষের, বঞ্চিত মানুষের, শোষিত মানুষের নিপীড়ন, নির্যাতনের চিত্র এবং তাদের সংগ্রামের কথা আমি আপনাদের শুনাতে চাই। প্রথমে বলতে চাই - আমরা যারা পাহাড়ের মানুষ, সংখ্যালঘু মানুষ, আমরা বঞ্চিত। আমাদের সংগ্রামের কোন শেংষ নেই; আমাদের সংগ্রাম চিরকালের। যেমনি করে এই খাগড়াছড়ির পাহাড় থাকে, চেঙ্গী নদী থাকে, মাইনী নদী থাকে, লোগাং নদী থাকে - এই নদীগুলো যেভাবে বয়ে যায়, পাহাড় যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সে রকম আমাদের সংগ্রাম চিরকালের। তাই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুতে সংগ্রাম শেষ হয়ে যায় না। যে চুক্তি আপনারা করেছেন সেই চুক্তির মধ্য দিয়ে আপনার আমার বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শেষ হয়ে যায় না। কেননা আমরা লড়াই করছি এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

আপনারা হয়তো জানেন আমি লেখালেখি করার চেষ্টা করছি। পাহাড়ের এই মানুষের, আদিবাসী মানুষের দুঃখ বেদনার কথা, বঞ্চনার কথা, পাহাড়ের মানুষের অধিকারের কথা বলার চেষ্টা করছি। এই ভূমির উপরে আপনার যে অধিকার, জন্মভূমির উপর যে অধিকার, এই বনের উপর যে অধিকার, সেই অধিকারের কথা বলার চেষ্টা করছি। প্রিয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আপনার আমার অধিকারের কথা বলতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর যে সংবিধান, সেই সংবিধানের পাতায় আপনার আমার অধিকারের কথা বলবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সংবিধানে অন্তত পাহাড়ী মানুষের অধিকারের কথা না থাকুক অস্তিত্বের কথা এক লাইন, দুই লাইন লেখা থাকুক। কিন্তু বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে টগবগ করা রাজনীতিবিদরা সেই সময় ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কথা শুনেন নাই। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কবিতার মত কথা বলতেন জাতীয় সংসদে। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন না, চাকমা ছিলেন, পাহাড়ী মানুষ ছিলেন কিন্তু কবিতার মতো সুন্দর বাংলা বলতে পারতেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তিনি '৭২ সালে পাশ হওয়া সংবিধান সম্পর্কে বলেছিলেন - সংবিধানে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের কথা লেখা নেই। পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, কর্নফুলী নদীর তীরে, সুরমা নদীর তীরে যে সব শ্রমিক জনতা নৌকা বেয়ে জীবন অতিবাহিত করে তাদের কথা বাংলাদেশের সংবিধানে লেখা নেই। কিন্তু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কথা সংবিধান রচনার সময় কেউ শুনেন নাই। সংসদ সদস্যরা তার কথা শুনেন নাই, সেই সময় যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারা তার কথা শুনেন নাই। পরবর্তীকালে দেখতে পাই বাংলাদেশের সংবিধান বার বার খন্ডিত হয়েছে, সংশোধিত হয়েছে এবং বহু ন্যাক্কারজনক, বহু সাম্প্রদায়িক, অগণতান্ত্রিক ধারা সংবিধানে যুক্ত হয়েছে। তাহলে বলতে পারি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কথা যদি শুনতেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে যদি এই সংখ্যালঘিষ্ঠের কথা নাকচ না করে দিতেন তাহলে হয়তো বা বাংলাদেশের আজকের এই অবস্থা হতো না।

আমাদের লড়াই বাঙালী বা কোন জাতির বিরুদ্ধে নয়। আমাদের লড়াই শাসকদের বিরুদ্ধে, শোষকদের বিরুদ্ধে। যারা বাংলাদেশের নিপীড়িত ও

শোষিত নিরীহ মানুষদের শোষণ করে শাসন করার নামে তাদের বিরুদ্ধে। আপনারা যে লড়াই করছেন পার্বত্য চট্টগ্রামে, লড়াইয়ের এক পর্যায়ে এসে যে চুক্তি আপনারা করেছিলেন আজ থেকে পাঁচ বছর আগে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর আজ পাঁচ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। সেই পার্বত্য চুক্তিতে যে অধিকার আপনাদের জন্য ছিল সেটুকু বাস্তবায়নের জন্য আমাদের লড়াই করতে হবে। চুক্তিতে অনেক অধিকার প্রদান করা হয় নাই। কিন্তু যে অধিকার প্রদান করা হয়েছে সেই অধিকার বাস্তবায়নের লড়াইয়ে আপনাদের মাঝে আজকের এই শোকের দিনে শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে শুরু করতে হবে। চুক্তির একটা বিষয় ছিল যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে মাত্র ৬টি ক্যান্টনমেন্ট ব্যতীত অন্য সকল ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হবে - এই ধারা যদি বাস্তবায়িত হতো তাহলে হয়তো বা আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, গণতান্ত্রিক সমাজ এগিয়ে যেতে পারতো। আমি শুধু সংক্ষেপে যেটা বলতে চাই, সেটা হলো নতুন সমাজ গড়ার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আপনার আমার জীবনে এই খাগড়াছড়ির পাহাড়ে, রাঙ্গামাটির পাহাড়ে, বান্দরবানের পাহাড়ে কোনদিন ফিরে আসবেন না। কিন্তু তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন - মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, পাহাড়ের উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বাধীনভাবে আমরা জুমচাষ করতে পারবো। জুম্ম নারীরা তাদের ক্ষেতে খামারে নিরাপদে কাজ করতে পারবে। দীঘিনালার পথে যেতে যেতে বা পানছড়ির পথে যেতে আমাদের কোন জুম্ম নারীকে অপমানিত, লাঞ্ছিত হতে হবে না শুধু পাহাড়ী হওয়ার কারণে বা চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা হবার কারণে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এমন সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখতেন যেখানে আগামী দিনের পাহাড়ী শিশুরা তাদের নিজেদের জীবন নিয়ে, ভাষা নিয়ে, সংস্কৃতি নিয়ে বিকশিত হতে পারবে স্বাধীন বাংলাদেশে; আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার মানে বিচ্ছিন্নতাবাদ নয়। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার হলো তার জীবনের উপর যে অধিকার সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার এই মৃত্যু দিবস পালিত হওয়া সম্ভব। পালিত হওয়া সম্ভব নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। আজকের যে সময়, এই সময়কে আগামী দিনগুলোর জন্য উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে। আগামী দিনগুলোতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আর ফিরে আসবেন না। কিন্তু পাহাড়ের শিশুরা ও সন্তানেরা বার বার এই পাহাড়ে ফিরে আসবে। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তাদের জন্য ক্ষেত্র রচনা করতে হবে, দেশহীন মানুষের যে কলঙ্ক সেটা ঘুচাতে হবে।

রাঙ্গামাটির যে বিস্তীর্ণ হ্রদের জল, হাজার হাজার একর জমি, ধানী জমি, পাহাড়ী গ্রাম আবার ফিরে পেতে হবে। আমি যখন রাঙ্গামাটিতে আসি সেই হ্রদের দিকে তাকাই বা যখন খাগড়াছড়ি আসি সেই লুসাই পাহাড়ের দিকে তাকাই, পাহাড়ের গ্রামের দিকে তাকাই তখন আমার খুব কষ্ট হয়। পাহাড়ের মানুষের দিকে দেখলে, পাহাড়ী শিশুদের দিকে তাকিয়ে দেখলে আমার খুব কষ্ট হয়। যে পাহাড়ের নাম গারো পাহাড় সেই পাহাড় আর গারোদের নাই। আমি শৈশবে যে গারো পাহাড় দেখেছি, আমার মা বা দাদী যে গারো গ্রাম দেখেছিলেন সেই গারো গ্রাম আর নাই। যে থানায় আমরা বাস করি তাতে আমরা মাত্র ১৫ বা ১০% বাকী সবাই বাঙ্গালী এবং অন্যান্য আরো থানা আছে, পাহাড় আছে, গারোদের গ্রাম আছে, যেখানে গারোরা আরো সংখ্যালঘিষ্ঠ। পার্বত্য চট্টগ্রামকে এরকম একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য শাসকগোষ্ঠী চেষ্টা করছে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম যেন কোন দিন গারো পাহাড় না হয়, এখানে যেন পাহাড়ী মানুষেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে, পাহাড়ী মানুষের বৈশিষ্ট্য আগের মত থাকে, সংরক্ষিত থাকে। এই তিন জেলায় পাহাড়ী মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি ৯০% থাকে তাহলে তো রাষ্ট্রের, এই বাংলাদেশের ক্ষতির কোন কারণ নাই - মঙ্গল হওয়া ছাড়া।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সাংঘাতিক বদনাম আন্তর্জাতিক মহলে। আমরা যারা বাইরে যাই তারা বুঝতে পারি অথবা বাঙ্গালীরা যারা বাইরে যান তারা বুঝতে পারেন বাংলাদেশের সুনাম একেবারে নীচের দিকে। বাংলাদেশ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মহলের ধারণা খুবই খারাপ। এই পাহাড়ী মানুষগুলোকে যদি তাদের অধিকার প্রদান করা হয়, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দেয়া হয়, তাদের ভূমির উপরে যদি অধিকার প্রদান করা হয়, নদীর উপর যদি অধিকার প্রদান করা হয়, আকাশ-বাতাসের উপর যদি অধিকার প্রদান করা হয় তাহলে নিশ্চয় বাংলাদেশ রাষ্ট্র একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে, একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারবে। আগামী দিনগুলোতে আমাদের সন্তানদের জন্য, অনাগত পাহাড়ী শিশুদের জন্য একটি সুন্দর সমাজ, সুন্দর রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে আমাদের আজকের এই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার শোক দিবসে তাঁকে স্মরণ করে তার স্বপ্ন প্রতিষ্ঠা করা বাস্তব হতে পারে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্বপ্ন দেখতেন - শোষণহীন একটি সমাজ, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার। যেখানে পাহাড়ী জননী, শিশু ও মানুষ তাদের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে। সে সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাঁকে স্মরণ করা সম্ভব; তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। □

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে এখন কালো মেঘের ঘনঘটা।

সুধাসিন্ধু খীসা, কেন্দ্রীয় সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ১৯তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণ সভার সংগ্রামী বন্ধুবর সভাপতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের দুঃখী মেহনতী মানুষের বন্ধু যারা এদেশে অবস্থান করেন। যারা আমাদের এই দুঃখের সময়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছেন, আলাপের মাধ্যমে, সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের সাথে আছেন সেই ঢাকা থেকে আগত সম্মানিত নেতৃবৃন্দ, শুভাকাঙ্খীবৃন্দ, বন্ধুগণ, পার্টির অঙ্গ-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের দুঃখী মা, ভাই-বোনেরা আমি আপনাদের এই শোক দিবসে, দুঃখের দিবসে জানাচ্ছি সংগ্রামী শুভেচ্ছা।

আজকে কিভাবে বলবো আমি ভেবে পাচ্ছি না। অনেক কথা বলার আছে। আমি যেটুকু জানি তার কিছু না বললেই নয়। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সম্পর্কে কি কি বিশেষণ কিভাবে লাগাবো ভেবে পাচ্ছি না। ছোটবেলা থেকে ওনাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমার ছোট কাকা সুধাকর খীসা ওনার বন্ধু ছিলেন। আমি যখন ছোট ছিলাম তিনি তখন থেকে আমাদের বাড়ীতে আসতেন এবং আমিও নিজেই যখন পূর্ণ একটা মানুষ হলাম তখন একই দর্শন, একই রাজনীতি নিয়ে কাজ করেছি। সেজন্য ওনাকে কিভাবে বললে যথার্থ বিশেষণ হবে তা আদৌ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমি জানি তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, চিন্তার গভীরতা কত ব্যাপক ও বিস্তৃত। দর্শন থেকে শুরু করে সমাজ বিজ্ঞান, রণনীতিগত বিজ্ঞান, রণকৌশলগত বিজ্ঞান- বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে তাঁর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সব চাইতে আমি দেখি ওনার চিন্তার গভীরতা। তিনি সব চাইতে চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করে আমাদের বুঝাতেন। আমার মনে হয়- এই জ্ঞানের গভীরতার কারণে, আপোষহীন আন্দোলনের কারণে তাঁর এই অস্বাভাবিক মৃত্যু।

আপনারা জানেন যে, সমগ্র বিশ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলো নিয়ে বিশ্বের পরাশক্তিরা খেলা খেলে। বিশ্বের তাবৎ ধনী দেশগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশ্চাৎপদ দেশ নিয়ে যেভাবে খেলা খেলে আজ এদেশের বড় জাতি বা পুঁজিপতি বা শাসকগোষ্ঠীরা আমাদের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি নিয়ে খেলা খেলে। তিনি মেহনতী মানুষের কথা বলতেন, মেহনতী মানুষের বন্ধু ছিলেন। আমি বলি তাঁর মৃত্যু সেই মেহনতী মানুষের কথা বলতেন বলে। যুগে যুগে প্রগতিশীলতার সাথে প্রতিক্রিয়াশীলও ছিল সেটা আপনারাও জানেন। সে কারণেই ওনার মৃত্যু। তিনি ছিলেন মেহনতী মানুষের, দুঃখী মানুষের একনিষ্ঠ বন্ধু। এই পৃথিবীতে, এই বিশ্বব্রহ্মান্ডে আজকে যে ভেদ; শ্রেণীভেদ, বর্ণভেদ, জাতিভেদ, লিঙ্গভেদ কত ধরনের ভেদাভেদ এসেছে। যেদিন থেকে মানব সমাজে সম্পত্তি এসেছে সেদিন থেকে এই ভেদাভেদ। এই ভেদাভেদকে তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন - এটাই তাঁর অপরাধ?

আমাদেরও সেই তখনকার সময়ে যুবসংঘ, টিপিপি, রামাহ্লাপা প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিক্রিয়াশীলতার সাথে মোকাবেলা করতে হয়। বর্তমান সময়ে ইউপিডিএফ সেই প্রতিবিপ্লবের ধারাবাহিকতা। এব্যাপারে এদেশের মানুষেরা, বুদ্ধিজীবীরা, জ্ঞানী লোকেরা, মহৎ লোকেরা বোধ হয় বেশী জানেন না। কারণ এ দেশের মিডিয়া, সংবাদপত্র মেহনতী মানুষের অনুকূলে নয়; পার্বত্য চট্টগ্রামের দুঃখী মানুষের অনুকূলে নয়। ফলে কথাগুলো ওনারা এমনভাবে লিখে দেন যেন পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষেরা সন্ত্রাসবাদী, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষেরা সাম্প্রদায়িক। মিডিয়াগুলো কোন না কোনভাবে আমাদেরকে আঘাত করার জন্য লেগে থাকেন। এই সমস্ত কারণে আজকের এই দিনটা, এই ১০ই নভেম্বর আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন।

এ সময় আমাদের যে বন্ধু, ঢাকায় যারা অবস্থান করেন, জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতি করেন তারা এসেছেন বলে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আমি মনে করি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে অত্যন্ত কালো মেঘের ঘনঘটা। একদিকে সরকার বলছে নীতিগতভাবে চুক্তি মেনে নিয়েছেন। অন্যদিকে এই চুক্তিকে বানচাল করার জন্য নানা ষড়যন্ত্র চলছে। যেদিন আমরা চুক্তি করেছি, আমি নিজেই পার্টির সিদ্ধান্ত মোতাবেক অস্ত্র জমা দিতে এসেছি। যখন পেরাছড়ায় আমাদের অস্ত্রগুলো জমা দিয়ে আমার সহযোদ্ধা বন্ধুদের স্ব স্ব ঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি সে সময় নানা দিক থেকে

চুক্তিবিরোধীদের দ্বারা আমাদের গায়ে ঢিল ছুঁড়ে মারা হয়েছিল। একদিকে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য চারিদিকে সেনাবাহিনী অপরদিকে এই ঢিল ছোঁড়া। মূলতঃ বিষয়টা হচ্ছে - আজকে এম এন লারমার মৃত্যু দিবসের কারণগুলো এখানেই নিহিত। যে সমস্যাগুলো আজকে দেখা যাচ্ছে - একদিকে বর্তমান সরকার বলছে নীতিগতভাবে চুক্তি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কার্যতঃ আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে চুক্তির একের পর এক ধারা লংঘন করে হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একজন মন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল সেখানে করা হল একজন উপমন্ত্রী। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান একজন উপজাতি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে আসা একজন সেটেলারকে এমপি বানিয়ে তাকে উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হল। প্রতিনিয়ত প্রতি বাসে প্রতিদিন শত শত সেটেলার এখানে আসছে এবং যারা আসছে তারা সাথে সাথে ভোটার তালিকাভুক্ত হচ্ছে। ভোটার তালিকার সময় যদি কোন পাহাড়ী শিক্ষক তাদেরকে তালিকাভুক্ত না করেন তবে সাথে সাথে বাঙ্গালীকে দিয়ে অবৈধভাবে ওদের তালিকাভুক্ত করা হয়। এ ব্যাপারে আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য হিসেবে সরকারের সাথে কথা বলেছি। কিন্তু দেখেছি ঢাকার অনেকেরই এ ব্যাপারে কোন চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা নেই। বিগত কিছুদিন আগে শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুক সাহেবের কাছে অনেক আশা নিয়ে উৎসাহ নিয়ে দেখা করতে গিয়েছিলাম। এর আগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের সাথে কথা বলেছি। সর্বশেষ ওখানে যখন গেলাম উনি বললেন যে, এই আঞ্চলিক পরিষদ এটা কি? এটা কি উপজেলা থেকে ছোট না বড়? আমি এবং আমার সাথে যারা ছিলেন সবাই অবাক হয়ে গেলাম। কারণ আমি জানি যে, ওসমান গণি সাহেবের ছেলে ডঃ ওসমান ফারুক। ডঃ ওসমান গণি ছিলেন আমাদের সময়ের ভিসি। এজন্য আমরা একটা বিরাট আশা নিয়ে গেছি।

আমি জানি যে এখানে এদেশে জাত্যাভিমানটা অত্যন্ত বড়। আওয়ামী লীগ হচ্ছে উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী। অন্যান্য ভাষাভাষী লোকগুলোকে উনারা পিপীলিকার মত মনে করে। বিএনপি হল কট্টর মুসলমান আর যারা মুসলমান নয় তাদেরকে অত্যন্ত হেয় চোখে, তুচ্ছার্থে দেখে। তারপরও আমার আশা ছিল উনি (শিক্ষামন্ত্রী) একজন ডক্টরেট ডিগ্রিধারী, উনার বাবা একজন ভিসি ছিলেন, সংস্কৃতিতে, ধ্যানে-ধারণায়, চিন্তা-চেতনায় উনি নিশ্চয় একজন মহৎ ব্যক্তি হবেন। এই মহৎ ব্যক্তির দেখা পাওয়ার জন্য অনেক অনেক চেষ্টা করে ১ অক্টোবর '০২ কথা বলার সুযোগ পেলাম মাত্র পাঁচ মিনিট। দুঃখের সাথে বলতে হয়, প্রাইমারী স্কুলের যে অবস্থা, আমাদের শিক্ষার যে অবস্থা তা ভালভাবে বলার সুযোগ আমার হয় নাই। উনি বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে। আমি সচিবকে পাঠাবো ওনার সাথে কথা বলুন।' আর তো কিছু বলা যায় না হাজার হলেও উনারা মন্ত্রী; ক্যাবিনেট মন্ত্রী!

এই যে অবস্থা সে জন্য আমার মনে হয় আজকের ১০ নভেম্বরে আমাদের শপথ গ্রহণ করা উচিত যে, এম এন লারমার যে নীতি আদর্শ, যে চিন্তা-চেতনা দিয়ে গেছেন, মেহনতী মানুষের জন্য যে কাজ করে গেছেন সেই চিন্তা ব্যতীত এই চুক্তি বাস্তবায়ন হতে পারে না এবং এই চিন্তা ব্যতীত আন্দোলন শক্তিশালী হতে পারে না। আর এখানে আজ পর্যন্ত সরকারের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন কর্মকর্তা যখন আসেন তখন প্রথমেই কট্টর বাঙ্গালী হন, তারপর হন মুসলমান তারপরে মানুষ। আমি সেজন্য জনৈক এক ভিসিকে বলেছি, দেখেন, আপনার সামনে শরণার্থীদের (দীঘিনালায়) যে টানাহেঁচড়া করছে, উলঙ্গ করে রাস্তায় টানাটানি করছে; আপনার তো মা-বোন আছে, আপনার মা-বোনকে উলঙ্গ করে যদি এভাবে টানাহেচড়া করা হয়, তাহলে আপনার কি মায়া লাগবে না? ওরা গরীব হতে পারে, চাকমা হতে পারে, ওদের বাপ-ভাইগুলো গেছে কাজে, কিন্তু ওরাওতো মানুষ! অথচ তাদের মা-বোনকে স্কুল ঘর থেকে টানাহেচড়া করেছে। উলঙ্গ অবস্থায় টানাহেচড়া করল।

এখানে চলছে গভীর ষড়যন্ত্র। সেই ষড়যন্ত্রটা হচ্ছে চুক্তি বাস্তবায়ন না করে ওখান (সমতল জেলাগুলো) থেকে মানুষ নিয়ে এসে আবার সেটেলারদের দিয়ে সেটেলারদের নির্বাচিত করে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে পাহাড়ীদেরকে পিপীলিকার মত মারার জন্য, আমাদের জায়গা জমি কেড়ে নেওয়ার জন্য। এই ষড়যন্ত্র সেই ১৯৪৭ সালে শুরু হয়েছিল অমুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার জন্য। ১৯৪৭ সালে ২.৫% ছিল বাঙ্গালী, ১৯৬৮ সালে ১১%, ১৯৭৪ সালে ২৫%, ১৯৮১ সালে ৪১%, বিগত ১৯৯১ সালে এসে ৪৮% হল। এখন মনে হয় ওরা ৫৫% আর আমরা ৪৫%। এই সরকার যে প্রচন্ড গতিতে সেটেলার আনা শুরু করেছেন এভাবে আগামী ৫ বৎসর পর ৬০% এর উপরে তারা হয়ে যাবে। এহেন অবস্থায় আমরা একটু কিছু বললেই ওরা বলবে আমরা সাম্প্রদায়িক, বাঙ্গালী বিদ্বেষী। সেজন্য আগে বলেছি যে, আমরা বাঙ্গালী বিদ্বেষী নই।

এই জিনিসটা আপনাদের বুঝতে হবে যে, ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান ভাগ হয়েছে। পাঞ্জাবী পুঁজি এবং মাড়োয়ারী পুঁজির দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ হলো ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টি। সেখানে হিন্দু-মুসলিম যে দাঙ্গা সে দাঙ্গাটা আজও আপনারা প্রত্যক্ষ করছেন এখানে। পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের সাথে উঠতি বাঙ্গালী বুর্জোয়ারা যখন প্রতিযোগিতায় পারছিল না তখন তারা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এই বাংলাদেশ সৃষ্টি করলো। বাংলাদেশ সৃষ্টির পরে এই পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষকে এখান থেকে তাড়ানোর জন্য

সেই '৪৭ সালে প্রণীত নীতিটা আজকে মহীরূহে পরিণত হয়েছে। তাই আজকে চারিদিকে শুধুই দেখি - প্রশাসনে যারা আছে সামরিক বা বেসামরিক সবাই যেন পাহাড়ীদের চক্ষু বাঁকিয়ে তাকায়। এই সমস্ত বিষয় দেখে এটাই মনে হয় যে, এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। এজন্য এই মুহূর্তে জাতীয় পর্যায়ের যে নেতৃবৃন্দ বিশেষতঃ যারা মেহনতী মানুষের পাশে ছিলেন উনাদের সঙ্গে আমাদের প্রয়াত নেতা ও আমাদের মধ্যে একটা যোগসূত্র অনেক আগে থেকেই ছিল। এই আন্দোলনের পিছনে ওনাদের অবদান আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। তাই আজকে আপনারা এই সংকটময়, কঠিন একটা মুহূর্তে আমাদের পাশে এসেছেন। আপনারা অত্যন্ত যথাসময়ে এসেছেন। আপনাদের সুস্পষ্ট মতামত শুনার জন্য আমি আর বক্তব্য বেশী বাড়াচ্ছি না। ধন্যবাদ। □

আমরা সিধু কানু'র বংশধর, আমরা এম এন লারমা'র বংশধর, আমরা চুপ থাকতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথ সরেন,
সহ সভাপতি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

স্মরণ সভার মাননীয় সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট জুম্ম জনগণের সংগ্রামী জননেতা, জনসংহতি সমিতির সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান সন্তু লারমা। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী সভাপতি কমরেড মঞ্জুরুল আহসান খান, গণ ফোরামের প্রেসিডিয়াম সদস্য পংকজ ভট্টাচার্য, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কমরেড হায়দার আকবর খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সম্পাদক ও আদিবাসীদের সুহৃদ অত্যন্ত পরিচিত সঞ্জীব দ্রং, বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আপনাদেরকে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, উত্তর বঙ্গের ১৩ লক্ষ আদিবাসীদের পক্ষ হতে আমি বিপ্লবী অভিনন্দন জানাই।

আজকে এই স্মরণ সভায় প্রথমে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে চাই জুম্ম জনগণের কিংবদন্তী নেতা প্রয়াত এম এন লারমাকে এবং তার সঙ্গে যারা শহীদ হয়েছেন সেই শহীদদেরকে। মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। এই স্বাধীনতা যুদ্ধে শুধু এদেশের বাঙ্গালীরা অংশগ্রহণ করেনি; এদেশের শত শত আদিবাসীরা - উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা, গারো পাহাড়ের আদিবাসীরা, সিলেটের আদিবাসীরা, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা অংশগ্রহণ করেছিল। তারা শুধু অংশগ্রহণ করেনি রক্ত দিয়েছে, শহীদ হয়েছে, মৃত্যুবরণ করেছে। বন্ধুরা আমার, আমাদের আকাঙ্খা ছিল এই দেশ স্বাধীন হবে এবং এই স্বাধীন দেশে অন্যান্যদের মত আদিবাসীরাও তাদের অধিকার পাবে, লেখাপড়ার সুযোগ পাবে, ভূমি রক্ষার অধিকার পাবে, চাকরি-বাকরি করার অধিকার পাবে। কিন্তু আমরা কি দেখলাম? আদিবাসীরা বঞ্চিত হয়েছে। শুধু এখানে নয়, বাংলাদেশের সমগ্র আদিবাসীরা আজকে নিজস্ব ভিটা থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে, বিতাড়িত হচ্ছে, তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই হচ্ছে আদিবাসীদের অবস্থা।

আমাদের মহান সংবিধানে ইসলাম ধর্মকে সংযুক্ত করে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়েছে। সেদিন থেকে আমরা বুঝেছি এদেশের আদিবাসীদের অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে। এদেশের সংখ্যালঘুরা মানুষের অধিকার হারিয়েছে। আমরা যে আশা নিয়ে যুদ্ধ করেছিলাম সেই আশা গুঁড়ে বালি হয়েছে। আমি স্মরণ করে দিতে চাই, এ দেশের মানুষ যখন পাকিস্তান আমলে নির্যাতিত হচ্ছিল সেদিন তারা বলেছিল আমরা মুক্তি চাই, আমাদের অধিকার ফিরে পেতে চাই। আজকে আপনারা স্বাধীনতা পেয়েছেন। কিন্তু এই স্বাধীনতা প্রিয় মানুষ কেন আদিবাসীদের অধিকার দেবে না, কেন তাদের সংবিধানে স্বীকৃতি দেবে না? কি আশ্চর্য! কি সংবিধান আমাদের! সে জন্য আমরা বলেছি, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ বলেছে, আদিবাসীদের স্বীকৃতি দিতে হবে, আদিবাসীদের মাতৃভাষায় লেখাপড়ার সুযোগ দিতে হবে।

তাদের ভিটেমাটি যারা দখল করেছে সেই জমি ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি আইনের শাসন কার্যকরী হচ্ছে না, ভূমি ফিরে পাচ্ছি না। আদিবাসীরা নিঃস্ব থেকে নিঃস্ব হয়ে পথের ভিখারীতে পরিণত হয়েছে। সেই কারনে আমি বলতে চাই আমাদের লড়াই শেষ হয়নি, আমাদের সংগ্রাম শেষ হয়নি। এম এন লারমা যে আদর্শ যে লক্ষ্য নিয়ে সংগ্রাম করেছিলেন জুম্ম জনগণকে রক্ষা করার জন্য সেই সংগ্রামকে আমরা আবারও তুলে ধরতে চাই, সেই সংগ্রামে সামিল হওয়ার আহবান জানাতে চাই। চিন্তা-চেতনায়, আদর্শে ছিলেন অতি উন্নত। তিনি সত্যিকারভাবে নেতা ছিলেন। নেতা ছিলেন বলেই নেতার যে গুণ, নেতৃত্বের যে গুণ সেটুকুকে তিনি ভালভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

বলতে চাই আদিবাসীরা যদি সংগঠিত না হই, ঐক্যবদ্ধ না হই, যদি নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন না হই তবে এদেশে আর কোন আদিবাসী থাকতে পারবে না। তারা দেশান্তরী হয়ে যাবে। আমি বলতে চাই নাচোলে যে তেভাগা আন্দোলনে সাওতাঁলরা সংগঠিত করেছিল সেই সাওতাঁল পাড়ায় মাত্র ৫টি পাড়া রয়েছে। সে ৫টি পাড়ার আদিবাসীদের সমস্ত জমি বেদখল হয়ে গেছে। সে কারণেই আমি বলতে চাই, আমরা সিধু কানু'র বংশধর, আমরা এম এন লারমার বংশধর। আমরা চুপ থাকতে পারি না। আমাদের অধিকার আমাদের পেতে হবে। সেই সাথে আমি আহবান জানাই - আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই, সকল আদিবাসী আমরা এক কাতারে দাঁড়াই আমাদের মৌলিক অধিকারের জন্য। সাথে সাথে দাবী করতে চাই - সংবিধান সংশোধন করতে হবে। এই সংবিধানে আদিবাসীদের অধিকার লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই সংগ্রাম আমরা করতে চাই, এই আবেদন আমি আপনাদের কাছে জানাতে চাই।

কিছু টাউট বাটপার কিছু অসৎ মানুষ তারা আমাদের বিশৃংখল করার চেষ্টা করবে। আমাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে। সতর্ক থাকুন বন্ধুগণ, সতর্ক থাকুন, সতর্ক থাকতে হবে। যদি আমরা দুই ভাই দুই দিকে যাই, তাহলে আমাদের বুঝতে হবে - আমাদের অবস্থা কি হবে? আমাদের ঐক্যের কি হবে? সেজন্য আসুন আমরা একই পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্লোগান দিই - এদেশের আদিবাসীরা এদেশে থাকবে। এই লাল মাটি কামড়ে ধরে বাংলাদেশের আদিবাসীরা থাকবে, তাদের অধিকার রক্ষা করবে। এই লড়াইয়ে সামিল হওয়ার জন্য সকল আদিবাসী জুম্ম জনগণকে আহবান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। □

এম এন লারমা নেতা ছিলেন বলেই তিনি নেতৃত্বের প্রতি ছিলেন অনুগত।

গৌতম কুমার চাকমা, জনসংস্থা বিষয়ক সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

২০০২ সালের ১০ই নভেম্বর আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী তথা জাতীয় শোক দিবস। আজকের এই দিনটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দিনে একদিকে যেমনি আমাদের প্রয়াত নেতাসহ অন্যান্যদের স্মরণ করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হবে অনুরূপভাবে তাদের আদর্শ, তাদের জীবন সেটার আলোকে আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পরিস্থিতিতে কি করণীয় সে বিষয়ে শপথ গ্রহণ করতে হবে। সর্বাগ্রে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি, স্মরণ করছি আমাদের প্রয়াত নেতাকে, তাঁর সাথে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদেরকে। সে ছাড়াও বাংলাদেশের সাথে যুদ্ধে, সশস্ত্র সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে বিভেদপন্থীদের হাতে যারা নিহত হয়েছেন তাদেরকে এবং চুক্তি উত্তরকালে যারা শহীদ হয়েছেন সেসব কর্মী ভাই-বোন এবং যারা সাধারণ মানুষ তাদেরকে আমি স্মরণ করছি। সেই সাথে প্রয়াত নেতার আত্মীয় স্বজনসহ অন্যান্য সকল শহীদ পরিবার-পরিজন আত্মীয় স্বজনের প্রতি আমার তরফ থেকে এবং জনসংহতি সমিতির তরফ থেকে সহমর্মিতা এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। বর্তমান মুহূর্তে যারা অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কঠিন জীবন যাপন করছেন, যারা এই অসহনীয় পরিস্থিতির কারণে নানাভাবে নিপীড়ন, নির্যাতন ভোগ করছেন, তাদের প্রতি আমি সমবেদনা এবং সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি।

এই স্মরণ সভায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ অনেকের স্মৃতি স্মরণ করতে হয়। সময়ের সংকীর্ণতায় সবদিক স্মরণ করা সম্ভব নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে ১৯৬৬ সাল থেকে দীঘিনালা হাই স্কুলে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থায় দেখেছিলাম। সেই থেকে শুরু করে ওনার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি ওনার কাছাকাছি ছিলাম। সুতরাং ওনার জীবনের অনেকটা দিক আমার দেখার সুযোগ হয়েছিল। আমার দিক থেকে দেখা তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সার্বিক ক্ষেত্রে যে অসাধারণ দক্ষতা সেগুলো পর্যালোচনা করলে অনেক বড় ইতিহাস হবে। সুতরাং এক কথায় বলা যায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা শুধু একটা নাম ছিল না; ছিলেন একটি জীবন্ত আদর্শ। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা মানেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস, নিপীড়িত মানুষের ইতিহাস। আন্তর্জাতিকভাবে যারা নিপীড়িত জাতির মানুষ তিনি তাদের বন্ধু ছিলেন। সুতরাং এখানে স্বল্প পরিসরে তার সেই গুণ, জ্ঞানের, কাজের বিভিন্ন দিক স্মরণ করা সম্ভব নয়। আমি শুধু এটুকু বলব জীবন যাপনে তিনি ছিলেন অতি সাধারণ, মনে ছিলেন মহৎ। তিনি উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে জুম্ম জাতীয়তাবাদকে উদ্ভাবন করেছিলেন, জুম্ম জনগণের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কথা ব্যক্ত করেছিলেন এবং ঐক্য সৃষ্টির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্দোলনের দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আন্দোলনের সাথে সমতলের মানুষের কি সম্পর্ক হবে, তাদের প্রতি কি দৃষ্টিভঙ্গী হবে এই সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের প্রতি, বিশ্বের নিপীড়িত জাতির আন্দোলনের প্রতি কি দৃষ্টিভঙ্গী কি হওয়া উচিৎ সেই দিক নির্দেশনা সঠিকভাবে দিয়েছিলেন।

আমরা দেখেছি, তাঁর নেতৃত্বে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এখানে একটি নেতৃত্ব গড়ে তোলা হয়েছে; জনসংহতি সমিতি আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর ব্যক্তি জীবনেও নেতার কি গুণ আমি তা দেখেছি; তিনি নেতা ছিলেন বলে নেতৃত্বের প্রতি অনুগত ছিলেন। আমি সাধারণ একটা উদাহরণ দিই। তিনি নেতা ছিলেন বলেই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যে সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত হতো তা তিনি মেনে নিতেন। তিনি কখনো সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেতেন না। সেজন্য আমি উপলব্ধি করেছি তিনি নেতা ছিলেন বলেই নেতৃত্বের প্রতি যে আনুগত্য থাকা দরকার সেটুকু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে স্মরণ করেছেন।

আদর্শ নেতা বা ব্যক্তির যে গুণ সেই গুণের মধ্যে আমি দেখেছি তিনি শুধু সাধারণ জীবন যাপন করতেন বা সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ছিলেন তা নয়, আদর্শগতভাবে যে সংকীর্ণতাবাদ অনেক নেতার মধ্যে থাকে সেই সংকীর্ণতাবাদ থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। তার কাছে ছিল না কোন উদারতাবাদ, তাঁর কাছে ছিল না কোন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ। সেজন্য আমি মনে করি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন আমাদের কাছে একটি জীবন্ত আদর্শ। সেই জীবন্ত আদর্শের আলোকে আমাদের কর্মীবাহিনী, আমাদের জনগণ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। আমি আশাকরি, বর্তমান দিনেও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আদর্শকে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, পারিবারিক জীবনে প্রতিফলন ঘটানো উচিত। বিশেষ করে জনসংহতি সমিতির নেতৃস্থানীয় কর্মীদেরকে স্মরণ করে দিতে চাই, আমাদের মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক, অত্যন্ত গণতান্ত্রিক এবং পরমতসহিষ্ণু।

আমাদের কর্মীবাহিনী যদি তাকে অনুসরণ করতে পারে তাহলে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আদর্শকে এবং তার আদর্শের অনুসারী নেতৃত্বাধীনে সকল প্রকার কর্তব্য সুসম্পন্ন করতে পারব। আমাদের মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষির মানুষের মধ্যে ঐক্য-সংহতি এনেছিলেন। তিনি ছিলেন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে। অপরদিকে তিনি ছিলেন জাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে। সুতরাং বড় জাতি হিসেবে চাকমারা যেন মারমা, ত্রিপুরাসহ অন্যান্য জাতিসমূহের উপর বা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা আছে তাদের উপর প্রভূত্ব করার চেষ্টা না করে। অনুরূপভাবে মারমারা, যাদের থেকে তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় বড়, তাদের যাতে বঞ্চিত না করে। অপরপক্ষে যারা তুলনামূলকভাবে সংখ্যালঘু যেমন মুরুং, চাক- এরা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প, তাদের মনে সব সময় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ কাজ করে সে থেকে'তাদের ফিরে আসা দরকার। সেটা যদি না হয়, তাহলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আদর্শকে, তার জুম্ম জাতীয়তাবাদের ধ্যান-ধারণাকে অবহেলা করা হবে।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সর্বদাই ছিলেন সত্যের পক্ষে। সেজন্য তাকে বলতে হয়, তিনি ছিলেন ঐক্যপন্থী। ব্যক্তি জীবনেও উনি ছিলেন ঐক্যপন্থী। পারিবারিক জীবনেও উনি ছিলেন ঐক্যপন্থী। সমাজ জীবনেও তিনি ছিলেন ঐক্যপন্থী। রাজনৈতিক জীবনে, জাতীয় জীবনে ছিলেন ঐক্যপন্থী। কিন্তু ঐক্যের বিপরীতে বিভেদ থাকে। সেই বিভেদ বরাবরই আমাদের পার্টির অভ্যন্তরে নীরবে-নিভৃতে কাজ করেছে। সমগ্র জুম্ম জনগণের জীবনে বিভেদের যে ধারা ছিল সেই ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে। সেই ধারায় আমরা দেখেছি ১৯৮৩ সালে আমাদের গৃহযুদ্ধ। সেই যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়েছেন। তিনি মুক্তির পথে ছিলেন বলে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। তার অবস্থান ছিল বিভেদের বিরুদ্ধে। সুতরাং তাকে অপসারণ করে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে বা পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের সাথে সমতল অঞ্চলের মানুষের যাতে বিভেদ সৃষ্টি হয় সেই পাঁয়তারা করা হয়েছিল। সেজন্য বিভেদপন্থীরা দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জুম্ম জাতীয় জীবনে বিভেদের সৃষ্টি করেছিলেন। তারা তখন জুম্ম জাতীয় অস্তিত্বকে অনিশ্চয়তার দিকে নিক্ষিপ্ত করেছিলেন তারা নিজেও তা জানতেন না।

আমরা পশ্চাৎপদ, আমরা অনগ্রসর, আমাদের অসচেতনতা রয়েছে। সেই অসচেতনতার কারণে আমাদের কাছে কখনও কখনও ক্ষমতার লোভ, কখনও উচ্চাভিলাষ, কখনও হিংসা, কখনও প্রতিশোধ কামনা মনে জেগে উঠে। সে কারণেই তারা সেটার শিকার হয়েছে। আজ চুক্তি-উত্তর কালেও বা চুক্তির প্রাক্কাল থেকেই ইউপিডিএফ সেই একইভাবে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের জালে আটকে গিয়ে নিজেদের অজ্ঞানতা এবং অসচেতনতার কারণে ক্ষমতার লোভে মোহ হয়ে আর একবার নতুন করে গৃহযুদ্ধের সুচনা করেছে। আমি বলব, এটা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আদর্শের পরিপন্থী। তারা অবশ্য দাবী করেন, তারাই সত্যিকার অর্থে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অনুসারী। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কখনও বলেননি যে জুম্ম জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কখনও বলেননি যে জুম্ম জনগণের আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করতে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কখনও বলেননি যে, জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে সেটেলারদের পক্ষে, সরকারের পক্ষ হয়ে কাজ করতে। বিভেদপন্থী ইউপিডিএফের সদস্যরা তাদের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে দেশি বা বিদেশী ষড়যন্ত্রে শিকার হয়ে আজকে আবার নতুন করে বিভেদ সৃষ্টি করে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, আন্দোলনের পিঠে ছুরিকাঘাত করেছে।

মানুষ মুখে অনেক কিছু বলতে পারে, কিন্তু কাজ হল আসল। কথা ছাড়া মানুষের মনের অন্তর্নিহিত অর্থ বা কি পরিণতি সেটা দেখা সবচেয়ে বড় কাজ। গৃহযুদ্ধে যারা প্রতারণা করেছে তাদের শ্লোগান আমরা শুনেছি। এখন নতুন করে গৃহযুদ্ধের অবতারণা করেছে তাদের শ্লোগান শুনছি। তারা পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন চায়। আপনারা জানেন জনসংহতি সমিতি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের কথা বলেছিল এবং এই চুক্তি করার সময় বলেছিল, এই চুক্তির মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সবগুলো দাবী অর্জিত হয়নি। তবুও পৃথিবীর শুরু থেকে পরিবর্তন হয়েছে। উপমহাদেশের পরিবর্তন হয়েছে, আমাদের দেশের যে পরিবর্তন হয়েছে এটার কোন বিকল্প নেই এবং সে সময় আপনারা সকলে ইতিবাচক মতামত দিয়েছিলেন। সেই মতামতের ভিত্তিতে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। সেই ইউপিডিএফ বিভেদপন্থীরা আজকে এই চুক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে এবং জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে অবমূল্যায়ন করে তারা নিজেদেরকেই সবচেয়ে বড় করে তুলতে চায়। এটা বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের সময়ে এই পরিস্থিতিতে এবং এই সময়ে আমাদের মূল্যায়ন করা উচিত কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক। আর দেরী নয়, যদি আর বেশী দেরী হয়ে থাকে তাহলে বিগত গৃহযুদ্ধে আমরা দেখেছি, বাংলাদেশ সরকার আমাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে প্রায় ৫ লক্ষ সেটেলারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানান্তর করেছে। আর এখন এই গৃহযুদ্ধের সুযোগে তারা তাদের হাতে জমি-জমা তুলে দিতে চায়। এই জমি-জমা যদি তারা একবার তুলে দিতে পারে তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ভবিষ্যৎ বংশধররা আর পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা হিসেবে টিকে থাকতে পারবে না। সেটা অত্যন্ত বাস্তব।

আপনারা হয়তো শুনেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী যখন রাশিয়া আক্রমণ করে তখন রাশিয়ার জনগণ তাদের রাষ্ট্রকে, তাদের সরকারকে, তাদের মাটিকে রক্ষা করার জন্য প্রতিটি ইঞ্চি মাটির জন্য তারা লড়াই করেছে। ঠিক তেমনিভাবে আমাদের সময় এসেছে। আমাদের সরকারও নানাভাবে সেটেলারদেরকে দিয়ে যেভাবে জায়গা-জমি দখল করে চলেছে। সেই জায়গা-জমি যাতে এক ইঞ্চিও আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে না যায় সেজন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। আমরা যদি আরও কয়েক বছর আমাদের হাতে রাখতে পারি তাহলে আমাদের এই চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব টিকে থাকবে বলে বলা যেতে পারে। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে আমাদের আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান গিয়েছেন সরকারের কাছে সবগুলো বিষয় তুলে ধরেছেন। মৌলিক বিষয় না হলেও কিছু কিছু বিষয় বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। তার মধ্যে আঞ্চলিক পরিষদের কার্যবিধিমালা অন্যতম।

১৯৯০ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হল। জেলা পরিষদের সেই কার্যবিধিমালা তৈরী হয়নি। সেই কার্যবিধিমালা তৈরির প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়গুলো যাতে হস্তান্তরিত হয় সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। একদিকে সরকারের সাথে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আমাদের আন্দোলন করতে হবে। অপরদিকে নানাভাবে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে যে জমি-জমা বেদখল হচ্ছে, চুক্তি পরিপন্থী যে নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলছে সেটাকে প্রতিরোধ করতে আমাদেরকে গণতান্ত্রিক পন্থায় অনাগত দিনগুলোতে দুর্বার আন্দোলন করতে হবে। সুতরাং সেদিকে আপনাদের প্রস্তুতি নিতে হবে।

আমি শুধু বলবো, আমরা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্বপ্ন আংশিক বাস্তবায়ন করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য পুরোটা বাস্তবায়িত হতে এখনো দেরী। সেজন্য আমি স্মরণ করে দিতে চাই, তিনি একটা কথা বলেছিলেন, আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে যদি অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে তিন প্রজন্ম পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন করে যেতে হবে। এখনও পর্যন্ত একটা প্রজন্মের শেষ। আরও দুটো প্রজন্ম আছে। সুতরাং বিশেষ করে আমি তরুণ সমাজের কাছে আহবান রাখবো-আপনাদের সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। সুতরাং মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আদর্শকে অনুসরণ করে সেই আলোকে আন্দোলন গড়ে তুলার জন্য চেষ্টা করবেন এই আহবান রাখছি। পরিশেষে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সাথে বাংলাদেশের জনগণের ঐক্য কামনা করে, আমাদের আন্দোলনে সকলের সহযোগিতা কামনা করে বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। □

সম-মর্যাদার ভিত্তিতে গোটা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখেছিলেন এম এন লারমা।

মেসবাহ কামাল
সহযোগী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শহীদ এম এন লারমার ১৯তম মৃত্যু বার্ষিকীর এই সভায় সভাপতিত্ব করছেন শ্রী মংশাপ্রু কার্বারী, জাতীয় নেতৃবৃন্দ, জনসংহতি সমিতির সভাপতি শ্রী সন্তু লারমাসহ অন্যান্য নেতৃবর্গ, আদি ও স্থায়ী বাঙ্গালী কল্যাণ পরিষদের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা। আমি আপনাদের সবার মত শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যু শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষতি নয় বরং পুরো বাংলাদেশের এক অপুরণীয় ক্ষতি। কেননা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন জাতীয় ঐক্যের প্রতীক।

বাংলাদেশের যে নেতৃত্ব ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে সামনের সারিতে ছিলেন তারা স্বাধীনতা-উত্তর কালে জাতীয় সংহতির নিশ্চয়তা বিধান করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সেদিন তারা উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভাবনায় এতই আপ্লুত ছিলেন যে তারা জাতীয় সংহতির কথা ভুলে গিয়েছিলেন। শেখ মুজিবের মতো নেতা সেদিন একজন অন্ধ বাঙ্গালীতে পরিণত হয়েছিলেন। বাংলাদেশ যে চাকমার, মারমা-ত্রিপুরার দেশ, সাওতাঁলের দেশ - এই সত্যকে ভুলে গিয়েছিলেন, উগ্র জাতীয়তাবাদীতে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু জাতীয় সংহতির কথা, জাতীয় ঐক্যের কথা বলেছিলেন একজন মানুষ তিনি হচ্ছেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তিনি সেদিন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের উপরে উঠে গোটা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সকল জাতির সংহতির কথা ভেবেছিলেন এবং সেই সংহতি হতে পারে কেবলমাত্র সম-মর্যাদার ভিত্তিতে। সম-মর্যাদার ভিত্তিতে গোটা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখেছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তখনকার শাসকদের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে তিনি বলেছিলেন আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা, সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা, সকল জাতির সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা। বলেছিলেন সকল ধর্মের সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা।

কিন্তু আমরা দেখলাম নব্য শাসকরা তাদের ক্ষমতার দম্ভে সেদিন ভুলে গেলেন সকল জাতির সকল ধর্মের সম-মর্যাদার বাণীকে। সেদিন তারা ভাবলেন যে শক্তি দিয়ে, সামরিক বাহিনীর শক্তি দিয়ে, পুলিশ বাহিনী দিয়ে অন্য সকল জাতির অস্তিত্বকে মুছে দিতে পারবেন। কিন্তু মানুষের যে অপরাজেয় শক্তি, মানুষের যে গণতান্ত্রিক চেতনা তার কখনও মৃত্যু হয় না; তাকে কোন শক্তি দিয়ে পরাভূত করা যায় না। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের যে অধিকার, এদেশের আদিবাসীদের যে অধিকার সেই অধিকারকে শক্তি দিয়ে দমন করা যায় না এবং যায়নি বলেই আমরা দেখছি ১৯৯৭ সালে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু সেই '৯৭ পর্যন্ত সাল আসার আগেই আমরা হারিয়েছি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে। বাংলার ইতিহাসে যেমন আছে সিরাজউদ্দৌল্লাহ, যেমন আছে প্রীতিলতা যেমন আছে হাজী শরীয়তউল্লাহ, তেমন বাংলার ইতিহাসে মীরজাফরও আছে। এই বাংলার অংশ এই পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐ মীরজাফরদের ধারাবাহিকতায় গিরি-দেবেন-পলাশ-প্রকাশের নাম উল্লেখিত হয়েছে। যাদের অগ্নি গোলকের ছোঁয়ায় বাংলাদেশের অবিস্মরণীয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে আমরা হারিয়েছি। এখানে বসে আমি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আবক্ষ ভাস্কর্যের দিকে তাকাচ্ছিলাম এবং দেখছিলাম তার স্মীত হাসি, দেখছিলাম তার প্রশান্ত রূপ। ইতিহাসের একজন ছাত্র হিসেবে যখনই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবনের দিকে তাকাই তখন তার এই ব্যক্তিত্ব, এই স্থিতধী একটা ব্যক্তিত্বের পরিচয় বার বার পাই।

১৯৬০ দশকের গোড়া থেকে শুরু করে এককভাবে সংখ্যালঘুর উপর যে অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তিনি। একজন থেকে দুই জন হয়েছেন, দুইজন থেকে চারজন হয়েছেন এবং চারজন থেকে হাজার হাজার লাখো লাখো হয়েছেন এবং আপামর জনতার সমর্থন আদায় করেছেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রত্যায়ন করেছেন জুম্ম জাতীয়তাবাদের। সেই জুম্ম জাতীয়তাবাদ কি? এখানকার শাসকরা চেষ্টা করেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে বহু জাতি, এই বহু জাতির মধ্যে যে বিভিন্নতা, এই বিভিন্নতাকে ব্যবহার করে এখানকার মানুষকে চিরকাল শাসনে রাখতে, শোষণে রাখতে, অবদমিত রাখতে।

কিন্তু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জুম্ম জাতীয়তাবাদের আদর্শে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতির মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন এবং তার মিলিত সংগ্রামের নাম হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে এখানকার সকল জাতির মানুষ এগিয়ে গেছেন সামনের দিকে এবং এখানে সরকারকে চুক্তিতে আসতে বাধ্য করেছেন।

আমি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে শুভেন্দু প্রভাস লারমাসহ আরও ৮জন যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। এই সংগ্রামে জনসংহতি সমিতির প্রায় দুই শ' পার্টি সদস্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার মানুষ যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন মেজর ক্যাহ্লাউ ভান্তে। যিনি গৌতম বুদ্ধের আদর্শ থেকে প্রতিরোধের মন্ত্রণা পেয়েছিলেন। একজন ভান্তে হয়ে, একজন ধর্মীয় গুরু হয়ে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে যিনি পাহাড়ের মানুষের নিরাপত্তা বিধানে, অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে রত করেছিলেন তার স্মৃতির প্রতি এবং এখানে নির্যাতিত যে হাজার হাজার নারী-পুরুষ তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সেই সাথে আমি বলতে চাই যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে গোটা বাংলাদেশের সামনে একটা ঐতিহাসিক সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই ঐতিহাসিক সুযোগ হচ্ছে - রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশের মধ্যকার সমস্যা সমাধানের এক সুযোগ, এই সুযোগকেই গ্রহণ করা দরকার। এই চুক্তির ভিত্তি শুরু হয়েছিল সেই '৭৪ সালে এবং এর কিছুদিন পরেই শেখ মুজিব নিহত হন। আবার একটি চুক্তি হয়েছে ২২ বছর যুদ্ধের পরে। সেই চুক্তির পরিণতি কি হল? শেখ মুজিব কথা দিয়েছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে - "যে অভিযোগ তুমি সংসদে দিয়েছিলে, যে সংজ্ঞায় তুমি বলেছিলে শুধু উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ নয়, আধিপত্যবাদ নয়, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদ নয়, জাতীয়তার নামে সাম্প্রদায়িকতা নয় - ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলো তার পরিচয়টুকু যদি দিতে না পারে, তার বেঁচে থাকার অধিকার যদি না দেয়, তার কাপড় চোপড় পরা, তার উৎসব, তার জীবনযাত্রা, তার চাষাবাদ, তার কথাবার্তা, তার নীতির যদি স্বীকৃতি না দেয় তাহলে জাতি হিসেবে বৃহত্তর ঐক্য হয় না, অখন্ড ঐক্য হয় না, সার্বভৌমত্ব থাকে না।" সেই ঘটনা তিনি জীবন দিয়ে উপলদ্ধি করেছিলেন কিন্তু রেহাই পাননি। তারপর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা রাস্তা খুঁজে নিলেন সেই রাস্তা, যখন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সব রাস্তা শেষ হয়। বাধ্য হয়ে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য জুম্ম জনগোষ্ঠী। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সংগ্রামের ২২ বছরের পরিণতিতে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই ২২ বছর লড়াইয়ের মধ্যিখানে, সশস্ত্র সংগ্রামের মাঝখানে বহু রকমের নির্যাতিত হয়েছে।

বৃটিশ উপনিবেশের প্রথম থেকেই এই আদিবাসীরা এখানে আন্দোলন করেছে। সেটা বলছিলেন আদিবাসী নেতা সঞ্জীব দ্রং। এই বাংলাদেশের মাটিতে, ভারতবর্ষের মাটিতে আদিবাসীরা সংগ্রাম করল। জুম্ম জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম, সাঁওতালের সংগ্রাম, তেভাগার সংগ্রাম - এসব সংগ্রাম হল স্বাধীনতা সংগ্রামের উৎস। সেই আন্দোলনের ধারায় আজকের এই নেতা সন্তু লারমা। অনেক পথ পেরিয়ে আজকে এই প্রান্তে উপনীত হয়েছেন। আমার শ্রদ্ধেয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা চেষ্টা করেছিলেন অস্ত্রের সাথে যুদ্ধ না করতে। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক সব কটা রাস্তা যখন রুদ্ধ হয়, বাধ্য হয়ে অস্ত্র ধরলেন। সেই ধারার মধ্য দিয়ে বহু রক্তক্ষয়ী ঘটনা এই অঞ্চলে ঘটেছে। এই খাগড়াছড়িতে লোগাং হত্যাকান্ড যেদিন হয় সেদিন সকালে আমি আসি। আমার মনে আছে সেদিন যুদ্ধকালীন সময়ে উৎসবে এসেছিলাম, কিন্তু আমরা উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। ঐ লোগাং হত্যার প্রতিবাদে জনসভা করেছিলাম। সম্ভবত সেখানে গিয়েছিল আজকের বক্তা সঞ্জীব দ্রং, আরো অনেকে গিয়েছিলেন। সেদিন এখানকার ব্রিগেডিয়ার সাহেব উদ্ধত্যের সাথে জানিয়েছিলেন, আপনারা আমার সাথে আসেন, কথাবার্তা বলেন, নৈশভোজে আসেন। আমি অত্যন্ত ঘৃণাভবে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম সেই নৈশভোজের আমন্ত্রণ। আমার সাথে ছিল আর একজন বন্ধু দিলীপ বড়ুয়া। ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলাম, তুমি গণহত্যা করবে, লোগাং হত্যাকান্ড ঘটাবে আর এদিকে দাওয়াত দেবে আমাদের নৈশভোজে। সেই স্মৃতি আজো আছে। সেই স্মৃতি নিয়েই বলছি, এই রকমের শত শত ঘটনা ঘটেছে এখানে, ঘটেছে মাটিরাঙ্গায়, ঘটেছে অন্যান্য থানায়, ঘটেছে রাঙ্গামাটি, বান্দরবানে এবং এই খাগড়াছড়িতে।

সেই অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণ আত্মরক্ষা করতে ঐক্যবদ্ধ হলেন। জুম্ম জনগোষ্ঠী অস্ত্র ধরে লড়াই করেছে, সংগ্রাম করেছে। সেই সংগ্রামে প্রতিপাদ্য হয়েছে সামরিক শাসনের অবসান। সেই শাসকগোষ্ঠীরা পরাজয় বরণ করেছে। সামরিক শক্তিতে জয়লাভ করা যায় না। প্যালেস্টাইনকে নিশ্চিহ্ন করা যায় নাই, এখনও করা যাবে না। আফ্রিকার নিগ্রোদের নিশ্চিহ্ন করা যায় নাই, যাবে না। এই জুম্ম জনগণকে, জনসংহতি সমিতিকে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কখনও চাকমার উপরে, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর উপরে চান নাই বাঙ্গালী আধিপত্য। এদেশে ৪৫টা জাতিসত্বা, পাহাড়ী জাতিগোষ্ঠী আছে। আজকে সারা দেশে সাঁওতালসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীগুলো সারাদেশে ঐক্যবদ্ধ। তাদের বাঁচতে দেয় নাই, টিকতে দেয় নাই। তারপরও ঐক্যবদ্ধ আজকে এই ২৫ লক্ষ মানুষ। এই মানুষ আজকে অস্ত্রের রাস্তা ধরে চুক্তি করতে বাধ্য করেছে অপ্রতিরোধ্য শাসকগোষ্ঠীকে, সাম্প্রদায়িক উগ্র

শাসকগোষ্ঠীকে, সম্প্রসারণবাদী শাসকগোষ্ঠীকে।

ক্ষমতায় আসীন হয়েছে বিএনপি। জামাতসহ চারদলীয় ঐক্যজোট আজকে এই ঐতিহাসিক সুযোগের মর্মার্থ বোধ হয় এখনও বুঝতে পারছে না। কেননা আমরা দেখি যে, বাংলাদেশে ওয়ান রিলিজিয়ন, ওয়ান ন্যাশন এবং ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ-এর ব্যবস্থা চলছে। বাংলাদেশের শাসকরা এখনও এক জাতি বাঙ্গালী, এক ভাষা বাংলা এবং এক ধর্ম ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চাচ্ছেন। বাংলাদেশে যে বহুত্ব আছে, বাংলাদেশে যে বহু জাতির বাস, বাংলাদেশে যে বহু ভাষাভাষির মানুষ আছে, বাংলাদেশে যে বহু ধর্মের মানুষ আছে - এই বাস্তবতার প্রতি তারা এখনও তাদের চোখকে বন্ধ করে রাখছে। কিন্তু চোখ বন্ধ রাখলেই প্রলয় বন্ধ হয় না। অন্ধ হয়ে থাকলেই প্রলয় কখনও বন্ধ হয় না। যদি প্রলয় বন্ধ করতে হয় তাহলে চোখ খুলতে হবে এবং চোখ খুলে বাস্তবতার স্বীকৃতি দিতে হবে। রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশের মধ্যকার যে জাতিগত সমস্যা আছে সেই সমস্যাকে সমাধানের সুযোগকে গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশের একের পর এক সরকার, চুক্তি অনুযায়ী যে ভুমি কমিশন গঠিত হবার কথা সেই ভুমি কমিশনকে কার্যকর করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভুমির সমস্যা, ভুমির অধিকার হারিয়ে যাবার যে সমস্যা সেই সমস্যা সমাধানের কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। যে মানুষটা ভুমি হারায় সেই মানুষটা বুঝে ভুমি হারানোর বেদনা কি। আজকে একজনের ভুমি আর একজনে চাষ করছে, একজনের ভুমির ফসল অন্যের বাড়ীতে উঠছে। সেই মানুষটা বুঝে ভুমি হারানোর বেদনা কি! সেই হারানোর বেদনা আরো তীব্রতর হয় যদি সেই ভুমি হারানোর পেছনে এই অপরাধ কাজ করে যে ভুমি হারানো ব্যক্তি বাঙ্গালী নয় কিংবা মুসলমান নয় এবং সে বাংলা ভাষায় কথা বলে না। তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য, তার চেহারায় যে ভিন্নতা এনে দিয়েছে এই অপরাধে যদি তাকে ভুমি হারাতে হয় তাহলে সেই বেদনা নিদারুণ হয়ে উঠে। কেননা ভুমি হারানোর বেদনার সাথে তার নিজের স্বাতন্ত্র্যের যে চেতনা সেই চেতনা অনুযায়ী নিজেকে পরিপুষ্ট না করার যে যন্ত্রণা সেই যন্ত্রণা যুক্ত হয়। কাজেই ভুমি কমিশনকে অনতিবিলম্বে জোরদার করে এই ভুমি সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ বাংলাদেশ সরকারকে নিতে হবে।

চুক্তি অনুযায়ী শরণার্থীরা বাংলাদেশে ফিরে এসে বাংলাদেশের মুখ রক্ষা করছেন, জগতের বুকে বাংলাদের মুখ রক্ষা করেছেন। সেই প্রত্যাগত শরণার্থীদের যথাযথ পুনর্বাসন দেয়া হয় নাই। এখনও কয়েক হাজার শরণার্থী ভারতের রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। তারা কোথায় বাস করবেন, কোথায় থাকবেন, কোথায় খাবেন, কিভাবে খাবেন তার কোন ব্যবস্থা এই রাষ্ট্র এই সরকার এখন পর্যন্ত করে দেয় নাই। আগের সরকার দেয় নাই এটা একটা নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা। এই বিশ্বাসঘাতকতার অনতিবিলম্বে অবসান হওয়া দরকার। প্রত্যাগত শরণার্থীদের চুক্তি অনুযায়ী, কথা অনুযায়ী তাদের পুনর্বাসন হওয়া দরকার। একই সাথে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুরা নিজের জায়গায় নিজের মাটিতে যেতে পারেননি তাদের পুনর্বাসন হওয়া দরকার।

২৪ বছর ধরে অস্ত্রের ঝনঝনানি চলেছে। ক্ষমতার দর্প থেকে, মসনদ থেকে বিভিন্ন বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে এখানকার জনগণের উপর। এরই ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষগুলো নিজের জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় কখনো কখনো এক জায়গা ছেড়ে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে কোন রকমে জীবন বাঁচিয়েছেন। সেই মানুষগুলোকে তাদের জমিজমা, নিজ ভুমি, নিজ ঘর যেখানে ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করা দরকার। কিন্তু সেই ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। প্রায় ৯৩ হাজার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পরিবার এখনও নিজ জায়গায় ফেরত যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। স্থায়ী বাসিন্দার ভিত্তিতে, স্থানীয় বাসিন্দার সংজ্ঞা অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রণয়ন করার কথা সেটা হচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাঙ্গালীকরণের যে প্রচেষ্টা পাকিস্তানের আমল থেকে চলে আসছে সে প্রচেষ্টা বজায় থাকছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় যখন যে জেলার প্রশাসক আসেন তখন ঐ জেলা থেকে লোকজনের আসা ধুম পড়ে যায়। কারণ তখন নাকি স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র পাওয়ার সহযোগিতা দেন ঐ জেলার লোকজনের জন্য। কেননা ডিসি সাহেবের জেলা থেকে আসছেন, তাই স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। এভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামের যে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান না করে রাজনৈতিকভাবে একে আরও জটিলতার দিকে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করছে। আঞ্চলিকতার ধারায় জেলা প্রশাসক এই সমস্যাকে আরও জটিল করছে বলে আমরা খবর পাচ্ছি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের লড়াইয়ে ২৪ বছর ধরে যে সংগ্রাম, আরও বলতে গেলে ৬০ দশক থেকে শুরু হওয়া যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামের পথ ধরে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার যে স্বপ্ন ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার, সেই স্বপ্নের আংশিক বাস্তবায়ন হিসেবে পার্বত্য জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী। আমরা দেখছি এই পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদকে কার্যকরী করা হচ্ছে না। এই পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন করা হয় ১৯৮৯। তখন অবশ্য অন্য নাম ছিল স্থানীয় সরকার পরিষদ। কিন্তু একবার নির্বাচন হয়েছে চার বছরের জন্য। কিন্তু তারপর থেকে, ১৯৯৩ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর কোন নির্বাচন হচ্ছে না। সরকারী দলগুলো তাদের নিজের লোকজন দিয়ে তাদের

প্রতি অনুরক্ত, যাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকজনের উপর কোন দায়বদ্ধতা নাই, সেসব দলীয় কতিপয় দালালদের দিয়ে এই সমস্ত জেলা পরিষদগুলোকে গঠন করে এখানে দলীয় শাসন কায়েম করার চেষ্টা করছেন। এর ফলে কি হচ্ছে? পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রতিনিধিত্বকারীর কথা, পার্বত্য চট্টগ্রামের আশা-আকাঙ্খা-স্বপ্ন তার প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারছে না। কিন্তু তা না হয়ে উঠলে এই যে বিকেন্দ্রীকরণ; এই বিকেন্দ্রীকরণের মানে কি?

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের, জনগণের যে স্বপ্ন, যে আকাঙ্খা সেই আকাঙ্খাকে প্রতিফলিত করার মত ক্ষমতা কোন সরকার আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পরিষদকে দেয়নি। যে আঞ্চলিক পরিষদকে চুক্তি অনুযায়ী ক্ষমতা প্রদান করার কথা এই সরকার এবং বিগত আওয়ামী লীগ সরকার সেই ক্ষমতা প্রদান করছে না এবং না করার মাধ্যমে তারা আঞ্চলিক পরিষদকে কার্যকর হয়ে উঠতে দিচ্ছে না। এক ধরনের কেন্দ্রীয়, আমলাতান্ত্রিক যে নিয়ন্ত্রণ সেই নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে এখনও এই সরকার। কিন্তু এই অপচেষ্টা যদি বলবৎ থাকে তাহলে পার্বত্য জনগণের আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়ন হবে না এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী, যথার্থ প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা না যায় তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান কখনও হবে না। যদি এই সরকারগুলো সত্যিকার অর্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করতে চায় তাহলে অনতিবিলম্বে পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন দিতে হবে এবং আঞ্চলিক পরিষদসহ উভয়কে কার্যকরী করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে আঞ্চলিক পরিষদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসতে হবে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার কাজটা কখনই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এই চুক্তির মাধ্যমেই মাতৃভাষার অধিকার প্রথমবারের মতো স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষা প্রয়োগের যে ব্যবস্থা হওয়ার কথা সেটাও করা হচ্ছে না। এখানকার ছোট ছোট শিশুরাসহ গোটা বাংলাদেশের আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার যে অধিকার আছে সেই অধিকার থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। সেই অধিকারের বাস্তবায়নের কাজটা এগুচ্ছে না।

এই কথাগুলো আমাকে মনে করিয়ে দেয় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কথা। মানবেন্দ্র লারমা যখন মৃত্যুবরণ করেন তার আগে তিনি একটি সুকঠিন রাজনৈতিক সংকট পরিচালনা করেছিলেন। জনসংহতি সমিতির মধ্যকার একটি অংশ সেদিন বক্তব্য নিয়ে এসেছিল যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার দ্রুত সমাধান করা সম্ভব। তারা বলছিল দ্রুত নিষ্পত্তির কথা। এই সমস্যা বিদেশী সহায়তায় দ্রুত নিষ্পত্তি করবে। তার বিপরীতে সেদিন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এবং দেশপ্রেমের সাথে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে অবিচল থাকার কথা ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং গোটা দলকে, গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষকে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের যে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম তাকে বিজয়ের পথে পরিচালনা করেছিলেন। তিনি কোন শর্টকাট ওয়েটে যেতে চান নাই। তিনি নিজের আদর্শ থেকে এতটুকু বিচ্যুত না হয়ে কোন রকমের কম্প্রমাইজ না করে নিজের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে, এখানকার মানুষের নিজ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে, দীর্ঘ মেয়াদী সংগ্রামের পথে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে, জনসংহতি সমিতিকে পরিচালনা করেছিলেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সেই শিক্ষার কথা আর একবার আমাদের মনে করা দরকার।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার যে দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রাম সেই সংগ্রামের তত্ত্ব আজও সমভাবে প্রযোজ্য। চব্বিশ বছরের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন হয়েছে চুক্তি সম্পাদনে। এই চুক্তি বাস্তবায়নে আরও কত বছর লাগবে আমি জানি না। একজন বাঙ্গালী হিসেবে আমি লজ্জাবোধ করি এই বাঙ্গালী প্রাধান্য সরকারগুলো এই চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারটা নিয়ে তালবাহানা করছে, গড়িমসি করছে। কাজেই এটা আপনাদেরকে আবার দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের দিকে ধাবিত করছে। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দীর্ঘমেয়াদী পথে আপনাদেরকে যেতে হবে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রতিদিনই আপনাদের কাছে জীবন্ত হয়ে উঠবেন এবং যতদিন সংগ্রাম থাকবে ততদিন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্মৃতিপটে আপনাদের, আমাদের, সারা পৃথিবীর সমস্ত সংগ্রামী মানুসের স্মৃতিপটে অবিচল হয়ে থাকবেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উস্কানির কথা আমরা দেখতে পাই, শুনতে পাই। দীঘিনালায় আমরা দেখেছি কি ঘটেছে। রামগড়ে আমরা দেখেছি কিভাবে গোটা পাড়ায় আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দিকে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। আমাদেরকে বুঝতে হবে, বাঙ্গালীদেরকে বুঝতে হবে, বাংলাদেশের মাটির উপর আমাদের যেমন অধিকার আছে তেমনি সকল পাহাড়ী এবং পাহাড়ের বাইরে যে সকল আদিবাসীরা বাস করেন তাদেরও সমান অধিকার আছে। এই অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি দিয়েই আমরা সম-মর্যাদার ভিত্তিতে বাস করতে পারি। কোন রকম উস্কানিতে শরীক না হয়েই আমাদেরকে পাহাড়ীদের সাথে মৈত্রীর বন্ধনে এক হয়ে সামনে এগুবার পথ খুঁজতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতে যে হত্যালীলা চলছে তা অত্যন্ত অনাকাঙ্খিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির যে বন্ধুগণ অস্ত্র সমর্পণ করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে দেশকে এগিয়ে নিয়েছিলেন সে রকম ২৯ জন বন্ধু গত কয়েক বছরে ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন। যারা

বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সাথে সংঘর্ষের সময় নিহত হননি তারা এই ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন। পঞ্চাশের বেশী জনসংহতি সমিতির সদস্য, শুভানুধ্যায়ী নিহত হয়েছেন। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। জনসংহতি সমিতির নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাসহ এই সংগঠনটি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করার আগে যে ১০/১২ বছরের কর্মকান্ড এবং আত্মপ্রকাশ করার পরে ৩০ বছরের অধিক যে কর্মকান্ড, এই কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে তারা তাদের যোগ্যতা, সততা, দেশপ্রেম এবং পাহাড়ী জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার পরীক্ষায় ১০০ এর মধ্যে ১০০ পেয়ে পাশ করেছেন। সঠিক কথায়, তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাদের যোগ্য নেতৃত্বের পেছনে এখানকার মানুষের সমবেত হওয়া দরকার। চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে বেগবান করা দরকার। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার।

পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের নামে যে বিভিন্ন ধরনের তৎপরতা চলছে তার সব তৎপরতা যে সব সময় শুভ তৎপরতা তা আমরা বলতে পারি না। কিছুদিন আগে জয়েন্ট রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট মিশন এসেছিল। তারা এখানে একটা রিপোর্ট করেছে। সেই রিপোর্টের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত প্রস্তাবনা তৈরী করেছেন তার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন কর্মকান্ড পুনরায় শুরু করার কথা বলেছেন। এই বক্তব্যকে স্বাগত জানাই। কিন্তু সেই সাথে এই কথা বলতে চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের ধারা যদি দেশের অন্যত্র যেভাবে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয় তাহলে এটা যেমন বাংলাদেশের বাদবাকী সমতল এলাকায় কোন সুফল বয়ে আনেনি তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামেও কোন সুফল বয়ে আনবে না। এই রিপোর্টে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের চুক্তির মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ীদের অগ্রাধিকারের বিষয়টি, এটা প্রধানতঃ পাহাড়ী অধ্যুষিত এলাকা - এই বাস্তবতার স্বীকৃতি মিলেছে, সেই অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন কর্মকান্ডে পাহাড়ীদের অগ্রাধিকারের যে বিষয়টি থাকা উচিত সেই বিষয়টি এই রিপোর্টের মধ্য দিয়ে যথাযথভাবে আসে নাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক এই রিপোর্টে পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়েক শ'র মত আর্মি ক্যাম্প আছে। এখনও পর্যন্ত চুক্তি-উত্তর কালে সেই আর্মি ক্যাম্প প্রত্যাহারের যে দাবীটি এখানকার জনগণের পক্ষ থেকে বার বার করা হয়েছে এবং আমরা বাংলাদেশের সমতলের গণতন্ত্রকামী মানুষেরা যে দাবীটির সাথে একমত সেই দাবীর প্রতিফলন ঘটেনি এই জয়েন্ট রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট মিশনের রিপোর্টে।

চট্টগ্রাম বন্দরকে নিয়ে ষড়যন্ত্রের কথা আমরা জানি। গতবার লংমার্চ হয়েছে। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর মোহনা একটি মার্কিনী কোম্পানীকে ১৯৮ বছরের লীজ দেয়ার পাঁয়তারা চলছে। এরকম সারা দেশে যে বিভিন্ন অপতৎপরতা আছে। তেল, গ্যাস নিয়ে ষড়যন্ত্রের কথা আমরা জানি। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের সংগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের সংগ্রাম আসলে মাটির দিক থেকে উঠতে হবে। এখানকার মাটির মানুষের যে উন্নয়নের চাহিদা সেই চাহিদার সাথে সংগতি রেখে এখানকার উন্নয়নের নীতি নির্ধারণ করতে হবে। উন্নয়নের নীতি তৈরীতে, কৌশল তৈরীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের যারা প্রতিনিধি তাদের বক্তব্য, তাদের ভাবনার প্রতিফলন করতে হবে। তা যদি না হয় তাহলে এই তথাকথিত উন্নয়ন কর্মকান্ড পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আসলেই কোন সুফল বয়ে আনতে পারবে না। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা যে সুখী, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন, সারাদেশের এবং বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের জন্য যে দিক নির্দেশনা তিনি হাজির করেছেন সেই দিক নির্দেশনার প্রতি আমার পরিপূর্ণ আস্থা এবং তাঁর প্রতি আমাদের সুগভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সংগ্রাম দীর্ঘজীবি হোক। □

এম এন লারমা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের মুক্তি সংগ্রামের নেতা নন, তিনি গোটা বাংলাদেশের নেতা।

....

হায়দার আকবর খান, পলিটব্যুরো সদস্য, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

....

মাননীয় সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট জনসংহতি সমিতির প্রিয় নেতা শ্রদ্ধেয় জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, ঢাকা থেকে আগত বন্ধু মঞ্জুরুল আহসান খান, পংকজ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ ও এই অঞ্চলের ভাই ও বোনেরা। আমার পক্ষ থেকে, আমাদের দল ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ থেকে জুম্ম জাতির মহান নেতা, জুম্ম জনগণের মুক্তি সংগ্রামের মহান নেতা, সমস্ত মেহনতী মানুষের মুক্তি সংগ্রামের দিশারী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

একটি জাতিকে, অনেকগুলি ছোট ছোট জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে মুক্তি সংগ্রামে প্রেরণা দিয়েছিলেন, জাগিয়ে তুলেছিলেন একজন মানুষ বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। শুধুমাত্র এই অঞ্চলের নয়, বাংলাদেশের এবং সমগ্র পৃথিবীর যে সমস্ত জাতি মুক্তি সংগ্রামে যে সকল নেতা ছিলেন তাদের কাতারে স্থান রয়েছে তাঁর। একটা জাতি, নিপীড়িত জাতি, নির্যাতিত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রাম যখন সহজভাবে হলো না, শান্তি পূর্ণভাবে হলো না তখন বাধ্য হয়ে তাকে অন্য পথ বেছে নিতে হয়েছিল। তখনই এক কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন। দেশে দেশে বিপ্লবী নেতারা আততায়ীর হাতে নিহত হন। প্রতিক্রিয়াশীলরা তার মৃত্যু চায়। জার্মানের মেহনতী মানুষের মুক্তি সংগ্রামের এক নেতাও একইভাবে আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা শুধু এই পার্বত্য চট্টগ্রামের মুক্তি সংগ্রামের নেতা নন, তিনি গোটা বাংলাদেশের জাতিগোষ্ঠীর প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি প্রস্তাব রেখেছিলেন যে, সমস্ত বাংলাদেশের জাতিগুলোকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা, বেদনার কথা এবং একজন বাঙ্গালী জাতির অংশ হিসেবে এটা আমার জন্য খুবই লজ্জার কথা যে, সেদিন বাঙ্গালী জাতির জাত্যাভিমান এই পর্যায়ে গিয়েছিল যে, এখানকার আদিবাসীদের বলা হয়েছিল যে তোমরা বাঙ্গালী হয়ে যাও। কি করে বাঙ্গালী হবে? তাদের ভাষা আলাদা, তারা ভিন্ন জাতির অন্তর্ভূক্ত। জোর করে কি তাদেরকে বাঙ্গালী বানানো যায়?

এখন জামায়াতে ইসলাম, বিএনপি সবাইকে জোর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে চায়। ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা স্বাধীন জাতির, গণতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়, আমরা গ্রহণ করতে পারি না। আমি যে আদর্শ বিশ্বাস করি সে আদর্শ বলে যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং সেটা সম্ভব যদি প্রতিটি জাতি স্বমর্যাদার ভিত্তিতে হয় এবং সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। সংখ্যায় ছোট-বড় হতে পারে কেউ, কিন্তু সবাইকে সমানভাবে সম-মর্যাদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এজন্য কোন এলাকা যদি বিশেষ জাতি দ্বারা অধ্যুষিত হয় সেই এলাকায় স্বায়ত্বশাসনের দাবী আমরা করি, আপনারাও করেন। এই দাবীর প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন ছিল। শুধু নয়, এটা আমাদের ঘোষণাপত্রেও অন্তর্ভূক্ত ছিল। অবশ্যই অনেক চরাই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে চুক্তি সম্পাদিত হল। অনেক দাবী ও বাস্তবতার ভিত্তিতে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। সরকার বাধ্য হয়েছিলেন চুক্তি সম্পাদন করতে। কিন্তু বিগত সরকারও চুক্তিকে নিয়ে তালবাহানা করেছে, বর্তমান সরকারও করছে। আমি শুধু সরকারকে বলতে চাই, ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ থেকে, বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে বলতে চাই, যে চুক্তি করা হয়েছে তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করতে হবে। □

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার যে আদর্শ সেই আদর্শকে কোনদিন কেউ হত্যা করতে পারবে না।

মঞ্জুরুল আহসান খান, সভাপতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

জুম্ম জনগণের, পার্বত্য চট্টগ্রামের এবং বাংলাদেশের মেহনতী, বিপ্লবী জনগণের বিপ্লবী নেতা সন্তু লারমা, অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, জুম্ম ভাই ও বোনেরা এবং আমার বাঙালী বন্ধুগণ। আমাদের দেশের মহান নেতা, জুম্ম জনগণের মহান নেতা, এক সাহসী যোদ্ধা, একজন মহান মুক্তিযোদ্ধা, বিপ্লবী এবং মেহনতী মানুষের নিবেদিত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রতি কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

আমাদের দেশে বহু লড়াই সংগ্রাম হয়েছে বৃটিশের বিরুদ্ধে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে। বারবার আমাদের দেশের মানুষ লড়াই করেছে, সংগ্রাম করেছে, অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে, রক্ত দিয়েছে। বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রথম লড়াই করেছিল আদিবাসীরা। তারা বিদ্রোহ করেছিল, লড়াই করেছিল। সেইসব বিদ্রোহকে দমন করার জন্য বৃটিশ বর্বর নির্যাতন নির্যাতন চালিয়েছে। কিন্তু আদিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করতে পারে নাই। সেই সংগ্রামের পথ ধরে আমাদের পার্টির নেতা কমরেড মণি সিং ময়মনসিং-এর গারো-হাজংদের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই সংগ্রামের পথ ধরে তেভাগা আন্দোলন, টংক আন্দোলন হয়েছে। সেই সংগ্রামের পথ ধরে আমাদের পার্টির কমরেড মানিক দত্ত সিলেটের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই আন্দোলনের পথ ধরে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন আমাদের নেত্রী, বাংলাদেশের কিংবদন্তী কমরেড় ইলা মিত্র। সেই আন্দোলনের পথ ধরে সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই সাথে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রতিক কালের বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তাকে হত্যা করা হয়েছে। তার সঙ্গে তার সহকর্মীদের হত্যা করা হয়েছে। এখনও হত্যা করা হচ্ছে বাইরে থেকে, ভিতরে থেকে। কিন্তু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার যে আদর্শ সেই আদর্শকে কোনদিন কেউ হত্যা করতে পারবে না। একটি জাতিকে কোন শক্তি কোন দিন রুখতে পারবে না, তাদের সংগ্রাম এগিয়ে যাবে।

বাঙালী জাতির একদিন মুক্তি সংগ্রাম হয়েছিল। বাংলাদেশের সমস্ত জনগণ সেই মুক্তি সংগ্রাম করেছিল। আদিবাসীরা সেই লড়াই করেছিল। পাকিস্তানের শোষকশ্রেণী যারা পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের উপর শোষণ চালিয়েছে সেই সামন্ত জমিদার শ্রেণী, একচেটিয়া পুঁজিবাদ শ্রেণী, সাম্রাজ্যবাদী শোষক, তাদের অত্যাচার, তাদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ বিদ্রোহ করেছিল এবং অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। সেদিন বাঙালী জাতীয়তাবাদ আমাদের লড়াইকে অনুপ্রাণিত করেছিল। জাতীয়তাবাদের দুটো দিক আছে। একটা নিপীড়িত জাতি যখন বিদেশী নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করে তখন সেই জাতীয়তাবাদের একটা প্রগতিশীল দিক থাকে। আবার সেই জাতির মধ্যে যে শোষকশ্রেণী, পুঁজিবাদ শ্রেণী, ধনীক শ্রেণী, তারা সেই জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করে নিজের শ্রেণীর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। সেটা হচ্ছে জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়াশীল দিক। আমরা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে শোষণ থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম। কিন্তু বাঙালী জাতির মধ্যে সেই ধনীক শ্রেণী, লুঠেরা প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী আমাদের স্বাধীনতা, স্বাধীনতার স্বপ্নকে, ক্ষমতাকে ছিনিয়ে নেয় তাদের নিজস্ব শ্রেণীর আধিপত্য বিস্তার করার জন্য চেষ্টা করে। তাই লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। যে বাঙালী জাতি একদিন বিদেশী শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, সেই বাঙালী জাতির নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে গণহত্যা চলেছে এবং আজও নির্যাতন চলছে, দমন নীতি চলছে। শুধু পার্বত্য অঞ্চলে নয়, আলফ্রেড সরেনকে হত্যা করা হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় শোষণ নির্যাতন হচ্ছে। প্রত্যেকটা আদিবাসীদের উপর নির্যাতন, অত্যাচার নেমে এসেছে। আজকে আমাদের সেই শ্রেণীকে চিনতে হবে, যেই শ্রেণী লুঠেরা ধনীক শ্রেণী এবং বিদেশী শক্তির দালালরা, যারা আমাদের দেশের সম্পদ বিদেশের হাতে তুলে ধরছে, যারা ক্ষমতার মসনদে তারাই আজকে আদিবাসীদের উপর, জুম্ম জনগণের উপর শোষণ করছে। তারাই আজকে বাঙালী জনগণের উপর শোষণ চালাচ্ছে। তাই আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে।

জুম্ম জাতীয়তাবাদ - যে জাতীয়তাবাদ নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে - তাকে আমরা সালাম জানাই। কিন্তু সেই সাথে আপনাদের আমি সতর্ক করতে চাই, জুম্ম জনগণের যে লড়াই সে লড়াই বাঙালী জাতির বিরুদ্ধে নয়; বাঙালী জাতির মধ্যে যারা মীরজাফর, কুলাঙ্গার, যারা মুক্তিযুদ্ধের

সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে চলে গিয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে চুক্তি হয়েছে কিন্তু সেই চুক্তিকে কার্যকর করা হচ্ছে না। অতীতে যারা সরকারে ছিল তারাও চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। শুধু লঙ্ঘন করে নাই নানাভাবে ষড়যন্ত্র করেছে, নানাভাবে চক্রান্ত করেছে। আজও যে সরকার ক্ষমতায় আছে তারাও চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না। আমরা কমিউনিস্ট পার্টি, বাম গণতান্ত্রিক দল, ১১ দল সুস্পষ্টভাবে দাবী জানাই, যে চুক্তি করা হয়েছে সেই চুক্তির বাস্তবায়ন পরিপূর্ণভাবে করতে হবে। এই চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রাম শুধু জুম্ম জনগণের সংগ্রাম নয়, এটা বাংলাদেশের সংগ্রাম। সারা বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে করতে হবে।

আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, আজকে বহু শক্তি আছে আমাদের ভিতরে এবং বাইরে যারা মুখে ভাল কথা বলেন কিন্তু আসলে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়। আমাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করতে চায়। আমাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চায়। আমাদের মধ্যে জাতিতে জাতিতে সভ্যতায় বিভেদ সৃষ্টি করে দিতে চায়। হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা হল। বলা হল পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্র হলে সমস্যার সমাধান হবে। হিন্দু রাষ্ট্র ভারত হয়ে গেলে সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু আজও পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। তারপরও সমস্যার সমাধান হয় নাই। হিন্দু মরছে, মুসলিম মরছে, জায়গায় জায়গায় সন্ত্রাস চলছে, সাম্প্রদায়িকতা চলছে। এ এক ভয়াবহ সংকট। আজকে সারা দুনিয়াতে যারা লুটপাট চালায় তারা জনগণের মধ্যে এভাবে বিভেদ সৃষ্টি করে। তাদের সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

কেউ যদি মনে করেন, জুম্ম জনগণকে, আদিবাসীকে নিশ্চিহ্ন করে শান্তিতে থাকতে পারবেন। কেউ থাকতে পারবে না। যদি আদিবাসীরা মনে করেন বাঙালীদের নিশ্চিহ্ন করে শান্তিতে থাকতে পারবেন। কেউ শান্তিতে থাকতে পারবেন না। আমি রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি - পশ্চাতে ফেলিছ যারে, সেই তোমারে টানিছে পশ্চাতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের পেন্টাগণ, হোয়াইট হাউস, টুইন টাওয়ার-এর দম্ভ মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তারা রক্ষা করতে পারেনি তাদের নিরাপত্তা। কেউ যদি মনে করেন সামরিক শক্তির দাপটে, আধুনিক অস্ত্রের দাপটে, জনসংখ্যার বৃদ্ধির দাপটে কাউকে নিশ্চিহ্ন করা যায় তাহলে এটা ভুল কথা। এখানে বাঙালী মরেছে, আদিবাসী মরেছে এবং যারা দালালী করেছে তারাও মরেছে। আমরা যেমন জুম্ম জনগণের মৃত্যুতে বেদনাহত হয় ঐ সামরিক বাহিনীর কেউ মৃত্যুতে তেমনি আর একটা মায়ের বুক খালি হয়ে যায়। নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করতে হবে। আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে হবে।

পার্বত্য এলাকায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় যারা আদিবাসীরা বসবাস করে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের সম্পদ। সেখানে একথা বলা যাবে না, বেকার অর্থনীতি। সেখানে আমি যাব জমি কিনে কাজে লাগাবো এটা বলা যাবে না-- একই তো দেশ। বাংলাদেশের ভিন্ন তো নয়। জামাতে ইসলামের লোকেরা তাই বলে। আমি অবশ্য জামাতে ইসলাম বলি না। আমি বলি জামাতে আমেরিকান। কেননা, ইসলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমেরিকা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিল। জামাতও মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিল। আমেরিকা তেল-গ্যাস রপ্তানি করতে চাচ্ছে জামাত সেটাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমেরিকা আদমজী জুট মিল বন্ধের পক্ষে ছিল। জামাতও সমর্থন করেছিল।

এখানে জমি দখল করা হচ্ছে। বাইরে থেকে সেটেলার আনা হচ্ছে। যারা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন এখানে ছিলেন যাদের বাপ-দাদার কবর এখানে হয়েছে তাদের জন্যও জুম্ম জনগণের পাশাপাশি তারা লড়াই করবেন। কিন্তু যাদেরকে পরিকল্পিতভাবে নিয়ে আসা হয়েছিল এই অঞ্চলে এবং বলা হয়েছিল জমি দখল করার জন্য। সেই ১০০ বছর আগে প্যালেস্টাইনে বর্গীনীয় শাসক সেই উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে, প্যালেস্টাইনের জমি কিনে নেয়া হবে। চাঁদা কালেকশন করা হল। আস্তে আস্তে জমি কিনে নেয়া হল এবং আস্তে আস্তে প্যালেস্টাইনের জনগণ সেই এলাকায় পরবাসী হয়ে গেল। সেখানে মুসল্লীদের উপর অত্যাচার, প্যালেস্টাইনী খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার। প্যালেস্টাইনী জনগণের উপর অত্যাচার। তাহলে একই মাপকাঠিতে জুম্ম জনগণের জমির উপর অধিকার, তার পাহাড়ের উপর সেই অধিকারের প্রতি আমার দৃঢ় সমর্থন জানাতে হবে- এটা হচ্ছে নৈতিকতার প্রশ্ন।

আজকে জুম্ম জনগণ, আদিবাসীরা আমাদের গৌরব, বাংলা প্রকৃতিরই একটি অংশ। এই জনগণ এই প্রকৃতির সঙ্গে বসবাস করে, এই গাছের সঙ্গে, এই বনের সঙ্গে, এই হরিণের সঙ্গে, এই পাখীর সঙ্গে বসবাস করে। আজ এই জুম্ম জনগণকে রক্ষা করার লড়াই, আদিবাসীদের রক্ষা করার লড়াই, প্রকৃতিকে রক্ষা করার লড়াই। ডেভেলাপমেন্ট আমেরিকানরা শেখায়, ইউরোপীয়ানরা শেখায় ওটা ডেভেলাপমেন্ট না, এগ্রেশান। তারা ধ্বংস করে দেয়। তারা সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। তারা পাহাড় কেটে ফেলছে, খাল ভরাট করছে, গাছপালা শেষ হয়ে পাহাড়ের গাছপালা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। কিছু লোক অস্ত্র উঁচিয়ে বসে আছে। পাশ দিয়ে গাড়ী চলে যাচ্ছে। ট্রাক প্রতি এক হাজার টাকা। বাংলাদেশে ৮ হাজার কলকারখানা বন্ধ, এদেশের সাড়ে তিন কোটি মানুষ বেকার। পৃথিবীতে বহু দেশ আছে যার লোকসংখ্যা এক কোটি নয়। এদেশে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি মানুষ পেট ভরে খেতে পারে না। এদেশে প্রতিদিন ৫ বছরের নীচে ৭০০ শিশু অপুষ্টিতে মৃত্যুবরণ করে। এদেশে শতকরা ৪০

ভাগ মানুষ কোন রকম শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এদেশে দারিদ্র, বেকারত্ব সমাজ ভেঙ্গে চুরচুর হয়ে যাচ্ছে। সমাজে পচন ধরে যাচ্ছে। কি ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে। এদেশে কিভাবে মানুষের কর্মসংস্থান হবে, কিভাবে বাঙ্গালীর কর্মসংস্থান হবে, কিভাবে জুম্ম জনগণের কর্মসংস্থান হবে? কৃষির ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের সময় চার আনির কৃষক ছিল ভূমিহীন, আজকে বারো আনার উপরে কৃষক ভূমিহীন। কৃষকদের জায়গা-জমি নাই। কিভাবে বাঁচবে? শিল্প কারখানা বন্ধ। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফরই নির্দেশে বাংলাদেশ চলে। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি, স্বাধীন করেছি বিদেশী হুকুমে চলার জন্য নয়। আমরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তিনি অনেকের কাছে সাহায্য নিয়েছেন কিন্তু মাথা নত করেননি। বিরোধী শিবিরের কাছেও না। সাহায্যের নামে যারা এগিয়ে এসেছে তাদের কাছেও মাথা নত করেন নাই। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও বাইরে থেকে যেমন ষড়যন্ত্র হয়েছিল, শত্রুতা হয়েছিল ভিতরে থেকেও পুতুল বানানোর জন্য। লারমা কোনদিন পুতুল হন নাই। তিনি আমাদের পার্টির কমরেড ছিলেন। তিনি স্বাধীনভাবে লড়াই করে গিয়েছেন আমাদের জুম্ম জনগণের স্বার্থে। তাদের প্রতীক হয়ে উঠেছেন সারা বাংলাদেশে স্বাধীনতা এবং মুক্তি সংগ্রামের মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। মান্নান ভূঁইয়া মুক্তিযুদ্ধ করেছে, খোকা মুক্তিযুদ্ধ করেছে, আওয়ামী লীগের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ করেছে। কিন্তু তারা সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে যাচ্ছেন বিদেশী শক্তির কাছে। আজকে তাদের হুকুমে আদমজী বন্ধ, কলকারখানা বন্ধ। আমার দেশ বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছে। আজকে তাদের জন্য বিদেশীর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে। কীটনাশক ঔষধ এনে আমরা নষ্ট করে ফেলছি আমাদের পরিবেশ। শিল্প কারখানা ধ্বংস হয়ে যাবার পর এখন আবার মাটির নীচে আছে গ্যাস তেল আবিষ্কার করেছে আমাদের দেশের বিজ্ঞানী। কিন্তু সেই গ্যাস বিক্রি করে দেয়া হল। জাতীয় পার্টির নেতা এরশাদ সাহেব, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের নেত্রী শেখ হাসিনা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের নেত্রী খালেদা জিয়া ভাগ করে সেই গ্যাস বিক্রি করলেন। আমার দেশের গ্যাস আমাদেরকে আবার তিনগুণ দাম দিয়ে কিনে নিতে হচ্ছে। তাও আবার বিদেশী মুদ্রায়।

আমার দেশের বিদ্যুৎ ছিল ধ্বংস করা হয়েছে। সেখানে এখন জেনারেটর বসানো হয়েছে। সেই জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আমার দেশের সরকারকে সেই বিদ্যুৎ কিনতে হয়। প্রথম বছর এক হাজার কোটি টাকার বিদ্যুৎ কিনতে হয়েছে। পরের বছর আড়াই হাজার কোটি টাকার এবং এখন তিন হাজার কোটি টাকার। বিদ্যুৎ কিনতে গিয়ে সরকার ফতুর হয়ে গিয়েছে। আদমজী লোকসান করে, চট্টগ্রাম বন্দর লোকসান করে না। ১০০ কোটি টাকার উপরে জিনিস কিনে আনছে। ওটাকে আরও ভালভাবে করতে দিল না। ওটাকে যদি আরও ভালভাবে করা হয় আগামী ৩০ বছর কোন বন্দরের প্রয়োজন হবে না বাংলাদেশে। এখানে সমুদ্রের পাশে ঐ বন্দরের উপরে একটা বন্দর করা হবে। আমেরিকানরা ঐ বন্দর করবে। আইনে আছে কাউকে ৩০ বছরের বেশী লীজ দেয়া হবে না। ওটা ১৯৮ বছরের জন্য লীজ দেয়া হবে। কিসের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, কিসের বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, সব হচ্ছে আমেরিকান জাতীয়তাবাদ। যারা সরকারে আসছে সব হচ্ছে মেড ইন লুঠেরা ধনী, মেড ইন আইএমএফ, মেড ইন আমেরিকা।

রাষ্ট্রচরিত্র বুঝতে পারবেন না। এখানে মিলিটারীরা চেক করে সিভিলিয়ানদের। এখানে চেক করবে না? ওখানে আমেরিকান শিবির হবে, ওটাকে ব্যবহার করা হবে বার্মার বিরুদ্ধে, ওটাকে ব্যবহার করবে সমাজতান্ত্রিক চীনের বিরুদ্ধে, ওটাকে প্রয়োজনে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। আদভানি সাহেব বলছেন, বাংলাদেশে তালেবান আছে। কারণ তিনিও এখানকার গ্যাস কিনতে চান। ওখানেও লংমার্চ করে আসলাম, এখানেও। ২৬৫ কিমি লংমার্চ করে আসলো হাজার হাজার বৃদ্ধ, তরুণ, যুব। আমরা বিদেশী শক্তির কাছে বন্দর বিক্রি করব না।

সাম্প্রদায়িকতা ভারতে, সাম্প্রদায়িকতা বাংলাদেশে। ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের সেই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আমাদের সাথে রাষ্ট্রদ্রোহিতা করে যারা তারা বরাবরই গ্যাস বিক্রি করে দিচ্ছে, বিদ্যুৎ বিক্রি করে দিচ্ছে, আদমজী বন্ধ করে দিচ্ছে। ২৪ লক্ষ মানুষ কর্মচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। এক কোটি মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখন প্রয়োজন হচ্ছে আরেকটা লড়াই। আরেকটা যুদ্ধ। সেই যুদ্ধ সবাই মিলে করতে হবে। আমরা অনেকে মনে করি যে আগে সাম্প্রদায়িকতা দূর করি তারপর সমাজ বিপ্লব। শেখ সাহেব বললেন, আগে বাঙ্গালী স্বাধীন হোক তারপর সমাজতন্ত্র হবে।

যারা শোষণ করে, তারা সম্প্রদায়ের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দিয়েছে সেই সম্পত্তির উপর তার প্রভূত্ব বজায় রাখতে। ভারতবর্ষে দেখেন শুধুমাত্র যেখানে বামপন্থীরা আছে, কমিউনিস্টরা আছে সেখানে সাম্প্রদায়িকতা কোন তাপ ফুটাতে পারে নাই। তাপ ফুটাতে পারে নাই পশ্চিমবঙ্গে, তাপ ফুটাতে পারে নাই কেরালায়। কাজেই এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, সমাজ বিপ্লব করতে হবে। সারা বাংলাদেশের জন্য যদি আসেন এবং আমরা যদি বাম প্রগতিশীল নেতৃত্বে একটা ইউনাইটেড ফ্রন্ট করে বাংলাদেশে সরকার কায়েম করতে পারি তাহলে জাতিগত শোষণ বন্ধ হবে। আমরা জয়যুক্ত হবো। এই জাতীয় মুক্তির লড়াই, সমাজ বিপ্লবের লড়াই পরস্পর সম্পর্কিত।

আমাদের সামনে আরেকটা মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দেয়া হয়েছে। সেই মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন

বৃথা যেতে দেব না। আমরা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্বপ্ন বৃথা যেতে দেব না। আসুন আমরা সবাই মিলে বাংলাদেশে আরেকটা মুক্তিযুদ্ধ গড়ে তুলি। সেই মুক্তিযুদ্ধে আমি আহবান জানাই। মুক্তিযুদ্ধে আমরা যেমন দল-মত নির্বিশেষে মিলিত হয়েছিলাম এই মুক্তিযুদ্ধেও সেনাবাহিনী, বিডিআর, আনসার, পুলিশ, সাধারণ জনগণ, আদিবাসী সকলে ঐক্যবদ্ধ হই। এই মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করতে হবে। এই হোক আজকের শপথ। আবার কমরেড মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রতি আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে জানাই লাল সালাম।□

জুম্ম জাতির মৃত্যুঘন্টা প্রথম বাজে সেই দিন যেই দিন এই কাপ্তাই প্রজেক্ট সৃষ্টি হয়।

পংকজ ভট্টাচার্য,
প্রেসিডিয়াম সদস্য
গণ ফোরাম

এ দেশের বীর, এ অঞ্চলের মানুষের প্রিয় নেতা জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, মহান শহীদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকীর স্মরণ সভায় সভাপতি, মাননীয় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতীক, জনসংহতি সমিতির সভাপতি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, মঞ্জু ভাই, রুনু ভাইসহ নেতৃবৃন্দ, সঞ্জীব দ্রং, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি ও স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, মহিলা সমিতিসহ জনসংহতির সর্বস্তরের নেতা কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার প্রিয় নেতা জুম্ম জনগোষ্ঠীর নেতা, বাংলাদেশের অন্যতম নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পবিত্র স্মৃতির প্রতি গণ ফোরামের পক্ষ থেকে, ১১ দলের পক্ষ থেকে, সম্মিলিত জোটের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শোক প্রকাশ করছি এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

এই বিপ্লবী নেতার সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ১৯৫৮ সনে। ৫৮-৫৯ এই দু'বছর একসাথে পড়াশুনা করেছিলাম চট্টগ্রাম কলেজে। '৫৯ সনে উনি এক লেখা লেখেন ইত্তেফাক পত্রিকায়। সেই লেখাতে তুলে ধরেন জুম্ম জনগোষ্ঠীর উপর নীরব হত্যাকান্ডের কাহিনী। সেই হত্যাকান্ড শুরু হয় জুম্ম সংস্কৃতি, জুম চাষাবাদ, জুম বৈশিষ্ট্যগুলো নিঃশেষ করার জন্য। এসব করার পিছনে তৎকালীন পাকিস্তানী আইয়ুব-ইয়াহিয়া সরকার এবং তারও পূর্বে ইস্কান্দার মির্জা সরকারের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোকে নিঃশেষ করার যে নীল নক্সা ছিল তারই অংশ হিসেবে এই কাপ্তাই বাঁধ। জুম্ম জনগণের প্রথম অশ্রু বিসর্জন ঘটেছিল এই কাপ্তাই বাঁধে। হাজার হাজার একর জমি প্লাবিত হয়ে যায়। জুম্ম জনগোষ্ঠীকে তার সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত করা হয়। জুম্ম জাতিকে বঞ্চিত করা হয়। তাদের ঠেলে দেওয়া হয় খাগড়াছড়ির দিকে, ঠেলে দেয়া হয় সমতলের দিকে। জুম্ম জাতির মৃত্যুঘন্টা প্রথম বাজে সেই দিন যেই দিন এই কাপ্তাই প্রজেক্ট সৃষ্টি হয়। সেই কাহিনী লিখেছিলেন তিনি; আমার যদ্দুর মনে পড়ে ১৯৫৯ সনে। লেখাটির পরে গোয়েন্দা বাহিনীর তৎপরতায় তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা হয়। তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের মত রাখা হয় মাসের পর মাস। সেই সময় এক মাস আমি তার সাথে ছিলাম। সেই মাসটি হল ১৯৬৪ সালে এপ্রিল কি মে মাস। সে সময় কনভোকেশন আন্দোলন করে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে সময় ছিলেন পূর্ণেন্দু দস্তিদার, সাইফুদ্দিন আহমেদ। আর আছে একজন নেতা দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীর মর্যাদা নিয়ে তিনি হচ্ছেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। সেই খবর পেয়ে আমি আমার প্রিয় বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করি পুলিশকে ঘুষ দিয়ে। দৈনিক তার সাথে কথাবার্তা বলার সুযোগ নিতাম। কারণ আমি থাকতাম এক জায়গায় উনি আরেক জায়গায়। প্রেসক্লাবের উল্টো দিকে যে ভবনটা এখনও আছে ঐ বিল্ডিংয়ের দোতলায় এক সাথে ঘুমিয়েছি, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে।

আমি আগেও এ অঞ্চলে এসেছি। '৮০-র দশকে এসেছি, '৭০-র দশকে এসেছি। চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরও দেখেছি একটা অঘোষিত শ্রেণী বৈষম্য চলছে। এর আগে আমি '৮০-র দশকে এসেছিলাম। আমি তখন দেখেছি বাস থেকে নামিয়ে নামিয়ে দেখছে। যারা বাঙ্গালী তাদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। পাহাড়ীদের বিশেষ করে তরুণ যারা তাদের ধরে নেয়া হচ্ছে। এই হচ্ছে তাদের দুর্নীতি। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক কথা যে বাঙ্গালী জাতি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং আমাদের উপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে ধরনের অত্যাচার করেছিল সেই বাঙ্গালী জাতি স্বাধীন হবার পর সেই একই ধরনের নির্যাতন করছে বাংলাদেশের একটা বিশেষ অঞ্চলে। বিভিন্ন এলাকায় এখানে যে গণহত্যা করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর অভিযান

চালিয়ে যে জাতি মুক্তি চায়, যে জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার চায় তাকে দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এই যে ষড়যন্ত্র করছেন এর ফল যে কি ভয়াবহ, এভাবে কখনও একটি জাতিকে অবদমিত করা সম্ভব নয় ও করতে যাবেন না। চুক্তি হওয়ার পরে সেই একই সমস্যা রয়েছে। একটা সুষ্ঠু চিন্তায় পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধানের জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ জানাই। এখানে এক ধরনের সামরিক শাসন এখানে চলে। আজকে সন্ত্রাসী ধরার নামে সারা বাংলাদেশে সেনা অভিযান চলছে। যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এ অঞ্চল তো বটেই, এ অঞ্চলের বাইরে সেনা হেফাজতে প্রতিদিন একজন করে মারা যাচ্ছে। আমি সরকারকে এবং সেনাবাহিনীকে হুশিয়ার করে বলতে চাই, বাড়াবাড়ি করবেন না। বাড়াবাড়ির পরিণাম ভয়াবহ। আমি আবার হুশিয়ার করে দিতে চাই, সাবধান করে দিতে চাই, এই পার্বত্য অঞ্চলে এবং বাংলাদেশের কোথাও আপনার বাড়াবাড়ি করবেন না। সেনা হাজতে আজ পর্যন্ত যারা মারা যাচ্ছে তার প্রতিটির মৃত্যুর হিসাব আপনাদেরকে এবং এদেশের মানুষ কড়ায় গন্ডায় হিসাব নেবে। এর জবাবদিহিতা আগামী প্রজন্ম নেবে।

এই বাংলাদেশে বহু জাতি বাস করে। শুধু বাঙালী নয়। বাঙালী জাতি সংখ্যায় বেশী। সংখ্যায় বেশী বলে তাদের দায়িত্ব অনেক বেশী। তাদের জাত্যাভিমানে তারা যদি মনে করে, আমরা মেজরিটি বলে যা খুশি করতে পারবো। আমরা এখানকার অধিবাসীদের জমি দখল করতে পারবো। তাহলে ঐটা কোন বাস্ত বতা হতে পারে না। যে জাতি অপর জাতিকে ছোট করে, নিপীড়ন করে সে জাতি মুক্ত হতে পারে না। আজকে যারা আমরা বাঙালী তারাও মুক্ত নই। তারাও নির্যাতিত, তারাও শোষিত, তারাও তাদের বাস্তব অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাদের যদি এই পার্বত্য চট্টগ্রাম আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আন্দোলনে যুক্ত না করি এবং আমরা যদি বিচ্ছিন্ন থাকি, তাহলে আমরা কোনদিন মুক্ত হতে পারবো না। আপনারা নিপীড়িত, আমরাও নির্যাতিত আমি বলব, বাঙালী শতকরা ৯৭ জন নির্যাতিত। সমগ্র নির্যাতিত মানুষদেরকে একসূত্রে এক গাথায় নিয়ে আসতে হবে। তাহলে পরস্পর বন্ধুত্ব আরও সুদৃঢ় হবে।

তিনি একটা জাতির মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণাকারী এবং তিনি শুধু নিজের জাতি নয় পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের জন্য তিনি পথ দেখিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে সামান্য কিছু পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। আমি তার বক্তব্য শুনেছি। তিনি যখন পার্লামেন্টের মেম্বার ছিলেন, তখন তার সাথে আলাপ হয়েছে এবং তার যে আদর্শ সেই আদর্শ মানব মুক্তির মহান আদর্শ। সেই আদর্শকে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লালন করেছিলেন এবং তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আপনারা তার মৃত্যুর পরেও লড়াই চালিয়ে গেছেন।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা একজন মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি একটা জাতির মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণাকারী এবং তিনি শুধু নিজের জাতি নয় পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের জন্য তিনি পথ দেখিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে সামান্য কিছু পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। আমি তার বক্তব্য শুনেছি। তিনি যখন পার্লামেন্টের মেম্বার ছিলেন, তখন তার সাথে আলাপ হয়েছে এবং তার যে আদর্শ সেই আদর্শ মানব মুক্তির মহান আদর্শ। সেই আদর্শকে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লালন করেছিলেন এবং তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আপনারা তার মৃত্যুর পরেও লড়াই চালিয়ে গেছেন। আমি প্রস্তাব করছি, স্কুলে ছোট ছোট বাচ্চাদের মহান ব্যক্তিদের জীবনী পড়ানো, সেখানে পাঠ্য পুস্তকে যেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। আমি আরও প্রস্তাব করব যে, এই অঞ্চলে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্কুল কলেজ যেগুলো আছে সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে যেন ১০ই নভেম্বর পালিত হয়। এই প্রস্তাব রেখে আমি মাননীয় মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাপন করছি সেইসব বীর শহীদদের যারা আপনাদের এই জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের লক্ষ্যে শহীদ হয়েছেন।

যেখানে ১৯৪৭ সালে ২% বাঙ্গালী ছিল এই হিল ট্র্যাক্টসে, সেখানে আজকে ৫০% এর অধিক বাঙ্গালী আকস্মিকভাবে বিস্ফোরণ ঘটালেন। বাঙ্গালী বিস্ফোরণ ঘটানো একটি স্বাভাবিক ঘটনা নয়। কৃত্রিমভাবে যেমন ওয়েস্ট ব্যাংক অব জর্ডানে করা হলো, ইসরাইলীরা করলেন, তেমনিভাবে করা হয়েছে। শেখ সাহেবের মৃত্যুর কিছু পূর্বে শুরু হলো প্রক্রিয়া এবং সেই '৮০ দশকে পুরোপুরিভাবে শুরু হলো। ৩ হাজার টাকা দিয়ে একটা পরিবারকে বলা হলো তুমি যাও পার্বত্য চট্টগ্রামে, ডিসি সাহেবের কাছে। ডিসি সাহেব একটা চিরকুট লিখে দিলেন - উনি পটুয়াখালীর লোক, উনি বরিশালের লোক, ৩ হাজার টাকা দিয়েছি। এদের একটা ভূমি দিবেন যাতে সে থাকতে পারে। আর রেশন দিবেন ৩৫ কেজি করে। কিন্তু জীবন ধারনের কোন ব্যবস্থা নাই। পানির লোক, চরের লোক এনে এদের কৃত্রিমভাবে বসানো হলো। এখানে এসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতে চাই। এদের তো শিকড় গাড়েনাই, শিকড় গেড়েছে স্থায়ী আদি বাসিন্দাদের। এখানে তাদের বাবার কবর আছে, মায়ের কবর আছে।

আজকে আমি ভীষণ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এসেছি। কালকে এই সময়টাতে আমি ছিলাম মেঘালয়ে যেখানে আপনাদের

চেহারার মানুষগুলো স্বশাসিত একটি রাজ্য চালাচ্ছে। সেখানে শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, প্রশাসন সব তারা চালাচ্ছে সেই খাসিয়া ভাই-বোনেরা। তার আগের দিন ছিলাম আসামে। সেখানে আমার অহমিয়া ভাইয়েরা তাদের রাজত্ব চালাচ্ছে। মঞ্জু ভাইয়ের সাথে আমার দ্বিমত নাই যে সমাজ বিপ্লব ছাড়া সমস্যা সমাধানের উপায় নাই। তারপরও স্বশাসিত হতে পেরেছে আমার মেঘালয়ের আদিবাসী ভাইয়েরা, আসামের অহমিয়া ভাইয়েরা। সেখানেও একটা লড়াই আছে। মনিপুরের ভাইয়েরা-বোনেরা তারা মাথা উঁচু করে বাঁচে। তারা মাটির সন্তান, তারা আদি সন্তান-সেটা আমি দেখে এসেছি। সেখানে ৮০% ভাগ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের মধ্য থেকে হচ্ছে। চাকরী-বাকরী ৮০ ভাগের বেশী তাদের মধ্য থেকে দেয়া হচ্ছে। তাদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা দিয়ে ভারত সংবিধান মেনে নিয়েছে। সেরকম মেনে নিতে হচ্ছে ঝাড়খন্ডে, সেরকম মেনে নিতে হচ্ছে আরও অন্যান্য অঞ্চলে, আরও বিকশিত হচ্ছে। সেখানেও স্বায়ত্বশাসন, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অধিক পরিমাণে দিয়ে ভারতে রাখতে হবে। তাছাড়া কোন রাস্তা নেই। এটাও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফসল। সেখানে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি আজকে এ কথা বলে না-মেঘালয়ে বাঙ্গালী ভাই ঢুকতে পারে না কেন, নাগাল্যান্ডে পারে না কেন, মনিপুরে পারে না কেন, বাঙ্গালী কেন সেখানে ঢুকতে পারে না, সেখানে শিখ কেন পারবে না, পাঞ্জাবী কেন পারবে না? সংবিধান তো সেটা মেনে নিয়েছে। পার্লামেন্ট মেনে নিয়েছে। আমরা সেটা করতে পারিনি। আমাদের সংবিধানে যেটুকু কথা ছিল আমরা জাতিসত্ত্বার স্বীকৃতি দিতে পারিনি। সেটা আমাদের লজ্জার কথা। যুদ্ধ বিজয়ী বাঙ্গালীর এটা প্রথম পরাজয়ের কথা, আমরা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অধিকার দিতে পারিনি। এটাই আমাদের প্রথম পরাজয়। ঐ পরাজয়ের হাত ধরে আরও অনেক পরাজয় হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের নাম নিশানা এখন নাই। এছাড়া যাদের মুক্তিযুদ্ধের নেতা বলি তারাও খারিজ করে দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ।

অনেক আশা নিয়ে বুক ফুলিয়ে আছে মেঘালয়ের পাহাড়ী ভাইয়েরা, আদি বাসিন্দারা। তারা নিজের সংস্কৃতি নিয়ে, ঐতিহ্য নিয়ে, কৃষ্টি নিয়ে, নিজের স্বশাসন ব্যবস্থা নিয়ে শাসন চালাচ্ছে। আর আমার পার্শ্ববর্তী এই পাহাড়ে, আমার এই পাহাড়ের মানুষ, এখানকার আদি বাসিন্দা, এখানকার জুম্ম জনগণ, সেই ১৯০০ সাল থেকে বৃটিশ এখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাদের এখানে অন্যান্য জেলার মত জমি হস্তান্তর চলবে না। এই অধিকার থেকে পর্যন্ত তারা বঞ্চিত। কেন হবে? আজ একবিংশ শতাব্দীতে পা দিলাম। পা দেওয়ার পরে মেঘালয়, আসাম আর আমার ঐ সমস্ত সেভেন সিষ্টারের ভাইয়েরা মাথা উঁচু করে বাঁচছে। আর এখানে পৃথক রাজ্য না হোক, আলাদা অঞ্চল হিসেবে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তু লারমার স্বীকৃতি মানেই পাহাড়ীদের স্বীকৃতি, স্বায়ত্বশাসনের স্বীকৃতি, জুম্ম জনগণের অধিকারকে স্বীকৃতি। ঐ চুক্তি সরকার করেছে, আওয়ামী লীগও করে নাই। বিএনপিরও বিরোধীতা করার সুযোগ নাই। ১১ দল ঐক্যজোটও এই চুক্তি সমর্থন করে কি করে না তার কোন অবকাশ নেই। এটা রাষ্ট্রের চুক্তি। রাষ্ট্র বনাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি। রাষ্ট্র বনাম জাতিসত্ত্বার চুক্তি। যেখানে রাষ্ট্রের পক্ষে একজন আর সন্তু লারমা জনসংহতি সমিতির পক্ষে।

একটা চুক্তি হয়েছে। এর পেছনে সমস্ত আন্তর্জাতিক শক্তি আছে, সারা দুনিয়ার প্রগতিশীল ব্যক্তি আছে, প্রগতিশীল রাষ্ট্র আছে, সারা দুনিয়ার সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আছে। সমস্ত গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ব্যক্তি এই চুক্তির পেছনে আছে। এটা সন্তু লারমার মাথা ব্যথা না, শুধু পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মাথাব্যথা না এই চুক্তি কার্যকর হবে কি হবে না। আর চুক্তিবিরোধী ভাইয়েরা ডিসুম-ডিসুম করেন, এদের কখনো আমি জাতীয় নেতা হিসেবে দেখিনাই। তাদের বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়াও করেছি। ডিসুম-ডিসুম করে কিছু স্বজাতীয় কর্মি হত্যা করে, যারা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পেরেছে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, এত বড় জাতীয় কারনে অস্ত্র ছাড়েনা কখনো আর তাদের হত্যা করলেন? তাদের হত্যা করে লাভবান তারা হবে- সাম্প্রদায়িকগোষ্ঠী, ক্ষমতাসীন চক্র, উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী- যারা আদিবাসীদের হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। আদভানী সাহেবও বড় বড় কথা বলেন মেহনতী মানুষকে নিয়ে। তিনি ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে ঐ অঞ্চলের পোষাক পরেন, ইন্দিরা গান্ধীও গিয়ে ঐ এলাকার পোষাক পরতেন। আমার তো মনে হয় আমাদের কোন জাতীয় নেতা এই এলাকায় এসে আপনাদের মত পোষাক পরেন না। প্রতিক্রিয়াশীল আদভানি সেও মেনে নিয়েছে এই বাস্তবতা। আর আমাদের নেতারা এই বাস্তবতা মানবেন না তাদের নিশ্চিহ্ন করবেন। কথায় কথায় বলবেন - শেখ হাসিনার আমলে যখন বলতাম, তাদের নেতারা তখন বলতেন - চুক্তি করেছি তো থাকুন না, এত অধৈর্য কেন? ওনারা চুক্তিটা এক হাত দেখিয়ে বিশ্বের বড় বড় প্রগতিশীল মানুষের কাছেও সার্টিফিকেট নিয়েছে। মেডেল নিয়েছে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ থেকে।

শেখ সাহেবও বলতেন, আন্দোলনের নানা কৌশল আছে। বিভিন্ন জনকে বিভিন্নভাবে ঠান্ডা রাখতে হয়, কাউকে পকেটে দিয়ে ঠান্ডা রাখতে হয়। সন্তু লারমাদের চুক্তিটা দিয়ে যে যেখানে আছে সব ধরে নিয়ে যান। আর চুক্তি করার পর প্রতিক্রিয়াশীলদের বলা হল, জামাতে ইসলামীদের বলা হল, পার্বত্য অঞ্চলের সেটেলারদের বলা হল চুক্তি করেছি-করেছি। চুক্তি করা এক জিনিস আর বাস্তবায়ন করা অন্য জিনিস। এর নাম জালিয়াতি, এর নাম প্রতারণা, এর নাম একটা জাতির সাথে বেঈমানী। এক বছর হয়ে গেল নতুন সরকার বসেছে। তারাও

ঐ বেঈমানীর রাস্তা ধরেন, জালিয়াতির রাস্তা ধরেন, সেটেলার নেতাকে উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান বানিয়ে ফেলেন, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে সেটেলার বাঙ্গালী প্রতিনিধি বসাবেন তাহলে সন্তু লারমা কি বলবেন আমি তো জানি না। আমি তো বলবো, মানুষ হিসেবে আমার মূল্যায়ণে বলে আমাকে যদি মাথা কেটে দেয়া হয়, আমার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে আমার তো আর একবার অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে। শুধু সন্তু লারমার লড়াই হবে না সেটা, জনসংহতি সমিতির লড়াই হবে না সেটা, আদিবাসী ফোরামের লড়াই হবে না সেটা, এই লড়াই হবে, শক্তি যত ক্ষুদ্র থাকুন, সারা বাংলাদেশে।

আমরা কোণঠাসা। কালো টাকা লুঠেরা ধনীদের রাজত্ব, সন্ত্রাসীদের রাজত্ব, মার্কিন প্রশাসনের রাজত্ব এবং এই লুঠেরা ধনী সন্ত্রাসীদের হাত থেকে দেশটাকে মুক্ত করার লড়াইয়ে আমরা সীমিত শক্তি যারা আছি, সন্তু লারমার পাশে আছি, জনসংহতির পাশে আছি, আদিবাসীদের পক্ষে আছি। এই চুক্তি কার্যকর না করলে যে কোন ধরনের লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত আপনারা নেবেন। আমরা শরীক হবো। এই কথাটা বলছি বড়ই দুঃখের সাথে। গতকালকে তারা আমাকে ফুল দিয়ে বিদায় করেছে, আপনাদের হাতে ফুল নিতে পারি না। কারণ আপনারা অধিকারহারা, নিজ ভূমে পরবাসী। আপনারা চুক্তি হবার পরেও চুক্তি নিয়ে প্রতারণা এবং চালবাজের শিকার। তারপরও আপনাদের একটা সফল সম্মেলন চারদিন ব্যাপি হয়েছে আমি খবর পেয়েছি, পত্রিকায় পড়েছি। এই সম্মেলনে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ৩৩টা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটা জানব আপনাদের নেতাদের কাছে, আগামী দিনের লড়াই-সংগ্রামের পথে এই সিদ্ধান্তগুলো কি কি নেবেন সেগুলো আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সারা বাংলাদেশের দশ ভাগের এক ভাগ অঞ্চল অধিকার বঞ্চিত থাকবে, চুক্তি করার পরও প্রতিদিন চুক্তি লঙ্ঘিত হবে, দেশের এক ভাগ অঞ্চলে সেনা শাসন থাকবে এটা দেখে এসেছি সেই পাকিস্তান আমল থেকে এখনও চলছে। সম্প্রতি সেনা নিয়োগ হচ্ছে এটা নিয়ে বেশি কথা বলব না, বহুবার সেনা নিয়োগ হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন করে কোন রকমের পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সেনা নিয়োগ হতে পারে সিভিল সরকারকে সহযোগিতার জন্য কিন্তু এই সহায়তার নামে যদি আইন হাতে তুলে নেন, মানুষ খুন করেন, সহায়তার নামে দেশের আইন, সংবিধান বাতিল করে দেন কিংবা অকার্যকর করে দেন তাহলে সেটা প্রত্যাশিত হবে না। বাংলার মানুষ বরদাশত করে নাই আগামীতেও করবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সব সময় সামরিক শাসনের অধীন। এখানে সামরিক শাসনের যুগে হত্যা করে গুম করা হয়েছে শত শত যুবককে। কল্পনাকে সেভাবে গুম করা হয়েছে। এরকম আমার অনেক বোন, অনেক ভাই, অনেক বন্ধু এই মাটিতে আজ নাই। এব্যাপারে দুই চারটা মামলা হয়েছে সুপ্রীম কোর্টে, হাইকোর্টে কিছু কাজ হয়েছে। এই ভয়াবহ অবস্থা এখানে চলেছে। চুক্তি হবে আবার ভয়াবহ অবস্থা চলবে, চুক্তি হবে আবার পাহাড়ী জুম্ম জনগণকে স্বায়ত্বশাসন দিয়ে দেব, সন্তু লারমাকে চেয়ারম্যান মেনে নিয়ে প্রশাসন দিয়ে দেব যদিও দেয়া হয়নি অধিকাংশ। বাইরের যারা উদ্বাস্তু তাদের পুনর্বাসিত করব। ভেতরের যারা উদ্বাস্তু তাদের জমি দেব, ভিটা দেব কিন্তু করেন নাই। ভুমি কমিশন আজ পর্যন্ত চালু হয়েছে কিনা আমি জানিনা। ভুমি সমস্যা পাহাড়ীদের। আজকে পাহাড়ীরা নিজ ভূমিতে পরবাসী। এই ভূমি সমস্যার সমাধান ছাড়া চুক্তি অর্থহীন। এই চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হলে যেসব বন্ধুরা বাইরে চলে গেছেন স্বভূমিতে তাদের সসম্মানে পুনর্বাসন করতে হবে, সহায়তা দিতে হবে। অন্যদিকে চুক্তির অংশ হিসেবে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদকে শক্তিশালী করার কথা ছিল, নির্বাচিত জেলা পরিষদ করার কথা ছিল, অধিকার পার্বত্য আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদকে দেয়ার কথা ছিল পরিষদে সংখ্যা বন্টন কিভাবে হবে, কতজন আদিবাসী থাকবে, কতজন বাঙালী থাকবে- সেটা স্বীকার করে নিয়েছেন। তারপরও সেখানে ওয়াদুদ সাহেব নাকি শৃঙ্খলা এনে দেবেন, এমপি বানিয়ে দেবেন আর তিন পার্বত্য জেলাতে তিনজন বসাবেন। এই রকম গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হলে এখানে বিস্ফোরণ হবে, সেই বিস্ফোরণে আমরা সাড়া দেব। আমরা পাশে থাকবো আপনাদের।

আপনারা এখানে যারা বিরোধিতা করছেন, তাদের নিন্দা জ্ঞাপনের ভাষা আমার জানা নাই। তাদের বলেছি, এখনও সময় আছে জাতি হত্যার পথ থেকে ফিরে আসেন, সৎ পথ থেকে ফিরে আসেন। জুম্ম জাতি হত্যার যে পথ আপনারা বেছে নিয়েছেন চুক্তি বিরোধীতার নামে, যে চুক্তি হয়েছে ২২ বছর সংগ্রামের পর, ২২ বছর রক্ত ঝরানোর পরে, সেই চুক্তি হয়েছে আমার অধিকার মেনে নিয়েছে বলে। সামরিকভাবে হত্যা না করে চুক্তি করেছে এক টেবিলে বসে। সেটাকে অগ্রাহ্য করে যারা এখনো চুক্তি মেনে নিতে পারে নাই উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলো, উগ্র জাত্যাভিমানী বাঙ্গালী গোষ্ঠীগুলো তাদের কাজ হাসিল করার জন্য পঞ্চম বাহিনী হিসাবে খীসা সাহেবরা যে কাজ শুরু করেছেন আমার এই মুক্তি আন্দোলনের নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে যে মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছে: জুম্ম জনগোষ্ঠীর, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর, শোষিত মানুষের আন্দোলনকে ছুরিকাহত করে মানবেন্দ্র নারায়ণ শহীদ হয়েছেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে শহীদ করে, তার অগণিত সহযোদ্ধাকে শহীদ করে, এই রাস্তা থেকে ফেরাতে পারে নাই। সঠিক নেতৃত্ব দিয়েছে সন্তু লারমা। সেই নেতৃত্বে আংশিক জয়যুক্ত হয়েছে, চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে উগ্র জাত্যাভিমানী গোষ্ঠী, উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী বাঙ্গালীর তথাকথিত গোষ্ঠী। মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে এই বিজয়, এই বিজয়ের নেতা সন্তু লারমা, এই বিজয়ের সুচনা করে

দিয়েছেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। সেই বিজয়কে মেনে না নিয়ে পথভ্রষ্ট করতে পঞ্চম বাহিনীর মত যে রাস্তা ধরেছেন আমার ভাইয়েরা, চুক্তি বিরোধী ভাইয়েরা, ঐ রাস্তা জাতি হত্যার রাস্তা এবং জুম্ম জাতিগোষ্ঠী হত্যাকান্ডের রাস্তা। সেই হত্যাকারীদের তালিকায় যেমন নাম থাকবে হত্যাকারীদের, ব্রিগেডিয়ার সাহেবদের, তার সাথে আপনাদের নামও লেখা থাকবে আপনারা যদি ঐ রাস্তা থেকে ফিরে না আসেন।

এই আহবান জানিয়ে আমি বলব ২২ বছরের সশস্ত্র সংগ্রাম কঠিন ছিল, পাহাড়ে রাতদিন অমানুষিক দৃঢ়তা নিয়ে যে সংগ্রাম, আর আজকে চুক্তি বাস্তবায়নের; শান্তির পথে, চুক্তির পথে, নিয়মতান্ত্রিকতার পথে, চুক্তির প্রতিটি ধারা বাস্তবায়নের পথে যে লড়াই চলছে ৫ বছর ধরে, এই লড়াই ২২ বছরের লড়াইয়ের চেয়ে আরও কঠিন। এই লড়াই ইয়াসির আরাফাত বোঝে, এই লড়াই বুঝেছে আফ্রিকার মেন্ডেলা, আপনাদেরও বুঝতে হবে। সেই লড়াইকে আমি ভয় পাইয়ে দিতে চায় না। সেই লড়াইয়েও আপনাদের বিজয় হবে। কোন উগ্র শাসকগোষ্ঠী এই চুক্তি অমান্য করতে বাতিল করতে পারবে না এই বাংলার মাটিতে। এখানে অন্তত শুধু জুম্ম জাতিগোষ্ঠী না, আদিবাসী জনগোষ্ঠী না, শুধু প্রগতিশীল ১১ দল আছে তা না, মানবতাবাদী প্রতিটি মানুষ আপনাদের পাশে আছেন, আমার ভাই কামাল ভাই উনারা যতদিন আছেন, বুদ্ধিজীবীরা আছেন, সৎ সাংবাদিকরা আছেন যারা এখনও বলিষ্ঠভাবে এই জুম্ম জাতির কথা তুলে ধরেন পত্রিকায়, মানবতাবাদী আছেন দেশে এবং বিদেশে। এই লড়াই জুম্ম জাতির লড়াই, আদিবাসীর লড়াই, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের লড়াই, চুক্তি বাস্তবায়নের লড়াই, এই লড়াইয়ের মাধ্যমে চুক্তি বাস্তবায়িত হবেই হবে।

এ লড়াইয়ের মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ কথা বলতে চাই, তার মৃত্যু হয় নাই, কোন মহাত্মার মৃত্যু হয় না, তিনি শহীদ হয়েছেন, তিনি অমর হয়েছেন, তিনি বেঁচে আছেন আপনাদের ঐ ২২ বছরের লড়াইয়ের সফল পরিণতিতে। বেঁচে আছেন শান্তি চুক্তিতে। শান্তি চুক্তি বলব না, আমার শান্তি কথাতে আপত্তি আছে। পার্বত্য চুক্তির প্রধান শর্তগুলো বাস্তবায়নে সরকার নিয়েছে কিছু প্রতারণার আশ্রয়। তবে আশার কথা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কথা বলেছেন সন্তু লারমার সাথে। কথা বলেন অন্যান্য মন্ত্রীর সাথে। হস্তক্ষেপ করুন, সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সামাল দিন। উগ্র জাতীয়তাবাদীকে সামাল দিন। যারা পাহাড়ী বাঙ্গালী সংঘর্ষ লাগাতে চায় তাদের থামান। একেবারে হল্ট করে দেন। থামিয়ে দেন এই প্রক্রিয়া। থামিয়ে দিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, সন্তু লারমাকে যুক্তি দিয়ে, জনসংহতি সমিতির নেতাদের যদি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারেন। যেই চুক্তির কথাগুলো আছে সেই চুক্তির কথা অনুযায়ী যদি কার্যকরের পথে অগ্রসর হোন আপনাদের মোবারকবাদ জানাবো। জানি আপনারা প্রতিক্রিয়াশীল। সেই দুর্ভোগ আমার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও এড়াতে পারেননি। তিনি কথা বলেছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সাথে, আপোষও করেছিলেন কিছুটা, চুক্তি দিয়ে নয়। সুতরাং সেই মৃত্যুহীন প্রাণ বেঁচে থাকবে, তেমনি জুম্ম জাতির সংগ্রাম চলবে, আদিবাসীর অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চলবে। চলবে শোষিত মানুষের সংগ্রাম।

আপনাদের সফল সম্মেলনের শেষে যে রাস্তা আপনারা ধরেন আপনাদের পাশে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কৃষক, শ্রমিক, নিম্নবিত্ত মানুষ যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আছেন, সাম্প্রদায়িকবাদী গোষ্ঠী ছাড়া, উগ্র জাত্যাভিমানী মানুষ ছাড়া বাদবাকী সমগ্র শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ আছেন। কিন্তু তারা নীরব। এখন অস্ত্রের জোরে রাজনীতি চলে, কালো টাকার জোরে রাজনীতি চলে। কালো টাকা, অস্ত্রের হাতে হাসিনা-খালেদা জিম্মি, তার দল জিম্মি। সুতরাং বাংলাদেশও জিম্মি, জুম্ম জাতিও জিম্মি। এই জিম্মি দশা থেকে মুক্তি ঘটাতে আজকে আপনারা যে রাস্তা নিয়েছেন আপনাদের সম্মেলনে চুক্তি বাস্তবায়ন, আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠা, আপনাদের ভূমি সমস্যার সমাধান আপনাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবী, ধর্মীয় সংখ্যালঘুর অধিকার, সমস্ত আদিবাসীর অধিকার এই সব কিছু নিয়ে সংগ্রামের পথে আমরা আপনাদের পাশে আছি। সন্তু লারমাকে শুধু পাহাড়ের নেতা বানিয়ে রাখবেন না, শুধু আদিবাসী নেতা বানিয়ে রাখবেন না, জাতীয় নেতা হিসেবে যাতে আমরা তাকে পাই সেজন্য জাতীয় অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে, মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, কৃষক, শ্রমিক, আদিবাসী মানুষ, সাম্প্রদায়িক শোষণে শাসিত মানুষ হিন্দু হোক, বৌদ্ধ হোক তাদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সন্তু লারমা যাতে জাতীয় নেতৃত্বের ভূমিকাও পালন করে। আদিবাসী মানুষের সংগ্রাম এবং জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম, আদিবাসী আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম আর জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম এক পথে। সেই জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে আপনাকে আমরা আহবান জানাই। আমি এই কথা বলে শেষ করব মানবেন্দ্র লারমাও জাতীয় নেতা ছিলেন শুধু আঞ্চলিক নেতা নয়।

১০ই নভেম্বরের

দুঃসহ

মুহূর্তগুলো

আমার এখনও

মনে ভাসে,

অন্তরকে বিদ্ধ

করে

যার যন্ত্রণা

ভাষায় প্রকাশ

করা যায় না।

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা), সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

১০ই নভেম্বর জুম্ম জনগণের সবচেয়ে মর্মান্তিক দিন। এই দিন যথাযথভাবে উদযাপনের লক্ষ্যেই আজকের এই স্মরণ সভা। এই স্মরণ সভার সংগ্রামী সভাপতি, ঢাকা থেকে আগত জুম্ম জনগণের একান্ত আপনজন, বিশ্বস্থ বন্ধু, বাংলাদেশ তথা বিশ্বের মেহনতী মানুষের সংগ্রামী বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ, পার্বত্য অঞ্চলের উপস্থিত সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ, সুধীবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আজকের দিনটা অবশ্যই একটি শোকাবহ দিন। ১৯টি বছর আগে এই দিন জন্মলাভ করে একটা মর্মান্তিক, সবচেয়ে মনে থাকার মত অনাকাঙ্খিত ঘটনার মধ্য দিয়ে। সেই ১০ই নভেম্বর, যে আক্রমণ চার কুচক্রী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ ষড়যন্ত্রে হয়েছিল, সেই আক্রমণে আমিও অন্যতম একজন শিকার ছিলাম। কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেছি। সেই ১০ই নভেম্বরের দুঃসহ মুহূর্তগুলো আমার এখনও মনে ভাসে, অন্তরকে বিদ্ধ করে - যার যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বিভেদপন্থী প্রীতি কুমার চাকমা, ভবতোষ দেওয়ান, দেবজ্যোতি চাকমা ও ত্রিভঙ্গিল চাকমা এই চার কুচক্রী দেশী ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চেয়েছিল। তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারেনি কিন্তু তারা জুম্ম জাতির সবচেয়ে প্রিয়জনকে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে আরও অনেক সংগ্রামী বিপ্লবী বন্ধুকে। শহীদদের অবদান আজকে ১০ই নভেম্বর ২০০২ সালে স্মরণ করছি। সেই সাথে আমি সহানুভূতি জ্ঞাপন করি সেই সব শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের যারা তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে। আজকে আমি তাদেরকেও সহানুভূতি জানাই যারা এই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে শত্রুর আঘাতে আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পঙ্গুত্ব জীবন ধারণ করতে বাধ্য হয়ে তাদেরকে অসমাপ্ত জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। পাশাপাশি আমি ঐ মহান ১০ই নভেম্বরের দিনে যারা এই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে যথাসর্বস্ব দিয়ে জনসংহতি সমিতির সংগ্রামী সদস্যদেরকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, জীবন বাজি রেখে যারা এই জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামে সামনে এগিয়ে এনেছেন তাদেরও স্মরণ করি।

আজকে ১৯ বছর অতিবাহিত হয়েছে। সেই হারিয়ে যাওয়া ১৯টি বছর একটা মানুষের জীবনে কোন মতে কম নয়। আমরা দেখে এসেছি, আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এই পার্বত্যাঞ্চলের বুকে শোষকগোষ্ঠীর অবর্ণনীয় নির্যাতন, নিপীড়ন, দমন-পীড়ন। ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর প্রায় ৫ বছর আগে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেই চুক্তির বাস্তবায়নের দিকে যদি দেখি আমরা দেখতে পাই যে এখানে শুধু চুক্তিটাই কাগজে কলমে লিখিত অবস্থায় রয়েছে। তার বাইরে কোন সম্ভাবনার দিক খুঁজে পাচ্ছি না। আমরা ইতিহাস রচনার জন্য সংগ্রাম করিনি, বিপ্লব করিনি। আমরা আমাদের নির্যাতিত, নিপীড়িত ও মেহনতি মানুষের অধিকারের জন্য, তাদের কর্মের অধিকার; অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও সংস্কৃতির অধিকারের জন্য লড়াই করেছি এবং করে যাব।

আজকে আমাদের দেশের শাসক-শোষকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না করে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকারকামী মুক্তিকামী জনগণকে প্রতারিত করতে চায়। এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়, আমি ধিক্কার দিই, বাংলাদেশের শাসক-শোষকগোষ্ঠীকে। তাদের হীনচরিত্র জুম্ম জনগণের কাছে আড়াল করার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। শেখ হাসিনা সরকারের সাথে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ৩ বছর ৮ মাস তিনি সময় পেয়েছিলেন। তিনি এই ৩ বছর ৮ মাস সময়ে চুক্তির আলোকে যা কিছু করেছেন তাতে আমরা দেখেছি তিনি কিছু সংখ্যক বিশ্বাসঘাতকদের জন্ম দিয়েছেন। তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের শাসক-শোষকগোষ্ঠীর স্বার্থ পুরণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সেই দীপংকর তালুকদার, কল্পরঞ্জন চাকমা, বীর বাহাদুরের মত আরও কিছু সংখ্যক তাবেদার - যারা নিজেদেরস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, তাদের প্রভূদের খুশী করার জন্য, জুম্ম জনগণের অধিকারকে ভূলুন্ঠিত করার জন্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত করার জন্য শেখ হাসিনার সরকার ও তার শাসকগোষ্ঠীরা সেই কুলাঙ্গারদেরকে জন্ম দিতে পেরেছিল।

শেখ হাসিনা সরকার চলে গেছে ৩ বছর ৮ মাস অতিবাহিত করার পর। প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানের আমলেও আর একবার প্রতারণার মুখোমুখি হই। আমরা চুক্তির ভিত্তিতে যে দাবী করেছি যে, পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ী মানুষদেরকে নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু লতিফুর রহমান সরকার, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেই কাজটি করতে পারেননি। অথচ তিনি সেটা করতে বাধ্য। তিনি যে কাজটি করেছেন সেটা হলো সেই অবৈধ নির্বাচনের মাধ্যমে এখানে আবার দীপংকর, কল্পরঞ্জনদের মত কিছু সংখ্যক অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। শুধু সেখানেই তিনি থেমে থাকেননি। লতিফুর রহমান সরকার তথাকথিত পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনপন্থী প্রসিত-সঞ্চয় চক্রকে, সেই জাতীয় কুলাঙ্গার গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চার কুচক্রীর উত্তরসুরী ইউপিডিএফ নামের সন্ত্রাসীদের অত্যন্ত সম্মানের সহিত নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ করে দিলেন। বাংলাদেশের শোষকগোষ্ঠীর অন্যতম হাতিয়ার, অন্যতম পঞ্চম বাহিনী ইউপিডিএফ নামধারী প্রসিত-সঞ্চয় চক্রকে এই নির্বাচনে যোগ দেওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়। নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করল। এই সন্ত্রাসীদেরকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হল। অথচ এ অঞ্চলের জুম্ম জনগণের প্রাণপ্রিয় সংগঠন, বিপ্লবী সংগঠন, বিপ্লবী দল জনসংহতি সমিতি যদি নির্বাচন প্রতিরোধ করে জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ প্রশাসন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জেলা পর্যায়ের উগ্রপন্থী নেতৃত্বের মাধ্যমে বলা হল যে কোন উপায়ে জনসংহতি সমিতিকে ঠেকাতে হবে। যাতে এই তথাকথিত নির্বাচন, অবৈধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

আজকে এই ১০ই নভেম্বরে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমি বলতে চাই যে - জনসংহতি সমিতি পার্বত্য অঞ্চলের বুকে, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে চেয়েছিল। যে জনসংহতি সমিতি যুগ যুগ ধরে পার্বত্য অঞ্চলের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মবলিদানে ভীত না হয়ে জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল, বিসর্জনও দিয়েছিল সেই জনসংহতি সমিতি শুধু পার্বত্য অঞ্চল নয়, গোটা দেশের গরীব মেহনতী মানুষের, বাংলাদেশের সমতলের আদিবাসীদের মৌলিক অধিকারের জন্য লড়াই করে চলেছে। সেই জনসংহতি সমিতির কন্ঠকে ধ্বংস করার জন্য ও অবৈধ নির্বাচনকে যায়েজ করার জন্য লতিফুর রহমান সরকার জনসংহতি সমিতির সভাপতিকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ পর্যন্ত দিয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখেছি লতিফুর রহমান সরকার সেটা করতে পারেনি। জনসংহতি সমিতির কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি।

নির্বাচনের পর বিএনপির নেতৃত্বাধীন এই জোট সরকারের মেয়াদ এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। সেই সাক্ষাৎকারে পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ী এবং স্থায়ী বাঙালীর পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সমস্যা সমাধানের জন্য মৌখিকভাবে যা সম্ভব আবেদন রেখেছিল। লিখিতভাবেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানের আবেদন রেখেছিল। আজ প্রায় ৬ মাস অতিবাহিত হতে চলেছে। কিন্তু আজ অবধি সেই সাক্ষাৎকারের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া প্রতিশ্রুতির কোন সুলক্ষণ দেখতে পাই না। বরঞ্চ আমরা দেখতে পাচ্ছি পার্বত্য অঞ্চলের বুকে আগের মতই অপারেশনের মধ্য দিয়ে সেনাশাসন বলবৎ রাখা হয়েছে। এখানকার বহিরাগত সেটেলারদেরকে পুনর্বাসনের জন্য পুর্বেকার সরকারগুলোর মত বর্তমান সরকারও উঠে পড়ে লেগেছে। এখানকার জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন সেই সেটেলারদের বসানোর জন্য তথা অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

এখানে যারা জেলা প্রশাসনে, সরকারের শাসন বিভাগ, আইন বিভাগে জড়িত তারা কোন না কোনভাবে তারা সবাই সেই ষড়যন্ত্রকে স্বার্থক বাস্তবায়নে ব্যস্ত থাকে। তাই আজকে এই ১০ই নভেম্বরের দিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিল করেননি। আপনি বলেছেন, আপনি পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি আনয়ন করতে চান। সেখানে আপনি আমাকে বলেছিলেন যে, আপনি অবশ্যই আপনার শক্তি অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি আনয়নের জন্য আমাকে সহযোগিতা করবেন। আপনি বলেছিলেন, আমরা চাই পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি ও উন্নয়ন। তবে সেটা হতে হবে সেই অঞ্চলের মানুষের চাওয়া পাওয়া, তাদের যে মৌলিক অধিকার সেই মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে। আপনি বলেছিলেন যে আপনি আমাদের জন্য চিন্তা করেন। আপনি আমাদেরকে ভালবাসেন। কিন্তু আজ অবধি আমরা সেই ভালবাসার ছোঁয়া এখনও পাইনি। আপনার ভালবাসার ছোঁয়া এখনও পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ী বাঙ্গালী স্থায়ী মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। আমরা বরঞ্চ এখানে দেখি দিনের পর দিন রক্তের হোলি খেলা চলছে। এখানে ইউপিডিএফ নামধারী সন্ত্রাসী দল, যে সন্ত্রাসী দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ করার জন্য আমরা আপনার কাছে আবেদন করেছিলাম সেই আবেদনে আপনি এখনও সাড়া দেননি। এখনও পাহাড়ের বুকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী দল রক্তের হোলি খেলা খেলছে। এখানে নিরীহ মানুষদেরকে অপহরণ করে, মুক্তিপণ দাবী করে পার্বত্য অঞ্চলের বুকে সন্ত্রাস-বিভীষিকা সৃষ্টি করে চলেছে। এখনও আপনাদের নিযুক্ত সেনাবাহিনী, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, এখানকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আপনার সরকারের

বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ বরঞ্চ কোন না কোনভাবে সন্ত্রাসী ইউপিডিএফ-কে মদদ দিয়ে যাচ্ছে - যাতে অপকর্ম সুসম্পন্ন করতে পারে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী বাঙ্গালী স্থায়ী মানুষের জন্য যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেই চুক্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে সেই ১০ই নভেম্বরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি আবার এখানে সংঘটিত করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এখানে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার উত্তরসূরী যারা আছে তাদেরকেও এক এক করে প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্ত ১০ই নভেম্বরের জন্ম দেয়া হচ্ছে। এখানে শুধু সন্তু লারমা নয়, এখানে শুধু রূপায়ণ দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম কুমার চাকমা, তাতিন্দ্র লাল চাকমা বা অন্যান্য অনেককের উপর সেই ১০ই নভেম্বরের মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাচ্ছে। এখানে ঘটনা ঘটাতে চাচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্তির জন্য। তাই আজকে এই ১০ই নভেম্বরে দিনে আমি শুধু বলতে চাই যে, পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যদি এই চুক্তি বাস্তবায়িত না হয় এখানে আবার আগুন জ্বলবে, এখানে আবার সংগ্রাম চলবে, পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ থেমে থাকবে না। এখানকার মানুষ জেগে উঠেছে। মানুষের মত বাঁচার অনুভূতি নিয়ে কিভাবে লড়াই করতে হয়, কিভাবে জীবন দিতে হয়, কিভাবে মরতে হয় তা শিখেছে। আমরা প্রমাণ করেছি কিভাবে অধিকার নিয়ে মানুষের মত বেঁচে থাকতে হয়।

বাংলাদেশের উগ্র ধর্মান্ধ, উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ধারক-বাহক এই বাংলাদেশ সরকার তথা বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, বাংলাদেশের দরিদ্র মেহনতি মানুষের, সমতল আদিবাসী মানুষ যারা আজকে বিলুপ্তপ্রায় তাদের উপরও নির্যাতন চালাচ্ছে। এদেশের ১০/১২ কোটি মানুষের মধ্যে শতকরা ৬০ জন মানুষকে প্রতিদিন দু'বেলা আহারের জন্য দুশ্চিন্তায় দিন অতিবাহিত করতে হয়। আমি বলতে চাই, শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের নয়, বাংলাদেশের আরো দরিদ্র মেহনতি আদিবাসী মানুষ তারাও বসে নেই। তারাও চায় মানুষের মত বেঁচে থাকতে। বাংলাদেশের শাসক-শোষকগোষ্ঠী উগ্র জাতীয়তাবাদের শ্লোগানে, মৌলবাদের আড়ালে এদেশের মানুষের বুকে শোষণ নিপীড়ন চালিয়ে যেতে চায়। সাম্রাজ্যবাদের ধারক-বাহক হয়ে তারা এদেশের মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করতে চায়। বাংলাদেশের শোষক-শাসকগোষ্ঠী কোনদিনও পার পেতে পারে না। তাদের সেই অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনার যে কালো হাত গুড়িয়ে দিতে হবেই হবে।

আজকের এই ১০ই নভেম্বরে শোকাবহ দিনে সবশেষে একটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। পার্বত্য অঞ্চলের বুকে আজ দুরবস্থা বিরাজ করছে। এখানে পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ী পাহাড়ী-বাঙ্গালী কারোর জীবনের নিরাপত্তা নাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম আজ একটা বৃহৎ কারাগারে পরিণত হয়েছে। এখানে সেনাবাহিনীর পদচারণা আমাদেরকে সেই ফেলে আসা সেই ২২টি বছরের সংগ্রামের জীবনের যে পরিবেশ সেটা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে পুলিশ প্রশাসন, জেলা প্রশাসনের ভূমিকা আমাদেরকে অতীতের কথা স্মরণ করে দেয়। যে পুলিশ প্রশাসন, জেলা প্রশাসন সেনাবাহিনীর আজ্ঞাবহ হয়ে প্রতিটি মুহূর্তকে অতিবাহিত করতে হতো। সুদুর অতীতের সেই দিনগুলো যে দিনগুলোতে পার্বত্য অঞ্চলের শিশুরা এবং মায়েরা এক অনিশ্চিত জীবন নিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতে হয়েছে - আজকে আমি মনে করি পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক অবস্থা সেই অতীতের অবস্থানে ফিরেয় গেছে। এখানে আমরা যারা পাহাড়ের মানুষ আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি না।

অনেক বাঙ্গালী বন্ধুরা বলেন যে, পাহাড়ে সুন্দর পরিবেশ আছে, বিশুদ্ধ বাতাস পাওয়া যায়, আমি সেই বন্ধুদের, সেই পরিচিত জনদের স্মরণ করে বলতে চাই যে - না, আমি আপনাদের সাথে একমত নই। পাহাড়ের বুকে সেই বিশুদ্ধ বাতাস নেই। এখানে মানুষের লাশের গন্ধ পাওয়া যায়। তাই আমি পাহাড়ী-বাঙ্গালী সকল স্তরের মানুষের কাছে স্মরণ করে দিতে চাই, আজকের মহান নেতার এই ১৯তম মৃত্যু দিবসে, এই ১০ই নভেম্বরে আপনারা আবারও ঐক্যবদ্ধ হোন, সংঘবদ্ধ হোন। আমাদের মধ্যকার সংহতি, আমাদের মানুষের মত বেঁচে থাকার যে সংকল্প সেটা আরও দ্রুত গতিতে সম্প্রসারিত হোক পাহাড়ে-অরণ্যে সকল ক্ষেত্রে। আজকে এই পার্বত্য অঞ্চলের ১১ ভাষাভাষি সবাই আমরা মানুষের মত বেঁচে থাকার জন্য অধিকার আদায়ের লড়াইকে আবার নতুন করে স্মরণ করি। আমাদের অবশ্যই স্মরণ করতে হবে, কারণ আমরা মানুষ, আমরা বেঁচে থাকতে চাই, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সকল মানুষের সাথে সম্প্রীতির বন্ধনে, ভালবাসার বন্ধনে বাংলাদেশের আলো-বাতাসে, সকল পরিবেশে একাকার হয়ে।

তাই আজকে এই শোকাবহ দিনে আমি অবশ্যই মনে করছি সেদিনের কথা যে চার কুচক্রী রাতের অন্ধকারে আমাদেরকে আক্রমণ করেছিল। ক্ষমা করা ভুলে যাওয়া নীতির ভিত্তিতে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেই চুক্তিকে লঙ্ঘন করে চার কুচক্রী দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে আক্রমণ করেছিল। সেই প্রিয়জনদের হারিয়ে আমরা অবশ্যই হতাশা-নিরাশায় নিমজ্জিত হয়েছিলাম বৈকি! বিশেষত আমাদের মহান নেতাকে হারিয়ে। কিন্তু তিনি যে পথ দেখিয়েছেন, তিনি যে শিক্ষা দিয়ে দিয়েছেন, সেই পথের উত্তরসূরী হিসেবে আমরা এগিয়ে চলেছি, এগিয়ে যাবো। আমি বিশ্বাস করি পার্বত্য অঞ্চলের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল জনসংহতি

সমিতির নেতৃত্ব তার নেতার প্রদর্শিত নীতি-আদর্শ কোনদিন ভুলে যাবে না। তারা নেতা প্রদর্শিত পথে পার্বত্য অঞ্চলে নির্যাতিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করে যাবে। তেমনি বাংলাদেশের মেহনতি মানুষের, আদিবাসী মানুষের জন্য তথা বিশ্বের মেহনতি মানুষের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, আমলা পুঁজিবাদ, উগ্র সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। □

প্রয়াত নেতার সেই ত্যাগী আদর্শ বুকে ধারণ করে যাতে আমাদের আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিতে পারি।

মংশাপ্রু কার্বারী, সভাপতি, রামগড় থানা শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

আজ ১০ই নভেম্বর ২০০২ সাল। পার্বত্য চট্টগ্রাম অবিসংবাদিত জাতীয় নেতা শ্রদ্ধেয় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ১৯তম স্মরণ সভা। এই ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ সনে উচ্চবিলাসী, ক্ষমতালোভী, কুচক্রী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ-এর হাতে গভীর রাত্রিতে নির্মমভাবে শহীদ হয়েছেন মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তার সাথে শহীদ হয়েছেন তার সঙ্গী আরো ৮ জন। আমি প্রথমে জানাচ্ছি সকল শহীদদের শ্রদ্ধা এবং শহীদের পরিবারদের প্রতি সমবেদনা।

আপনারা আজকের এই সভার প্রধান বক্তা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি এবং ঢাকা থেকে আগত সম্মানিত অতিথিবৃন্দের মুখ থেকে অনেক কিছু শুনেছেন। ঢাকা থেকে আগত অতিথিবৃন্দ জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একাত্মতা ঘোষণা করাতে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এই স্মরণ সভায় আমাদের প্রয়াত নেতাকে স্মরণ করে বলতে চাই, তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। লোভ-লালসা বলতে প্রয়াত নেতার কিছু ছিল না। সেটা প্রমাণিত করে দেয় ১৯৭৩ সালে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান বলেছিলেন, লারমা সাহেব আপনি কি চান? ঢাকার বুকে তিন তলার ঘর? আপনাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে একচেটিয়া সুযোগ দিয়ে দেব। উনি তখন বলেছিলেন, আপনি আমার ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বলেছেন। আপনি আমার জুম্ম জাতির প্রাণের যে কথা সেই কথা আমাকে বললেন না। জুম্ম জাতির সুখের কথা ভেবে তিনি সব লোভ প্রত্যাখ্যান করেন। প্রয়াত নেতার সেই ত্যাগী আদর্শ বুকে ধারণ করে যাতে আমাদের আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিতে পারি সেই আহ্বান জানিয়ে আজকের স্মরণ সভা এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। □

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

এ যুগের এক শ্রেষ্ঠ মানুষ মহান নেতা এম এন লারমা

সজীব চাকমা

প্রাক কথন

এক.

আজকের দিনের পৃথিবীতে আমরা যত উন্নত জাতি বা সমাজের কথা বলিনা কেন এগুলির কোনটিই অনন্তকাল হতে এমন উন্নত অবস্থায় ছিলনা। অথবা এই উন্নত সমাজ বা জাতিগুলি হঠাৎ এই উন্নত পর্যায়ে এসে পড়েনি। বস্তুত: একটা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য. দিয়ে সেসব সমাজ ও জাতি বিকশিত হয়েছে। স্বর্গ-নরক, বেহেশত-দোজখ বা পূর্বজন্ম-পরজন্মে ঘোর বিশ্বাসী কোন মানুষও বোধ হয় এটা অস্বীকার করতে পারবেন না, যদি তার ইতিহাস বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাথমিক ধারণাটুকুও থাকে। কেননা মানবসমাজ বা বিভিন্ন জাতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান ও পুরাতত্ত্বের বিভিন্ন তথ্য থেকে আমরা জানি যে, প্রতিটি সমাজ বা জাতিই লক্ষ লক্ষ, হাজার হাজার বছরের বিবর্তন, পরিবর্তন বা কখনো কখনো বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আজকের এই অবস্থায় উপনীত হয়েছে। আর এই বিবর্তন, পরিবর্তন ও বিপ্লবের জন্য যেমনি হাজার লক্ষ মানুষের শ্রম ও সংগ্রাম জড়িত, তেমনি যুগে যুগে স্থানে স্থানে বিভিন্ন প্রতিভাবান নেতা, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজসেবক, কবি-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও চিন্ত াবিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রত্যেক জাতিরই কতগুলো সংস্কৃতিগত স্বতন্ত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেমনি রয়েছে তেমনি সকল মানব জাতিরই ক্রমবিকাশের দিক থেকে, ইতিহাসের দিক থেকে রয়েছে একটি সার্বজনীন অনিবার্য বাস্ত বতা। সেটা হচ্ছে সকল জাতিই সুদূর অতীতে আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক জীবন অতিবাহিত করেছিল। সেই পর্যায়ে অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে সমাজে ছিল না কোন শ্রেণী বৈষম্য, শ্রেণী ভেদাভেদ বা শ্রেণী শোষণ-শাসন, যে কারণে সে সমাজকে বলা হয় আদিম সাম্যবাদী সমাজ। পরবর্তী পর্যায়ে যে সমাজগুলিকে আমরা ধারাবাহিকভাবে দেখতে পাই সেগুলি হল- দাসসমাজ, সামন্তসমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ। আজকের দিনে উন্নত সমাজ বলতে আমরা এক কথায় পুঁজিবাদী সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের কথায়ই বুঝি, উন্নত জাতি বলতে এই দুই সমাজব্যবস্থার জাতিকেই বুঝি। যদিও উন্নত ও উন্নয়ন- এই ব্যাপারগুলি নিশ্চিতভাবেই আপেক্ষিক। তথাপি আধুনিক যুগে সভ্যতার নিরিখে উন্নতি বলতে অর্থনৈতিক উন্নতি তথা উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি, মানুষের জীবন ও জীবিকা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ, মৌলিক ও মানবাধিকারের উন্নতি, বিজ্ঞান চেতনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি, দর্শন ও রাজনীতি, সাহিত্য-শিল্পকলা-সংস্কৃতির অগ্রগতি ইত্যাদিকেই বুঝি। প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তথা ১৭৮৯ সালে ইউরোপের ফ্রান্সে পৃথিবী খ্যাত 'ফরাসী বিপ্লবের' মধ্য দিয়ে এবং সামন্তবাদের প্রাচীর 'বাস্তি ল দুর্গের' পতনের মধ্য দিয়েই আধুনিক ও উন্নত মানবসভ্যতার উন্মেষ ঘটে। এই বিপ্লবে সামন্তবাদী শাসনে নিষ্পেষিত উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী প্রধান নেতৃত্বে ছিল বলে এই বিপ্লবকে মানবেতিহাসের প্রথম 'বুর্জোয়া বিপ্লব' বলেও অভিহিত করা হয়। তবে এই বিপ্লবে শ্রমিক, কৃষক তথা শ্রমজীবি মানুষের প্রবল উত্থান ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয় অংশগ্রহণও মানবসমাজ ও সভ্যতার বিকাশের জন্য এক গভীর ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য তুলে ধরে। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়েই পৃথিবীর মানুষ প্রথম গভীর ও ব্যাপকভাবে উদ্দীপিত ও উজ্জীবিত হয় সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও নারী অধিকারের মূলমন্ত্রে। যে কারণে মানুষ ইতিহাসের এই পর্বের নাম দিয়েছে রেনেসাঁ বা নবজাগরণ। এ সময় সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্পকলা, দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। পুরনো হয়ে যাওয়া, ঘুণে ধরা প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তবাদের বাঁধ ভেঙে দিয়ে মানুষ যেন খুঁজে পায় তার সৃজনীশক্তির অপার সম্ভাবনার দ্বার। এরপর রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে, দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানবসভ্যতা এগিয়েছে আরও অনেকদূর, সারা ইউরোপসহ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দেশে দেশে দাসপ্রথা, সামন্তীয় শাসন-শোষণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অগণতান্ত্রিক, প্রগতি ও বিজ্ঞান বিরোধী সামন্তপ্রথার অবসান হতে থাকে। অনেক দেশে পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, অনেক দেশে শ্রমজীবি মানুষ নেতৃত্ব গ্রহণ করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে মাঝামাঝি সময়ে সোভিয়েট রাশিয়া-চীনসহ বেশ কয়েকটি দেশে শ্রমিক-কৃষক তথা শ্রমজীবি মানুষ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতাও দখল করে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা মহাদেশের পিছিয়ে পড়া পরাধীন অনেক জাতিও নিজেদের স্বাধীনতা লাভ করে। তবে সভ্যতার এই গতিপথে উত্থান-পতনও হয়েছে সময়ে সময়ে।

দুই.

কিন্তু এমনি যুগেও পৃথিবীর নানা অঞ্চলে নানা দেশে এমন কিছু মানুষ, এমন অনেক জনগোষ্ঠী, এমন কিছু সংখ্যালঘু জাতি বা জাতিসত্তার অস্তিত্ব থেকে যায় যারা সভ্যতার গতিপ্রবাহ থেকে অনেক দূরে থাকতে বাধ্য করা হয়ে থাকে। তাদেরকেই সাধারণভাবে কখনো কখনো বলা হচ্ছে 'উপজাতি' বা 'ট্রাইব', বা 'আদিবাসী'। মূলতঃ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির আগ পর্যন্ত এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই অনেকটা অন্ধকারেই ছিল। তাদের এই পশ্চাদপদতায় যতটা না তাদের স্বাভাবিক আদিমতা দায়ী বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর জন্য অস্বাভাবিকভাবে দায়ী সামন্তবাদ: সে সামন্তবাদ দুর্বল হোক আর শক্তিশালী হোক। এই সামন্তবাদই চায় প্রজা-জনগণকে দমিয়ে রাখতে, নিজে রাজা-জমিদার-ভূস্বামী বা সামন্তপ্রভূ হিসেবে চিরস্থায়ী থেকে অধিকাংশ মানুষকে প্রজা-কৃষক করে রাখতে। সামন্তবাদী নেতৃত্ব চায় কেবল নিজের বংশের, নিজের পরিবারের ও নিজের শ্রেণীর স্বার্থ। পৃথিবী যেখানে এগিয়ে গেছে অনেক সামনে সেখানে প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তবাদী নেতৃত্বে কোন সমাজে প্রগতি সম্ভব নয়। ১৮৬০ সালে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বে আসার আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহও ছিল পুরোপুরি সামন্তবাদী ব্যবস্থায়, সামন্তবাদী নেতৃত্বে। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরুং, তঞ্চঙ্গ্যা ইত্যাদি সংখ্যাগুরু জাতিসত্তাসমূহ চলত সরাসরি স্ব স্ব এলাকার রাজার অধীনে। অন্যান্য অধিকতর সংখ্যালঘু কয়েকটা জাতিসত্তা ছিল আরো অধিকতর আদিম অবস্থায়, প্রত্যক্ষভাবে কোন গোষ্ঠীপ্রধানের নেতৃত্বে। অনেক জনগোষ্ঠীর অনেক মানুষ ছিল একেবারে অর্ধনগ্ন অবস্থায়। ১৮৬০ সালের আগে এখানে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও কোন অস্তিত্ব ছিল না। উৎপাদন পদ্ধতি ছিল একবারে অনুন্নত জুম চাষ পদ্ধতি। সামাজিক সম্পর্ক ছিল কেবল একদিকে রাজারা বা গোষ্ঠী প্রধানরা অপরদিকে সিংহভাগ প্রজা-কৃষকরা। ফলে এই সমাজে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ছিল চরম দারিদ্র, অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, অশিক্ষা, অজ্ঞতা, ভীরুতা, জড়তা, কূপমন্ডুকতা, রক্ষণশীলতা আর তাই সবদিক দিয়ে থাকে পশ্চাদপদতা। এই পর্যায়ে এই জাতিসত্তাসমূহের জনগণের মাঝে জাতীয় অনেক বৈশিষ্ট্য লুক্কায়িত থাকলেও এই সময়ে তাদের মাঝে কোন ব্যক্তিত্ববোধ বা জাতীয়তাবোধও প্রকৃতপক্ষে জাগরিত হয়নি। খাওয়া আর বাঁচাই যেন তাদের জীবনের একমাত্র দর্শন, একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। ১৭৮০ সালের দিকে খাজনার ব্যাপারে চাকমাদের সাথে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এক যুদ্ধের মধ্য দিয়েই বৃটিশরা প্রথম এই অঞ্চলে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তক্ষেপ শুরু করে। ১৮৬০ সালে বৃটিশদের কর্তৃক এক 'হিল সুপারিনটেন্ডেট' নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জেলায় রূপান্তরিতকরণ এবং এর সাত বছর পর দায়িত্ব-ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দিয়ে তাকে ডেপুটি কমিশনার (প্রশাসন) করার মধ্য দিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথমবারের মত সামন্তবাদী ব্যবস্থার উপর প্রত্যক্ষ আঘাত আসে। পুঁজিবাদের ধারকবাহক বৃটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সামন্তবাদকে উৎখাত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সমাজে পুঁজিবাদ বা বুর্জোয়া গণতন্ত্রও বিকাশের কোন উদ্যোগ যেমনি নেয়নি উপরন্তু সামন্তবাদকে অনেকটা নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে তাকে আরো সংস্কার ও ঢেলে সাজিয়ে বিদ্যমান বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলে। এ সময় তারা বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধানও প্রণয়ন করে। মূলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে নিরাপদে শাসন-শোষণ ও নিজের স্বার্থে কাজে লাগানোর জন্যই বৃটিশরা এমন ভূমিকা গ্রহণ করে।

তিন.

কোন বস্তু বা ব্যাপারই যেমনি নিরঙ্কুশভাবে কেবল ভালো বা মন্দ, ইতিবাচক বা নেতিবাচক, ঋণাত্মক বা ধনাত্মক হতে পারে না বরং যুগপৎভাবে কম-বেশী উভয় দিকই থাকে। তেমনি দু'শ বছরের ভারত শাসন-শোষণে বৃটিশরা কেবল মন্দ করে গিয়েছে তা নয়, ভালোও অনেককিছু দিয়ে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম নয়। তন্মধ্যে তাদের কর্তৃক স্কুল প্রতিষ্ঠা ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা অন্যতম। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস চর্চায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে সংহত করণেও তাদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। যদিও এসবের পেছনে তাদের প্রয়োজনতাই বেশী ছিলো তাদের কাছে। ১৮৬২/৬৩ সালে চন্দ্রঘোনায় তাদের কর্তৃক স্থাপিত প্রাথমিক স্তরের 'চন্দ্রঘোনা বোর্ডিং স্কুল'ই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৮৬৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার হেডকোয়ার্টার চন্দ্রঘোনা থেকে রাঙামাটি স্থানান্তর করা হলে স্কুলটিও রাঙামাটি নিয়ে আসা হয়। স্কুলের নামকরণ করা হয় রাঙামাটি সরকারী বোর্ডিং স্কুল। স্কুলটি ছিল অবৈতনিক, এমনকি ৫০ জন ছাত্রের যাবতীয় খাওয়া-দাওয়া, বইপত্র, ধোপা ও চিকিৎসা খরচ পর্যন্ত সরকার বহন করত। ১৮৯০ সালে এই স্কুলটিই 'রাঙামাটি গভর্নমেন্ট ইংলিশ হাই স্কুল' নামকরণ করে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়। এই ভাবে ধীরে ধীরে পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিক শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হতে থাকে। বিশেষতঃ ১৯২০-১৯৪৭ সালের মধ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সামন্তবিরোধী প্রয়াত কৃষ্ণ কিশোর চাকমাসহ কতিপয় সমাজ হিতৈষীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেকগুলো প্রাথমিক স্কুল, উচ্চ প্রাথমিক স্কুল, এম ই স্কুল গড়ে উঠে। যে গুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার আলো বিস্তারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে শুরু করে। এভাবে শিক্ষার বদৌলতে কিছু কিছু মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধ, মানবিক মূল্যবোধ, সমাজ সচেতনতা, জাতীয় চেতনার উন্মেষ হতে থাকে। যে কারণে আমরা দেখতে পাই ১৯১৫ সালে রাজমোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম সংগঠন 'চাকমা যুবক সমিতি', ১৯২০ সালে কামিনী মোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি', ১৯২৮ সালে ঘনশ্যাম দেওয়ানের নেতৃত্বে 'চাকমা যুবক সংঘ', ১৯৩৯ সালে রাজ পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র সমিতি' ইত্যাদি সংগঠন। কিন্তু এই সংগঠনগুলো সম্প্রদায়ভিত্তিক হওয়ায়, সামন্তবাদের প্রভাবমুক্ত

হতে না পারায় এবং নেতৃবৃন্দের দুরদর্শিতা ও পর্যাপ্ত প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার অভাবের কারণে এই সংগঠনগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপক প্রেক্ষাপটে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল জনগোষ্ঠীর স্বার্থে তেমন কোন কাজে আসতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার আগ পর্যন্তও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মধ্যে কোন রাজনৈতিক উত্থান পরিলক্ষিত হয়নি। যদিও ইতিমধ্যে সারা ভারত জুড়ে এক দীর্ঘ সময়ব্যাপী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন বয়ে গেছে এবং পরিণতি লাভ করেছে, পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা, মুক্তিকামী মানুষের আন্দোলনের ঢেউ। আসলে তখনো পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিসত্তাসমূহ বিজাতীয় শাসন-শোষণ ও সামন্তবাদী প্রভাবে-কর্তৃত্বে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের বাসিন্দা। যদিও তখন শুরু হয়ে গেছে সামন্তবাদী নেতৃত্বের সাথে জনগণের বিভিন্ন স্তর থেকে উঠে আসা শিক্ষিত-সচেতন অংশের দ্বন্দ্ব এবং বিজাতীয় বিভিন্ন শাসক-শোষকগোষ্ঠী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণ ও তাদের জন্মভূমি নিয়ে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সেই শিক্ষিত অংশের উদ্বেগ ও চিন্তা-ভাবনা। ঠিক এমনি এক প্রেক্ষাপটে আবির্ভাব ঘটে পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগ স্রষ্টা নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার। যার সংক্ষিপ্ত নাম এম এন লারমা।

এম এন লারমার জন্ম, পরিবার ও শিক্ষাজীবন

রাঙামাটি শহরের অনতিদূরে সেই সময়ের এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম মহাপূরমে পার্বত্য চট্টগ্রামের এই ভাবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৩৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। তাঁর পিতা সেই গ্রামেরই জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক চিত্ত কিশোর চাকমা ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, ধার্মিক, মানবতাবাদী, সমাজসেবী ও গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার অধিকারী। মাতা সুভাষিণী দেওয়ান ধর্মপ্রাণা ও স্নেহময়ী। এম এন লারমারা তিন ভাই, এক বোন। তাঁর একমাত্র বোন জ্যোতিপ্রভা লারমা (মিনু) সবার বড়। বড় ভাই শুভেন্দু প্রভাস লারমা, ছোট ভাই জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। পিতা-মাতা শিক্ষিত হওয়ায় এবং তাদের আপন জ্যাঠা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী কৃষ্ণ কিশোর চাকমার অনিবার্য প্রভাবে লারমাদের শিক্ষা গ্রহণে তেমন অসুবিধে হয়নি। বিশেষ করে এম এন লারমা ও সন্তু লারমা সহজেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেন। ছেলে বেলা থেকেই এম এন লারমা মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিগণিত হন। তিনি ১৯৫৮ সালে রাঙামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় হতে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর তিনি চট্টগ্রাম সরকারী মহাবিদ্যালয়ে আই এ-তে ভর্তি হন এবং ১৯৬০ সালে আই এ পাশ করেন। এরপর একই কলেজে বি এ ক্লাশে ভর্তি হন। তখন অধ্যায়নরত অবস্থায় কাপ্তাই বাঁধের প্রতিবাদ ও প্রতিবিধানের দাবী করার কারণে মিথ্যাভাবে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত করে পাকিস্তান সরকার তাকে গ্রেফতার করে এবং প্রায় দুই বছর পর শর্ত সাপেক্ষে ১৯৬৫ সালের ৮ মার্চ তিনি কারামুক্ত হন। একই বছর সমাজ কল্যাণ বিভাগের অধীনে তিনি বি এ পাশ করেন। এরপর তিনি ১৯৬৮ সালে বিএড পাশ করেন এবং ১৯৬৯ সালে এল এল বি পাশ করেন।

আসলে এম এন লারমারা কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হন নি। তাদের পিতা-মাতা তথা পরিবার থেকেও তারা বাস্তব জীবনের অনেক কিছু, জ্ঞানচর্চার অনুপ্রেরণা, রাজনৈতিক চেতনার গুরুত্ব এবং সহিষ্ণুতার সহিত সংগঠন করবার দক্ষতা লাভ করেন। এম এন লারমার ছোট ভাই তারই যোগ্য উত্তরসুরী, জনসংহতি সমিতির বর্তমান সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা(সন্তু লারমা) তাঁর পিতা-মাতা ও পরিবার সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 'পিতা শুধু একজন শিক্ষকই নন। তিনি একাধারে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও একজন রাজনীতিবিদ, আর অন্যদিকে তিনি একজন সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। আদর্শ পিতা হিসেবে আমার দৃষ্টিতে তিনি অতুলনীয়। বাবা শিল্পীমনেরও অধিকারী ছিলেন। সকল ধর্মের প্রতি তিনি পরম সহিষ্ণু ছিলেন। তিনি মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বাবার জীবন-দর্শন আমার সমগ্র জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাবার হাতেই আমার রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি। বাবা ছিলেন আমার শিক্ষাগুরু, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে বন্ধু, বিপ্লবী জীবনে পরম উপদেষ্টা। মা ছিলেন স্নেহশীলা, শিক্ষানুরাগী, আদর্শ প্রতিবেশী, অতিথিপরায়ণ, দেশপ্রেমিক, কর্মঠ, সংগ্রামী ও আদর্শ গৃহিণী।' সন্তু লারমা আরও বলেন, 'আমাদের চার ভাইবোনের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ছিল। মঞ্জুদা (এম এন লারমা) ছোটবেলা থেকেই খুব পড়াশোনা করতেন। তিনি খুবই সরল ও শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। বড়দা (শুভেন্দু লারমা) কম পড়াশোনা করতেন, তবে ক্ষেত-খামারের কাজে খুবই মনোযোগী ছিলেন। একমাত্র বড় বোন সবার কাছে প্রিয় ছিলেন। তিন ভাইকে তিনি খুবই আদর-যত্ন করতেন।' তিনি আরও উল্লেখ করেন, 'পরিবারের সবাই প্রত্যক্ষভাবে জাতিগঠনে ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে জড়িত ছিলেন।'

আসলে যে সমাজ সামন্তবাদের প্রভাবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত সে সমাজে সেই সময়ে (এমনকি বর্তমান সময়ে) এমন ধরণের আদর্শ ও প্রগতিশীল পরিবারের অস্তিত্ব ছিল দূর্লভ ঘটনা। তবুও সত্যিকারের শিক্ষার অমোঘ শক্তিতে সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদের গর্ভেও জন্ম ও বিকাশ লাভ করেছিল এমনি এক অগ্রসর পরিবার। যে পরিবারের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে। যে কারণে বাবা-মাসহ ভাই-বোন সবাই মিলে তথা পরিবারশুদ্ধ লারমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত-নির্যাতিত জাতিসত্তাসমূহের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারেন এবং সংগ্রামের জন্য কঠিন-কঠোরতম আত্মত্যাগের পথ বেছে নিতে পারেন। এ ধরণের পরিবারের নিদর্শন বিশ্বের সংগ্রামের ইতিহাসেই অত্যন্ত বিরল।

এম এন লারমার জন্ম, শিক্ষালাভ এবং আবির্ভাব পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে কোন গতানুগতিক সাধারণ ঘটনা নয়। কেননা তিনিই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামকে নাড়িয়ে দিতে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঐক্যবদ্ধ করতে, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে জাগরিত করতে, দেশের ও বিশ্বের দরবারে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তুলে ধরতে সক্ষম হন। তার শিক্ষা লাভ ছিল অতীতের অন্য সবার চাইতে ব্যতিক্রম, তার কর্মজীবন, জীবন-দর্শণ অন্য সবার চাইতে আলাদা। তিনি শিক্ষা লাভ করে কোন চাকুরী নিয়ে ব্যক্তিজীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেছে নেননি। তিনি শিক্ষকতা করেও সেখানে আবদ্ধ থাকেননি, ওকালতি করেও উকিল হয়ে থাকেননি। কেননা তিনি ভাবতেন আরো অনেককিছু, তিনি অনুভব করতেন আরো অনেক বিষয়। তিনি জানতেন মানব সভ্যতার অগ্রগতির কথা, তিনি জানতেন বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবি মানুষ ও নিপীড়িত জাতির সংগ্রাম ও অধিকার আদায়ের কথা। তিনি বুঝতেন আধুনিক সব রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস ও সংস্কৃতির কথা। তিনি ভাবতেন পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চাদপদ ও নিপীড়িত-নির্যাতিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের কথা, তাদের জাগরিত করবার ও সংগঠিত করবার কথা, তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের কথা। তিনি তাঁর এই চিন্তাভাবনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরতে এবং প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষমও হন।

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে বৃটিশরা ভারতবাসীর কাছে তাদের শাসনক্ষমতা ছেড়ে দেয়। সারা উপমহাদেশ ভাগ হয়ে যায় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রে। অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ-মাঝারি বিভিন্ন জাতির জন্মভূমি ও আবাসভূমি হওয়া সত্বেও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সংখ্যাগুরু হিন্দু ও মুসলিমরা প্রধান নেতৃত্বে ছিল বলে এই উপমহাদেশের দুটি রাষ্ট্রও ভাগ হয়ে যায় এই দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। দ্বি-জাতির কথা বলা হলেও এই বিভক্তি হয় মূলতঃ এই মূল নীতির ভিত্তিতে যে- পূর্ব ও পশ্চিম মিলে পাকিস্তান হবে মুসলীমদের রাষ্ট্র আর বৃহত্তর ভূ-খন্ড নিয়ে হিন্দুদের সাথে ভারতে অন্তর্ভূক্ত হবে অন্যান্য ক্ষুদ্র-মাঝারি বিভিন্ন জাতি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন না কোনভাবে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণ সরল ও স্বাভাবিকভাবে প্রথম প্রথম একটু প্রশ্ন তোলে এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। কিন্তু সন্দেহপরায়ণ, ধর্মান্ধ, জাত্যাভিমানী পাকিস্তান সরকার সেটাই শুধু নেতিবাচকভাবে গ্রহণ করে। কাজেই পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের জন্য পাকিস্তান সরকার আরও ব্যাপক প্রতিক্রিয়াশীল তথা জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত করণের নীতিই গ্রহণ করে। যদিও পাকিস্তান সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসন ব্যবস্থার মর্যাদা গ্রহণ করে। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়াশীল ও বিজাতীয় নীতির কারণে ৫০ এর দশকেই রাঙামাটি মহকুমার লংগদু ও নানিয়ারচর, রামগড় মহকুমার তবলছড়ি, বেলছড়ি ও মানিকছড়ি এবং বান্দরবান মহকুমার আলিকদম, লামা, নাইক্ষ্যংছড়ি ইত্যাদি অঞ্চলে বিশেষ শাসন বিধি লংঘন করে বাঙালী মুসলমান অনুপ্রবেশ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। এরপর শুরু হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের একের পর এক ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ। জনগণের মাঝে প্রকাশ পেতে থাকে তার বিজাতীয় ও বৈষম্যমূলক আচরণ। এ সময় উন্নয়নের নামে জুম্মদের জন্য বিপর্যয়কর, বৈষম্যমূলক ও অপমানজনক যে পদক্ষেপ পাকিস্তান সরকার গ্রহণ করে সেগুলি হল প্রধানতঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ, কর্ণফুলী কাগজ কারখানা, পর্যটন ইত্যাদি। এর মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিকভাবে সবচেয়ে মারাত্মক আঘাত হানে কাপ্তাই বাঁধ। যার কারণে স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হয় লক্ষাধিক আদিবাসী জুম্ম, পানির তলে তলিয়ে যায় এই অঞ্চলের মোট জমির ৪০% ভাগ, হাজার হাজার মানুষ স্বদেশ ছেড়ে আশ্রয় নেয় পাশ্ববর্তী দেশে, ওলটপালট হয় হাজার মানুষের জীবন। এই অঞ্চলের আদিবাসী জুম্মদের জন্য এ এক বড় ট্রাজেডী। তাই তারা অভিহিত করেন কাপ্তাই বাঁধ-মরণ ফাঁদ। এই বাঁধ নির্মিত হয় ১৯৫৯-৬০ সালে, যদিও এটা প্রস্তাবিত হয় অনেক আগে বৃটিশ আমলে। অপরদিকে ১৯৫০-৫১ সালে যে কাগজ কল গড়ে তোলা হয় তাও জুম্মদের জাতীয়ভাবে কোন কাজে আসেনি। তার স্টাফ নিয়োগ থেকে শুরু করে কোন ব্যাপারেই জুম্মরা কোন সুযোগ পায়নি। অথচ এই কাগজ কল নিয়ে পাকিস্তান সরকার গর্ব করতো। মূলতঃ আদিবাসীদের আবাসভূমি এই পার্বত্য চট্টগ্রামে যে বনজ সম্পদ-বাঁশ-গাছ রয়েছে সেগুলি কেবল লুট করে আদিবাসীদের কাঁধের উপর দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই তারা এখানে তা গড়ে তোলে এবং পশ্চাদপদ এই এলাকায় তারা উন্নয়ন করছে বলে প্রচার করে। পাকিস্তান সরকার এই এলাকার আদিবাসীদের সত্যিকারের উন্নয়নের জন্য কোন চিন্তা-ভাবনা বা কাজ তো করেনি, উপরন্তু শুরু থেকে এই এলাকার প্রকৃতিক সৌন্দর্য ও এই এলাকার মানুষের সরলতা, অসহায়ত্ব, পশ্চাদপদতা ও আদিমতাকে দর্শনীয় বস্তু করে মুনাফা লাভের জন্য এই এলাকার পর্যটন শিল্পকে তারা তাদের জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করে। The Chittagong Hill Tracts: Living in a Borderland বইয়ে উল্লেখ করা হয় যে, When Pakistani officials and entrepreneurs thought of the development potential of the Chittagong Hill Tracts, tourism was high on their agenda. The selling of Chittagong Hill Tracts and inhabitants focussed on the themes of natural beauty, exotic people and unchanging tradition. ১৯৬০ সালের তাদের এক প্রচারপত্রে তারা বর্ণনা করেন এভাবে- 'Towering clouds-those magnificent clouds seen only in tropical skies-are reflected in the still waters of the rivers and lakes, over which float sampans and long rafts of roped bamboo. ..The tribal folk lead a

life of extreme simplicity earning little for modern ways and content with their few needs. They dwell, as did their ancestors in centuries past, untouched by time and progress... আর আদিবাসী নারীদের শারীরিক সৌন্দর্যকে বর্ণনা করে বলা হয়- The women are generally pretty and possess good figures. এছাড়াও 'a dancing tribal girl', `a tribal damsel' ইত্যাদি ক্যাপশনসহ আদিবাসী মেয়েদের ছবি সম্বলিত বিভিন্ন লিফলেট ধারাবাহিকভাবে প্রচার করা হয়।

পাকিস্তান সরকারের এসব আদিবাসী জুম্ম জনগণের স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ তরুণ এম এন লারমা একের পর এক প্রত্যক্ষ করেন এবং উপলব্ধি করেন এ সবই সংখ্যালঘু আদিবাসীদের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র, তাদেরকে শাসন-শোষণ ও প্রতারণা করবার পাঁয়তারা। বিশেষ করে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে আদিবাসীদের যে নজিরবিহীন দুঃখ-দুর্দশা তা তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলে এবং তিনি নিজেও এর প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী। এত সব ষড়যন্ত্র ও বিপর্যয় সত্ত্বেও তৎকালীণ সামন্ত নেতৃত্ব কোন প্রতিবাদ বা পথ দেখাতে পারেনি। এম এন লারমা তখন বয়সে তরুণ ছাত্র, কিন্তু স্বজাতি ও স্বভূমিপ্রেমে উদ্বেলিত এবং প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় উদ্ভাসিত। ঠিক এই সময়েই আমরা দেখতে পাই এম এন লারমার রাজনৈতিক সৃজনী শক্তির বহিঃপ্রকাশ, যে সৃজনী শক্তির পরিচয় দেন তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। তারপর ধীরে ধীরে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘুণে ধরা সামন্ত বাদের বিরুদ্ধে এবং বিজাতীয় পাকিস্তানী ও পরবর্তীতে বাংলাদেশের শাসক-শোষকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শুরু করেন, ঘুমন্ত ও বিলুপ্তপ্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহকে জাগরিত করেন, অধিকার সচেতন করেন, সংগঠিত করেন এবং গণতান্ত্রিক ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কঠিন-কঠোর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করেন। প্রকৃতপক্ষে এসবকিছুই ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে অভূতপূর্ব, বৈপ্লবিক এবং সৃজনশীলতায় সমৃদ্ধ। সত্যিকার অর্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে তথা আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের প্রেক্ষাপটে এম এন লারমার ভূমিকা ও সৃজনশীলতা অত্যন্ত ব্যাপক এবং গভীর। এমনকি বিশ্বের নিপীড়িত, নির্যাতিত শ্রেণী, আদিবাসী জাতি ও মানবসভ্যতার প্রেক্ষাপটেও তাঁর কাজ, তাঁর জীবন, তাঁর চিন্তাধারা ও শিক্ষা গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং তার সাথে সম্পর্কিত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জন্য এম এন লারমা যা করেন তা এককথায় অনন্য। নিম্নোক্ত কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনায়ই আমরা তাঁর ঐতিহাসিক সৃজনশীলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর পায়।

১.

৬০ দশকের শুরুতে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে অন্য সবার ছিল যা কল্পনার বাইরে, অথচ ছাত্রাবস্থায়ও কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে তাঁর যে উপলব্ধি, এর প্রতিবাদে আন্দোলন এবং এর ফলে ১৯৬৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী কারারুদ্ধ হওয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে অত্যন্ত নতুন এবং অনন্য এক ঘটনা। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সচেতন ছাত্র ও অগ্রসর নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বের প্রতিভূ হিসেবে আবির্ভূত হন এবং সাধারণ জনগণের আশীর্বাদ ও ভালোবাসাও অর্জন করতে সক্ষম হন। অবশ্য উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থাতেও তিনি ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তিনি যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী তখন বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের মাননীয় সুপার ছাত্রাবাসের পরীক্ষার্থীদেরকে সুবিধামত আহারের সময় নির্ধারণ করে না দিতে চাইলে পরীক্ষার্থীরা তারই নেতৃত্বে অনশন ধর্মঘট করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হন। ১৯৫৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ছাত্রদের যে ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতেও তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬২ সালে ঐতিহাসিক পাহাড়ী ছাত্র সম্মেলন তারই নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে শর্তাধীনে কারামুক্ত হওয়ার পর তিনি হতোদ্যম না হয়ে বরং গ্রামে ফিরে এসে আরো গভীর মনোযোগ সহকারে ছাত্রদের ও জনগণকে সংগঠিত করতে থাকেন এবং রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন।

২.

১৯৭০ সালে মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে সরকারী মদদপুষ্ট প্রার্থীকে তুচ্ছ করে, সামন্তবাদী প্রার্থীর বিপরীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে এবং ১৯৭৩ সালে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে প্রতাপশালী আওয়ামীলীগ প্রার্থীর বিপরীতে স্বতন্ত্রভাবে বিপুল ভোটে তাঁর নির্বাচিত হওয়াও এক অতীব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পার্বত্য চট্টগ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই সেদিন যেন এক তরুণের পেছনে এক কাতারে এক বিন্দুতে দাঁড়িয়ে এক পারমানবিক জনশক্তির বিস্ফোরণ ঘটান। প্রাদেশিক পরিষদ ও জাতীয় সংসদের সদস্য হয়ে তাঁর যে ভূমিকা তাও অত্যন্ত বৈপ্লবিক, আদর্শস্থানীয় এবং অনুসরণীয়। আজকের দিনের পার্বত্য চট্টগ্রামের সংসদ সদস্যরা কেবল জনগণের গলার কাটার মতই ভূমিকা গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নকালে ১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর গণপরিষদের সদস্য হিসেবে জাতীয় সংসদে তিনি যে সুদীর্ঘ ভাষণ দেন তাও এক বিরল ঘটনা, তাঁর ভাষণের যে বিষয়বস্তু তাও অতুলনীয় এবং সেই ভাষণে তিনি শুধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসীদের কথা বলেননি, বাংলাদেশের শ্রমজীবি মানুষ তথা কৃষক, শ্রমিক, মাঝিমাল্লা, জেলে, কামার, কুমার, তাঁতী এবং নির্যাতিত নারীদের অধিকারের জন্য যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন তাতে তাঁর চিন্তাধারা, দর্শন, মানবিকতা ও আন্তর্জাতিকতার যে উচ্চমানের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে সহজেই তাঁকে বিশ্বের মহামনীষীদের কাতারে স্থান দেয়া যায়। তাঁর মত কোন জনপ্রতিনিধি সংসদে দাঁড়িয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জন্য তো বটেই এমনকি সারাদেশের মেহনতি মানুষের জন্য এমন দরদ দিয়ে ন্যায্য অধিকারের পক্ষে কথা বলেছেন কিনা জানা যায়না।

৩.

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠা ও শান্তিবাহিনী গঠন পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। জনসংহতি সমিতিই এই পশ্চাদপদ আদিবাসী জুম্ম জনগণের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক দল এবং শান্তিবাহিনী তার সামরিক শাখা। ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী এম এন লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রস্তুতি কমিটি। এম এন লারমাই এই প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে মনোনীত হন। একই দিনে এম এন লারমার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দাবী সম্বলিত একটি ৪ দফা দাবীনামা তৎকালীন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের নিকট পেশ করে। সেই দাবীগুলি হল- ১. পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হবে এবং এর একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে; ২. উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য (বৃটিশ কর্তৃক প্রবর্তিত) ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েলটি রাখা হবে; ৩. উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করা হবে; ৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না করা হয়, এরূপ সংবিধিব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে। কিন্তু পাকিস্তানী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের প্রধানমন্ত্রী সেদিন আরেকটা সংখ্যালঘু নিপীড়িত জাতির ন্যায্য অধিকার অনুভব ও মেনে নিতে পারেন নি, যার দুঃখজনক ইতিহাস আমরা সবাই জানি। বস্তুতঃ এই ঐতিহাসিক দাবীই সমগ্র আদিবাসী জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণ ঘটায় এবং তার ভবিষ্যত আন্দোলনের রণনীতি বাতলে দেয়। ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারী গঠিত হয় শান্তিবাহিনী, ইংরেজীতে যার নাম Peace Force। এই শান্তিবাহিনী গঠনে এন এন লারমার পর সন্তু লারমার উদ্যোগ ও অবদান সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য। সদ্য স্বাধীন দেশের সরকারী বাহিনীর তৎকালীন বিভিন্ন নির্যাতন, জুলুমের প্রতিবাদে এবং সমাজস্থিত চুরি-ডাকাতি-বিশৃঙ্খলা রুখে দাঁড়িয়ে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাই ছিল এই শান্তিবাহিনীর কাজ। অবস্থার কারণে তা-ই ধীরে ধীরে পরিণত হয় এক শক্তিশালী গেরিলা বাহিনীতে। প্রকৃতপক্ষে জনসংহতি সমিতি ও শান্তি বাহিনীই আদিবাসী জুম্ম জাতিসত্তাসমূহের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণে ত্রাতার ভূমিকা নেয়। তাদেরকে মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়ানোর এবং অনাগত ভবিষ্যতের দিকে তাকাবার শক্তি যোগান দেয়। এক্ষেত্রে সমিতি যদি হয় একজন মানুষের মাথা তাহলে শান্তিবাহিনী পরিণত হয় তার মেরুদন্ডে। এম এন লারমার নেতৃত্বে এই সমিতিই ঘুমন্তপ্রায় নিষ্পেষিত আদিবাসী জুম্ম জনগণের চোখ খুলে দেয়, তাদের সংগঠিত করে, প্রগতির দিকনির্দেশনা দেয় এবং শান্তিবাহিনী শেখায় ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সকল শাসক-শোষক শক্তিকে মোকাবেলা করবার অপার স্পর্ধা। সেদিন এম এন লারমা ও সন্তু লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনী গঠিত না হলে কি যে পরিণতি হতে পারতো তা পাকিস্তান আমলের কথা, আর বাংলাদেশের আশির দশক থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি পদে পদে জুম্মদেরকে শাসন-শোষণ, প্রতারণা, অবমাননা করার যে অপচেষ্টা তা চোখ বুজে একটু স্মরণ করলেই দিনের আলোর মত সবকিছু পরিষ্কার হয়ে উঠে। আজকের বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের সংখ্যালঘু আদিবাসীদের অবস্থার দিকে তাকালেও তা স্পষ্ঠ হয়ে উঠে।

৪.

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অসম বিকাশ, তাঁদের ভাষাগত-সংস্কৃতিগত ভিন্নতা, সামন্তবাদী পশ্চাদপদতা ও বিচ্ছিন্নতা, অশিক্ষা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও, চাকমা-মারমা-মুরং-ত্রিপুরা-তঞ্চঙ্গ্যা-খিয়াং ইত্যাদি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়গত-জাতিসত্তাগত ভিন্নতা সত্ত্বেও তিনি তাদের যে চিন্তাধারায়, দর্শনে ও রাজনৈতিক মতবাদে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছেন, রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন, সংগঠিত করতে পেরেছেন এবং আধুনিক পন্থায় লড়াইয়ে নামাতে পেরেছেন তা হচ্ছে তার প্রগতিশীল চিন্তা-আদর্শ যা তিনি পেয়েছেন বিশ্বের সকল নিপীড়িত জাতি ও শ্রেণীর সংগ্রামের উত্তরাধিকার হিসেবে আর অন্যটি হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন বাস্তবতায় স্বউদ্ভাবিত জুম্ম জাতীয়তাবাদ। যে জাতীয়তাবাদকে আমরা অন্য কথায় গর্বের সাথে বলতে পারি প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ। এটা এম এন লারমার সৃজনশীলতার অন্যতম একটি দিক।

একদিকে ডারউইন-মর্গান-মার্কস-এঙ্গেলস-অব্রাহাম লিংকন-লেনিন-মাও-হোচিমিন-ভাসানীদের চিন্তা-সমৃদ্ধ দুনিয়ার নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের সংগ্রামী দর্শন আর শোষনহীন, বৈষম্যহীন মানবসমাজের অত্যাধুনিক মতবাদ। আর অন্যদিকে চাকমা-মারমা-ত্রিপুরা-তঞ্চঙ্গ্যা-মুরং-চাক ইত্যাদি সকল জাতিসত্তার অস্তিত্ব রক্ষা ও তাদের বিকাশের রূপরেখা জুম্ম জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদ প্রচার করে ক্ষুদ্র-বৃহৎ দুনিয়ার সকল জাতিই মানুষ হিসেবে সমান মর্যাদার অধিকারী, এই

জাতীয়তাবাদ প্রচার করে শক্তিশালী বিজাতীয় শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিগুলোর ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে তুলতেই হবে, দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে অবতীর্ণ হতেই হবে। এই জাতীয়তাবাদ প্রচার করে যতই সংখ্যালঘু হোক যতই পশ্চাদপদ হোক টিকে থাকতে হলে ন্যায্য অধিকার আদায় করতে হলে তাকে জেগে উঠতেই হবে, আধুনিক চিন্তা-চেতনা ধারণ করতে হবে এবং লড়াই করতে হবে। মূলতঃ জনসংহতি সমিতি গঠনের মধ্য দিয়েই এম এন লারমা এই মতবাদ প্রচার করেন। এর মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণ প্রথম সামন্তবাদের জাতিগত-গোষ্ঠীগত বিচ্ছিন্নতা ভেঙে দিয়ে নিজেদেরকে সত্যিকারভাবে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং নিজেদের প্রগতিশীল জাতীয় চেতনার স্ফুরণ ঘটান।

এ যুগের এক শ্রেষ্ঠ মানুষ মহান নেতা এম এন লারমা

আসলে এম এন লারমা কোন গোষ্ঠীর জন্য কেবল কোন একটা শ্রেণী বা জাতির জন্য চিন্তাভাবনা করেননি, সংগ্রাম করেননি; মানুষের জন্যই চিন্তা-ভাবনা করেছেন, মানুষের ন্যায্য অধিকারের জন্যই সংগ্রাম করেছেন। যা সত্যিকারের একজন মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য। তিনি বাস্তব কারণে বিশেষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চাদপদ বিলুপ্তপ্রায় দশ ভাষা-ভাষি এগার জাতিসত্তার অধিকার ও দাবী নিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু তিনি মূলতঃ বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে নির্যাতিত সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন এক প্রান্তিক মানবগোষ্ঠীর জন্যই কাজ করেছেন। তাই তাঁর অভিজ্ঞতা, চিন্তাধারা বিশ্বের সকল নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষ ও ধ্বংসোন্মুখ জাতিসমূহের অধিকার আদায়ের পথে এক অমূল্য সম্পদ। মানবসভ্যতার বিকাশে এক উল্লেখযোগ্য অবদান। তাঁর সংগ্রামের ন্যায্যতা, বাস্তবতা, ঐতিহাসিক গুরুত্ব, দুরদর্শিতা, গভীরতা এবং ব্যাপকতা আজকের দিনের আদিবাসী মানুষের যে দুর্দশা, আন্দোলন ও উত্থান তা লক্ষ্য করলেই আমরা অনুভব করতে পারি। সেই বিচারে এম এন লারমা এ যুগের এক শ্রেষ্ঠ মানুষ মহান নেতা। যিনি মানবসমাজ ও সভ্যতার বিকাশকে কিছুটা হলেও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয় মানুষ হিসেবেও তিনি অনন্য গুণের অধিকারী। High thinking, simple living যাকে বলে, তাই পরিপূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছিল এমএন লারমার চরিত্রে। তিনি চিন্তা করতেন অনেক উঁচুতে, অনেক ব্যাপকতায়, অনেক গভীরে, কিন্তু জীবনযাপন করতেন একেবারে সাদাসিধে। সাদা প্যান্ট, সার্টই তাঁর অধিকাংশ সময়ের পোশাক। পার্টির সর্বোচ্চ নেতা হয়েও আন্ডার গ্রাউন্ড জীবনে তিনি নিজের কাপড় নিজেই ধুতেন। কারো বাড়ীতে গেলে বিশেষ করে রাত্রে গেরস্থরা যদি মোরগ-মুরগীর মাংস রান্না করার উদ্যোগ নেয় তখন তিনি তৎক্ষণাৎ তা নিষেধ করেন। বলেন, রাত্রি হলেই মানুষ যেমন ঘরে ফেরে, পশু-পাখিরাও ঘরে ফেরে, গবাদি পশু-পাখিরাও স্ব স্ব আশ্রয়স্থলে ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে। তাই এই অসময়ে সেখান থেকে তুলে কোন গবাদি পশু-পাখি কাটাও অমানবিক। আর কারো বাড়ীতে খাবার খেলেও তিনি খোঁজ নিতেন সবাই খেয়েছে কিনা অথবা তাদের জন্য পর্যাপ্ত রাখা হয়েছে কিনা। তাঁর সঙ্গীদেরও তিনি এ ব্যাপারে সজাগ হওয়ার পরামর্শ দিতেন। পরিবেশের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। প্রকৃতির প্রাচুর্য বনে থেকেও তিনি অহেতুক কোন গাছ কাটতে দিতেন না, লতা-পাতা ছিড়তে দিতেন না। দুর্লভ কোন প্রাণী শিকার করতে দিতেন না। নারী সমাজের প্রতিও ছিল তার গভীর দরদ। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, অসীম ধৈর্যশীল, কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী, আত্মবিশ্বাসী। ছিলেন সৎ, নিষ্ঠাবান, অমায়িক, ভদ্র, নম্র, সুশৃঙ্খল জীবনের অধিকারী। তার কণ্ঠস্বর ছিল মৃদু, গম্ভীর কিন্তু সবসময় যুক্তি সমৃদ্ধ।

আসলে এমএন লারমা ছিলেন আধুনিক সভ্যতার অগ্রসর ও আদর্শস্থানীয় মানুষদের একজন। এত বড় মানুষ, এত মহান নেতা যুগ যুগ ধরে পেছনে পড়ে থাকা পার্বত্য চট্টগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং সেখান থেকেই তিনি তাঁর বিকাশ ঘটিয়েছেন- এ যেমনি এক আশ্চর্যজনক, তেমনি শিক্ষণীয় এবং প্রেরণাদায়ক। যেন সময়ের প্রয়োজনে, যুগের প্রয়োজনে তাঁর এই আবির্ভাব। তিনি এমন এক মানুষ যাকে নিয়ে একজন সাধারণ জুম্মও গর্ব করতে পারে, তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং তাঁকে সম্মান করে নিজে সম্মানিত হতে পারে। তাই সেই ১৯৮৩ সালে এম এন লারমাকে যারা হত্যা করেছেন তারাই আজ ইতিহাসের আস্তাকুড়ে এবং চরম ঘৃণার পাত্র। যুগ যুগ ধরে তাদের এই দশাই বহন করতে হবে। আর এমএন লারমা? ভিয়েতনামের এক বিপ্লবী কবি যেমন বলেন, 'কিছু কিছু মৃত্যু আছে যা পরিণত হয় অবিনশ্বর জীবনে'- তেমনি এমএন লারমাও পরিণত হয়েছেন অবিনশ্বর এক জীবনে। সম্প্রতি আবার চুক্তি বিরোধীতার নামে নব্য বিভেদপন্থী সংকীর্ণ বিপ্লববাদীরা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ধুয়ো তুলে এম এন লারমার গড়া পার্টি ও তার যোগ্য উত্তরসুরী নেতৃত্বকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। যা শুধু পার্টি ও পার্টি নেতৃত্ব নয়, উপরন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য সংগ্রামরত জুম্ম জনগণের ধ্বংসই ডেকে আনতে চায়। কিন্তু এমএন লারমার নীতি-আদর্শে পরিচালিত যে পার্টি ও পার্টি নেতৃত্ব সেই পার্টি অচিরেই তাদের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ উৎখাত করবেই। আর যার চিন্তা-আদর্শে অচেতন-ঘুমন্ত মানুষ জেগে উঠেছে, পশ্চাদপদ, বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, নিজেকে জানেনা যে মানুষ দুনিয়াকে জেনেছে, একটি লাঠি একটি পুলিশ দেখলে পালিয়ে যাওয়া মানুষ সশস্ত্র লড়াই শিখেছে- সেই এমএন লারমার আদর্শ ও সৃজনশীল শক্তি যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ পার্টি, পার্টি নেতৃত্ব ও জুম্ম জনগণকে কোন শক্তিই নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না এবং তার ন্যায্য অধিকার কেউ শেষ পর্যন্ত ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আজকে বাংলাদেশ সরকারগুলি চুক্তি করেও চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না, প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে তাদেরকেও এই অতি আশ্চর্যজনক এবং অনিবার্য বাস্তবতাটি মনে রাখতে হবে। □

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর অস্তিত্বের প্রশ্ন

.... শ্রী তাতিন্দ্র লাল চাকমা ....

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভিন্ন ভাষাভাষি যে সকল জাতিসত্তা বর্তমানে বসবাস করছে তারাই হচ্ছে এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। প্রধানতঃ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বম, খিয়াং, মুরং- এসব জাতিসত্তার লিখিত দীর্ঘ ইতিহাস পাওয়া না গেলেও কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস থেকে জানা যায় এ অঞ্চলে এ সব জাতিসত্তাগুলোর আগে কোন মনুষ্য বসতি ছিলনা। চাকমা জাতির ইতিহাসে দেখা যায় মং সাং রাজার আমলে বিতাড়িত হয়ে চাকমারা প্রথম মাতামুহুরীর থৈনখালে বসতি স্থাপন করে। পরে রাজা শুকদেব রায়ের আমলে শিলক খালে তাদের রাজধানী স্থানান্তর করে। এ ছাড়াও বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন লুইনের লুসাই হিল অভিযানের বিবরণেও এ সব জাতিসত্তার উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সূত্রে ইতিহাস প্রমাণ করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামই হচ্ছে এসব জাতিসত্তাগুলোর আদি আবাসভূমি। কিন্তু তা সত্তেও এসব জাতিসত্তার লোকজন পার্বত্য চট্টগ্রামকে আন্দোলনের আগ পর্যন্ত নিজেদের একমাত্র আশ্রয়স্থল হিসেবে মেনে নেয়নি। আন্দোলনের সময়ে দেখা গেছে, একটা মারমা পরিবার একটুখানি বিপত্তির মুখোমুখি হলে মিয়ানমারে (বার্মা) পালিয়ে যায় বা পালিয়ে যেতে উদ্যত হয়। এরূপ একটা বম বা পাঙ্খো পরিবার অতি অনায়াসে ভারতের মিজোরামে পাড়ি জমাবার কথা ভাবে। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরারাও অনুরূপভাবে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে পালিয়ে যাবার কম প্রবণতা দেখায়নি। এমনকি অনেক চাকমা পরিবারও ভারতের মিজোরাম কিংবা ত্রিপুরা রাজ্যের উদ্দেশে রওনা দিতে দ্বিধা করেনা, যদিও সেখানে কোন চাকমা রাজ্যের অস্তিত্ব নেই। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলে যে ষাট হাজার আদিবাসী জুম্ম আশ্রয়ের সন্ধানে দেশান্তরী হয়েছিল তাদের বড় অংশটা ভারতে, অন্য অংশটা মিয়ানমারে চলে যায়। কিন্তু যারা চলে গেছে তাদের ভাগ্য আজকের দিন পর্যন্ত চরম হতাশা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটছে। কারণ ৪০ হাজার চাকমা তৎকালীণ নেফা (NEPA) বর্তমানে অরুণাচল প্রদেশে বসবাস করে দীর্ঘ তেতাল্লিশ বছর পরও নাগরিকত্ব পায়নি। মিয়ানমারে যারা দেশান্তরী হয়েছে তাদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। কারণ তারা প্রকাশ্য পরিচয় দিয়ে বাজারে নগরেও ঘুরাফেরা করতে পারে না।

সত্তর দশকে শুরু হয় অবর্ণনীয় দমন পীড়ন ও তার পাশাপাশি আন্দোলন। এই আন্দোলনের ডামাডোলে কত পরিবার কী অবস্থায় নিজের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে চলে গেছে তার হিসাব কেউ দিতে পারবেনা। ১৯৮১ সালে ফেনী তবলছড়ি থেকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে কয়েক হাজার পরিবার শরণার্থী হয়। কিন্তু এশিয়ার বৃহত্তম দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারত এ শরণার্থীদের জন্য একটুখানি জায়গা দিতে রাজি হয়নি। অবশেষে চরম লাঞ্ছণা, বঞ্চণা ও চরম তিক্ততা নিয়ে সেই শরণার্থীদের ফেরত আসতে হয়েছে। ফিরে এসে অনেকে জনসংহতি সমিতিকে দোষারোপ করেছে। অনেকে রাগে ক্ষোভে নিজেদের জায়গা-জমি, বাস্তুভিটাও বিক্রি করে দিয়েছে। এর পর ১৯৮১ সালে মিজোরামে আরেকদফা শরণার্থী হয়। ত্রিপুরাঘাট ও তাগলকবাকে শত শত পরিবার আশ্রয় খুঁজতে থাকে। কিন্তু সেখানেও ভারত সরকার তাদের আশ্রয় দিতে রাজি হয়নি। আশ্চর্যের বিষয় যে, যারা শরণার্থী তারা যেমনি চাকমা জাতির লোক আবার মিজোরামে যারা বাসিন্দা তারাও চাকমা জাতির লোক। তা সত্ত্বেও তারা ঐ শরণার্থীদের কোন ধরণের সুযোগ সুবিধা দিতে রাজি ছিলনা। তারাও ঐ শরণার্থীদের দুর্বলতার সুযোগ নিতে কসুর করেনি। অবশেষে চরম লাঞ্ছনা নিয়ে তাদেরকেও ফিরে আসতে হয়েছে ফেলে যাওয়া জায়গা-জমিতে। ফেরত আসতে রাজি না হওয়ায় বিএসএফ ও মিজো পুলিশ নির্যাতন করে শুধু ঘাম ঝরায়নি তারা শরণার্থীদের রক্তও ঝরিয়েছে। অনেককে পঙ্গু অবস্থায় ফেরত আসতে হয়েছে। অনেক মা-বোনকে বিবস্ত্র অবস্থায় লঞ্চে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

এই ঘটনা আরো বেশী গড়িয়েছিল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রিত শরণার্থীদের ক্ষেত্রে। তাদেরকে ভারত সরকার সাময়িক কালের জন্য আশ্রয় দিলেও স্থানীয় অনেকেই শরণার্থীদের কোন ধরণের সুযোগ সুবিধা দিতে রাজি ছিলনা। রান্নার জ্বালানী হিসেবে মেয়েরা যখন লাকড়ি আনতে যেত, তাদের কাছ থেকে সেসব অকাতরে তারা কেড়ে নিত। অজুহাত সেই একটাই- এটা তোমাদের দেশ নয়। এভাবে একটা গাছ একটা বাঁশও তাদের জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে আনার সুযোগ দেওয়া হতনা, যদিও সেসব বাসিন্দারাও নিপীড়িত জাতির লোক। অবশ্য পরবর্তীতে একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যতটা সঞ্চয় আছে তাতে মনে পড়ে- আমার মা-বাবারাও শরণার্থী হয়েছিলেন। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাবার সময় আমার বাবা একদিন বিনা চিকিৎসায় মারা যান। আমি তখন দায়িত্ব পালন করতে দূরে ছিলাম। তাই আমার সহকর্মীরা (নিমাই ও প্রতীম) আমার বাবাকে শেষ শ্রদ্ধা হিসেবে একটা খোলা জায়গায় দাহ করার চেষ্টা করে। দুই দিন ধরে চেষ্টা করেও কোথাও এক টুকরো জমি পাওয়া যায়না। টাকা দিয়েও কেউ রাজি হয়না। শেষ পর্যন্ত প্রতীম চাকমা জনৈক মন্ত্রী দাশ সরকারকে দুই বোতল মদ ভেট দিয়ে কোন রকমে ছোট্ট একটা ছড়ার পাড়ে দাহ করার অনুমতি পায়। ঐ ছড়াতেও শত চেষ্টা করেও আমার বাবার স্মৃতিসৌধ নির্মাণের অনুমতি পায়নি। এই ঘটনা আমার জীবনে এতই শিক্ষা দিয়েছে যে, আগে ভাবতাম 'বিদেশে গেলে রাজার ঝিও বেটি হয়'। এ প্রবাদটা সত্য- কিন্তু একটা দুর্দশাগ্রস্ত জাতির জন্য এ প্রবাদটা যেন যথেষ্ট নয়।

আন্দোলনের জ্ঞান আহরণ করতে গিয়ে এক সময় স্তালিনের একটা বই পড়েছিলাম- যেখানে জাতি সমস্যার কথা লেখা আছে। জাতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন- 'ঐতিহাসিকভাবে সংগঠিত এমন একটা জনসমষ্টি যাদের নির্দিষ্ট ভূখন্ড আছে, যাদের ভাষা এক, অর্থনৈতিক জীবন এক, মানসিক গড়ন এক এবং সেই মানসিক গড়ন নির্দিষ্ট সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়'। জাতির এই সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে সব চাইতে বড় বিষয় হচ্ছে ভূ-খন্ড। এই ভূ-খন্ডের মূল্য যে কত তা বুঝা গেল যখন বিশাল একটা দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাবার দাহক্রিয়ার জন্য এক খন্ড জমি যখন আমরা পাচ্ছিলামনা। কিন্তু দেখেছি এই জুম্ম জতিসত্তার লোকেরা অতি তুচ্ছ কারণে নিজের বাস্তুভিটা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। এই যে চলে যাওয়া এই যে নিজের বাস্তুভিটার প্রতি দরদ না থাকা- এটা এই জাতিগুলোর সহজাত প্রবণতা কেন? আন্দোলনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখলাম- এই পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল প্রাচুর্যে ভরপুর। প্রকৃতির অঢেল সম্পদ আহরণ করতে এখানে এই পাহাড়ীদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় না, কোন প্রতিযোগিতায় যেতে হয় না। এমনকি এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যেতেও কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। প্রকৃতির এই প্রাচুর্য আমাদের পূর্বসুরীদের যাযাবরের মতই জীবনযাপনে অভ্যস্ত করেছে। অথচ আজ সেই প্রাচুর্য শেষ হতে চলেছে। এখন আগের মত অবাধ বিচরণের জায়গাও আর নেই। তাই ভাবি, সেই মহান স্তালিনের কথা ভাবি- ঠিকতো, একটা জাতির জন্য একটা ভূখন্ড অবশ্যই কতটা দরকার। সেই ভূ-খন্ডই তার ঠিকানা। আজ যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, পার্বত্য চট্টগ্রামের মুরংদের কোথায় দেখা পাবে? জানা ব্যক্তি সহজে উত্তর দেবে- সেই চিম্বুক পাহাড়, সেই টঙ্কাবতী পাহাড়ে তাদের পাওয়া যাবে। আরো ভাবি- বাংলাদেশে বড়ুয়া নামে একটা জাতিও আছে যারা ধর্মে বুদ্ধিষ্ট। কিন্তু কোন সহৃদয়বান ব্যক্তি যদি বলে- সেই বড়ুয়াদের সাহায্য দিলে কোথায় দিতে হবে? তাদেরকে কোন জায়গায় পাওয়া যাবে? হয়ত দেখা যাবে নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের ঠিকানা তাদের নেই। কাজেই তাদের কোন স্থায়ী ঠিকানাও নেই। তাহলে এই ভূ-খন্ড একটা জাতির জন্য এতই অপরিহার্য? মনে পড়ে আন্দোলনের বিপক্ষে সরকার একদিন মুরং জাতির লোকজনকে ব্যবহার করেছিল। তখন মনে হয়েছিল সরকার তাদের প্রতি অত্যন্ত উদার। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ঐ মুরংদের ভূ-খন্ড সরকার কখনো গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য অধিগ্রহণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে, কখনো বনবিভাগ দখলে নিয়ে যাচ্ছে। কখনো রাবার প্লান্টেশনের নামে পাহাড়গুলো দখলে নিয়ে যাচ্ছে, কখনো রুমা ক্যান্টনমেন্ট সম্প্রসারণের জন্য অধিগ্রহণ করতে যাচ্ছে। যেভাবে হোক বা যে কারণে হোক জায়গা দখল করে নেয়ার অর্থ মুরং জাতিকে ঐ জায়গা থেকে বিতাড়িত করা আর সেই কাজটা করছে স্বয়ং সরকার। এই অবস্থায় মুরং জাতিসত্তা কি তাদের ভূ-খন্ড টিকিয়ে রাখতে পারবে? এ ভূ-খন্ড টিকিয়ে রাখতে হয়ত আন্দোলন করার বিকল্প কিছুই নেই। কিন্তু আন্দোলন করার নেতৃত্ব কি তাদের আছে?

শুধু মরংদের কথা বলি কেন, বমদের বসবাসের জায়গা রুমা উপজেলা- ঐ উপজেলা, আর্থা পাড়া, মোন্নাম পাড়া, রমনা পাড়া এবং বগালেক এরিয়া। ইতিমধ্যে রুমা থানার অনেক জায়গা বেহাত হয়েছে। এখন বগালেকেও বহিরাগতরা বন্দোবস্তি নিচ্ছে। তার অর্থ বমদের ভূ-খন্ডও অক্ষত থাকছে না।

এ ভূখন্ডে চিরস্থায়ীভাবে টিকে থাকার জন্য অর্থনৈতিক ভিত্তিও থাকা দরকার। জুম্মদের চাষাবাদ পদ্ধতিটা সেকেলে এবং প্রকৃতি নির্ভর। প্রকৃতির ঝড়বৃষ্টি একটু হেরফের হলে এসব প্রকৃতি নির্ভর চাষাবাদ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তদুপরি কাপ্তাই বাঁধের ফলে জুম্মদের আসল কৃষিযোগ্য জমিগুলো পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসবের বিকল্প হিসেবে জুম্মদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়নি। বিপরীতে বহিরাগতদের ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে মারমাদের ঠিকানা বান্দরবানের ব্যাপক এলাকা মারমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। চাকমাদের ঠিকানা নাইক্ষ্যংছড়িও ক্ষত-বিক্ষত। ইতিমধ্যে লামা, আলীকদম যেমনি বহিরাগতদের বন্দোবস্তির কারণে পাহাড় সমতল সবই বেহাত হয়েছে তেমনি খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা, রামগড়, মানিকছড়ির অবস্থাও শৌচনীয়। চুক্তির পরে মানিকছড়িতে গড়ে উঠেছে অদুদ(ওয়াদুদ) পল্লী, কখনো সামাজিক বনায়নের নামে কখনো চা বাগান প্রকল্পের নামে এসব ভূ-খন্ড প্রতিদিন গ্রাস করে নিচ্ছে, বেদখল হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্তবর্তী সমস্ত জায়গা-জমি। এসব প্রবণতা ছোট ছোট জাতিসত্তাগুলোর আবাসভূমিকে দিন দিন কেড়ে নেওয়ার প্রবণতা, এ প্রবণতা বড় জাতি কর্তৃক ছোট ছোট জাতিগুলোর অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। এ প্রবণতার বিরুদ্ধে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়েছে। এ সংগ্রামের ফলে অর্জিত চুক্তিতে খ খন্ডে ২৬ নং ধারার ক) অংশে উল্লেখ আছে 'আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের(জেলা পরিষদ) পুর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না'। কিন্তু তারপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোর মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে নিজেদের ভূ-খন্ড রক্ষার উপলব্ধি যথেষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়না। এসব জাতির লোকেরা এখনও অকাতরে জায়গা-জমি বিক্রি করে এবং ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে সোচ্চার

হয়না। অথচ জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকার প্রথম শর্ত নির্দিষ্ট ভূখন্ড।

এ ভূখন্ডে চিরস্থায়ীভাবে টিকে থাকার জন্য অর্থনৈতিক ভিত্তিও থাকা দরকার। জুম্মদের চাষাবাদ পদ্ধতিটা সেকেলে এবং প্রকৃতি নির্ভর। প্রকৃতির ঝড়বৃষ্টি একটু হেরফের হলে এসব প্রকৃতি নির্ভর চাষাবাদ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তদুপরি কাপ্তাই বাঁধের ফলে জুম্মদের আসল কৃষি চাষযোগ্য জমিগুলো পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসবের বিকল্প হিসেবে জুম্মদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়নি। বিপরীতে বহিরাগতদের ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও জুম্ম জাতিসত্তাগুলোর জীবন যাপনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা না থাকায় ব্যবসা বাণিজ্যকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। কারণ ব্যবসা মাত্রই প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যাওয়া। যে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না সে ব্যবসা বাণিজ্যে সফল হতে পারবে না। জুম্ম সমাজ একে তো প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সমাজে নেই তদুপরি সরকারী প্রশাসনও কোনরকম সহযোগিতা ও আনুকূল্য প্রদর্শন করে না বিধায় জুম্ম সমাজেও কোন ব্যবসায়িক অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারে না।

বর্তমান সময়েও দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্ত রকমের ব্যবসা বাণিজ্য বহিরাগতদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে। পাহাড়ীদের বাড়ির উঠোনে লাগানো গাছ বাঁশ পাহাড়ীরা ঠিকমত বিক্রি করার সুযোগ পায় না। যে বাঁশ জুম্মরা বিক্রি করে প্রতি বাঁশের দাম পায় চার থেকে পাঁচ টাকা। আর সেই বহিরাগত ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রাম সীমান্তে বিক্রি করে প্রতিটি বাঁশ ১৫ টাকায়। এই লাভের সিংহ ভাগটায় জুম্মদের হাতছাড়া হয়। ফলে জুম্মদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা থাকে না এবং কোন ধরনের বিপর্যয় বা বিপত্তির মুখোমুখি হলে তার আর রক্ষা থাকে না। তখন জুম্মরা নিজেদের জায়গাজমি এবং বাস্তুভিটা বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। এভাবে শহরাঞ্চলের যাবতীয় মূল্যবান জায়গাজমি এবং বাজার এলাকার যাবতীয় মূল্যবান জমিগুলো ইতিমধ্যে জুম্মদের হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। এছাড়াও বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে প্রশাসন সময়ে সময়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা করে নির্যাতন করে জুম্ম পরিবারগুলোকে সর্বশান্ত করে ফেলে এবং জুম্মরা জীবনের তাগিদে বাস্তুভিটা বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে জেলা পরিষদের হাতে হাটবাজার ও ব্যবসা বণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সরকার ইচ্ছে করে সেটা কার্যকরী করছে না। আমরা জুম্ম সমাজের অর্থনৈতিক জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই এখনও 'দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য' এই বিনিময় প্রথা বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত গ্রামগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে। এখনও ঐসব গ্রামে চাউলের বিনিময়ে কাপড় চোপড়, প্রসাধনী দ্রব্য ও গৃহস্থালী সামগ্রী লেনদেন করে থাকে, সমাজে অর্থনীতিতে জুম্ম সমাজ এখনও সামন্ততন্ত্রের প্রথম ধাপে আছে শতকরা দুই থেকে পাঁচ অংশ। আর বিনিময় প্রথার অন্য রূপটা হচ্ছে 'দ্রব্য-মূদ্রা-দ্রব্য'। বিনিময়ের এই প্রথাটা সামন্ত যুগের দ্বিতীয় পর্যায়। আমাদের সমাজে চাউল কিংবা মোরগ-মুরগী কিংবা গরু ছাগল বাজারে নিয়ে বিক্রয় করে কিছু মুদ্রা মানে টাকা পায়। ঐ টাকা দিয়ে তার পরিবারের চাহিদানুযায়ী দ্রব্য সামগ্রী কিনে নিয়ে আছে। এই প্রথাটা প্রায় শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ জনের মধ্যে প্রচলন দেখা যায়। এই হিসেবে আমাদের জুম্ম সমাজ এখনও সামন্ত সমাজে পুরোপুরিভাবে নিমজ্জিত। যে কারণে প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলতেন- 'জুম্ম সমাজ সামন্তসমাজে আকণ্ঠ নিমজ্জিত'। আমরা আরো বিশ্লেষণ করলে দেখি সমাজে এমন প্রথাও আছে যারা 'মূদ্রা(অর্থ)-দ্রব্য-মূদ্রা' এই রীতিতে কাজ কারবার করে। তারা প্রথমে টাকা দিয়ে কিছু জিনিস কিনে এবং কিছু বেশী টাকা দিয়ে আবার ঐ জিনিস বিক্রয় করে। এই রীতিতে মানুষ মুনাফা অর্জন করে এবং ধীরে ধীরে ঐ মুনাফাকে বাড়িয়ে নিয়ে সেই রীতিতেই তার জীবিকা নির্বাহ করার চেষ্টা করে। জুম্ম সমাজে ঠিক এই পদ্ধতিরই বিকাশ হওয়া দরকার। কেননা এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই পৃথিবীর মানুষ নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। আমাদের জুম্ম সমাজেরও তাই করা উচিত এবং করতেই হবে। তা করতে না পারার অর্থ অর্থনৈতিক কারণে নিজের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া আর বাস্তুভিটা হারানোর অর্থ ধ্বংসের শেষ পর্যায়ে উপনীত হওয়া।

আপাতত: জুম্ম সমাজের লোকেরা অনেকেই একথাটা স্বীকার করেন এবং ভালভাবে বোঝেন। কিন্তু আমাদের সমাজে যেহেতু প্রতিযোগিতা নেই; কোন প্রতিবন্ধকতাও নেই। এসবেরও অভিজ্ঞতাও নেই। তাই ইচ্ছা থাকা সত্বেও সেই ব্যবসাতে আমরা সফল হতে পারি না। কেন আমরা পারি না তার উপলব্ধি করা দরকার এবং যে গুণ আমাদের দরকার সে গুণের অধিকারী হবার জন্যে আমাদের কঠোরভাবে প্রচেষ্টা চালানো দরকার। একারণে প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রায়ই বলতেন- একজন মানুষের (কর্মী) শিক্ষা গ্রহণের গুণ, পরিবর্তন হওয়ার গুণ ও ক্ষমাগুণ অবশ্যই থাকা উচিত। তাই আমাদের ও অন্যান্য জাতির লোকদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করা উচিত নয়।

যা হোক অর্থনীতিতে এই স্থায়ীত্ব না থাকার কারণে এবং ব্যবসায়ী অর্থনীতি অনুপস্থিত থাকার কারণে জুম্ম অর্থনীতি মূলত: উচ্ছন্ন। এই উচ্ছন্ন অর্থনীতি উচ্ছন্ন মানসিকতা সৃষ্টি করে। তাই আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় উচ্ছন্নতার বেড়াজালে আবদ্ধ। এই কারণে জুম্ম জনগণের মধ্যে শিক্ষিত লোক থাকলেও কোন প্রতিষ্ঠিত কবি সাহিত্যিক যেমনি নেই তেমনি কোন সমর বিশারদ নেই, নেই কোন শিল্পীও। যারা দেশ বিদেশে জাতির পরিচয় দিয়ে জাতির সুনাম অর্জন করতে পারে। কিন্তু সংস্কৃতি যদিও অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিফলন তথাপি এটাই সবকিছু নয়। এই সমাজে একটা রাজনৈতিক সংস্কৃতি

গড়ে উঠতে পারে। সামন্ত সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনপ্রবাহ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে চিন্তা করলে আমরা দেখি জাতীয়তাবাদী চিন্তচেতনায় মানুষ পরিপুষ্ট হয়। আর গতানুগতিক সামন্ততান্ত্রিক একনায়কত্বকে ডিঙ্গিয়ে মানুষ গণতন্ত্রমনা হয়ে উঠে। এইসব জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র কিন্তু সামন্ত চিন্তাধারা থেকে একধাপ উচ্চ স্তরে উন্নীত। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় যে নেতৃত্ব গড়ে উঠে সেই নেতৃত্বের জন্য জুম্ম সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী শ্রেণী নেই। তাই প্রয়াত নেতা বলতেন- জুম্ম সমাজে ব্যবসায়ী অর্থনীতির ভিত্তি না থাকার কারনে বুর্জোয়া চিন্তাধারা এই সমাজে নেতৃত্ব দিতে পারে না'। অধিকন্তু জুম্ম জাতিগুলোর অবস্থান এমনভাবে পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে, একটা জাতি অরেকটা জাতির সহযোগিতা ছাড়া কোন রাজনৈতিক দল গড়ে তুলতে পারে না। এক্ষেত্রেও বুর্জোয়া চিন্তাধারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয় না। কারন বুর্জোয়া চিন্তাধারা হয় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চিন্তার জন্ম দেবে নয় তো উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা কোন অবস্থায় সুদৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। এইসব অবস্থার কারণে জুম্ম সমাজের প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। তা করতে না পারলে ঐতিহাসিকভাবে সংগঠিত হওয়া সম্ভব নয়।

জুম্ম সমাজের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্মীয় ভাবধারাও ভিন্ন ভিন্ন। সমাজের কোন কারণে হৃদয়বান ব্যক্তি ধর্মের ভিত্তিতে এইসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জাতিগুলোর ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালান। এই ধরনের প্রচেষ্টাও কোন সময় সফল হতে দেখা যায়নি। আমাদের পার্শ্ববর্তী মিজোরামেও মিজো জাতীয়তাবাদী ভাবধারার ভিত্তিতে আন্দোলন হয়েছে দীর্ঘদিনের। কিন্তু মিজোর জাতীয়তাবাদকে অন্যান্য জাতির লোকেরা উগ্রজাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করছে মনে করার কারণে অপরাপর জাতিগুলো নিরাপদ মনে করতো না। তা মিজোরামের আভ্যন্তরীণ চাকমা ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল, পোই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, লাকের ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ইত্যাদি গঠিত হয়েছে। মিজো জাতীয়তাবাদ ওখানকার চাকমা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে না পারায় এক সময় তারা ধর্মের আশ্রয় নেয়। তারা নানা প্রলোভন দেখিয়ে চাকমাদের খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করতো। কিন্তু প্রলোভনেও সবসময় কাজ হয় না দেখে এক মিজো ধর্ম প্রচারক তার চাকমা বন্ধুদের বলতে থাকেন- নব্বই এর দশকের কোন এক সময় এই পৃথিবীতে বিরাট অন্ধকার নেমে আসবে তখন স্বয়ং লালপা (যীশু) এসে ধর্ম ভক্তদের সামনে এসে দাঁড়াবে। তখন স্বয়ং লালপা একটা বিরাট সিড়ির মত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই সময় যারা ধর্ম প্রাণ তাদেরকেই লালপা ঐ সিড়ি বেয়ে উঠতে দেবে। ঐ সিড়ি পার হতে পারলে তখন স্বর্গে পৌছে যাবে। তারা আর মরবে না।' তখন বন্ধুটি জিজ্ঞেস করে- ঐ যে জিরতাং, চিরকুপ- এরা তো বড় বড় ব্যবসায়ী তারাও কি স্বর্গে যেতে পারবে? মিজো বন্ধুটি বলে- হ্যাঁ আমার বিশ্বাস তারা স্বর্গে যেতে পারবে। কারন তারা সবাই খৃষ্টান মিশনারীদের বিশ্বাস করে চাঁদা দেয়।' তখন চাকমা বন্ধুটি উল্টো সুরে বলে- ঠিক আছে- আপনারা যখন সবাই স্বর্গে যাবেন তখন এই মিজোরামে শুধু আমরা চাকমারাই থাকবো। গোটা মিজোরাম তখন আমাদের হবে। আর ঐ জিরতাং এর ব্যবসাটা আমিই চালাবো। শুনে মিজো বন্ধুটি হঠাৎ উল্টো সুরে বলে উঠে- নাহ! সেটা হবে না। আমরা কখনো চাকমাদেরকে মিজোরাম দিতে পারবো না; দেবো না। চাকমা বন্ধুটি আবার বলতে থাকে- কেন? আপনারা স্বর্গে গেলে তখন মিজোরামে কেউ থাকবে না। তখন চাকমারাই মিজোরাম নাম বদলিয়ে চাকমা দেশ নাম রাখবে। মিজো বন্ধুটি তৎক্ষণাৎ ক্ষেপে গিয়ে বলতে শুরু করে- 'মিশচয়াল(শয়তান) চাকমা। তোমরা এইরকম সুযোগের আশায় থাকো। দরকার হলে আমি স্বর্গে যাবো না তবু মিজোরাম তোমাদের হাতে দেবো না।' দেখা গেল স্বার্থের কারণে মানুষ ধর্মকে ব্যবহার করে আবার স্বার্থের টানে যেকোন মুহূর্তে ধর্মকে বিসর্জন দিতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাইলে স্বার্থকে সামনে রেখে নয়; স্বার্থকে বিসর্জন দিয়েই ঐক্য গড়ার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আর এই স্বার্থকে বিসর্জন দিতে পারে একমাত্র প্রগতিশীল চিন্তাধারা। ব্যবসায়িক চিন্তাধারা এই স্বার্থ থেকেই উদ্ভূত। তাই এই চিন্তাধারা জুম্ম জাতিগুলোকে সংগঠিত করতে পারে না।

আমরা আবারো একবার যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোকে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো- জাতিগুলো জনসংখ্যায় নগণ্য, ভাষাগত তারতম্য অনেক, ভৌগলিক পরিবেশ পরস্পর পরস্পরের সাথে জড়াজড়ি, ধর্মীয় বিশ্বাসে ভিন্নতা অনেক- ঐক্য শুধু অর্থনৈতিক দুর্দশায়, রাজনৈতিক নিপীড়ন-নির্যাতনে। যার ফলে ক্রমশ: ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই ধ্বংস থেকে রেহাই পেতে হলে ঐতিহাসিকভাবে ইস্পাত কঠিন ঐক্যে সংগঠিত হয়ে টিকে থাকার সংগ্রাম চালাতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই। □

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান সাধারণ বাস্তবতা

.... বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ....

আজ থেকে বিশ বছর আগে ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর এক দুর্যোগপূর্ণ কালো রাত্রিতে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে প্রতিক্রিয়াশীল কুচক্রীরা নৃশংসভাবে হত্যা করে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন জুম্ম জনগণের স্বাধিকার চেতনার উন্মেষক এবং স্বাধিকার আন্দোলনের জনক ও আজীবন সংগ্রামী। এই ষড়যন্ত্রমূলক হত্যার উদ্দেশ্য ছিল জুম্ম জনগণের স্বাধিকার আন্দোলনকে নির্মূল করা এবং জুম্ম জাতিকে ধ্বংস করা। কেননা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জুম্ম জনগণকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। জুম্ম জনগণ যাতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকারসহ স্বচ্ছন্দ্য সুখী জীবন যাপন করে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারেন সেই লক্ষ্যে তিনি নিঃস্বার্থ আন্তরিকতায় সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। তাঁর এ মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শত শত দেশপ্রেমিক স্বাধিকার সংগ্রামী জুম্ম বীর যোদ্ধাগণ তাঁরই নেতৃত্বাধীনে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই আন্দোলন যখন প্রচন্ড গতিপ্রাপ্ত হয়ে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হতে থাকে ঠিক সেই সময় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়; ষড়যন্ত্রের এক পর্যায়ে ১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর আটজন অকুতোভয় অসীম সাহসী সহযোদ্ধা এবং বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবন হরণ করে। প্রতিক্রিয়াশীল কুচক্রীমহল পৈশাচিক উল্লাসে এই নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটিয়ে জুম্মদের স্বাধিকার আন্দোলন স্তব্ধ করার ব্যর্থ প্রয়াস পায়। কিন্তু তা হয়নি। তাদের সেই ঘৃণ্য প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

মানুষ মরণশীল, কোন মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না। কিন্তু প্রগতিশীল আদর্শের মৃত্যু নেই। সেই অমর আদর্শ প্রজন্ম হতে প্রজন্ম পরম্পরা সঞ্চারিত হয়ে পৃথিবীতে টিকে থাকে, দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জুম্ম জাতিকে মহৎ জাতিতে প্রতিষ্ঠিত করার যে মহান আদর্শ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই আদর্শেরও মৃত্যু নেই। সেই আদর্শ নিজেকে, সমাজকে জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার আদর্শ। তাই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং তাঁর সহযোদ্ধাদের অন্তর্ধানের মুহূর্তেই দেশপ্রেমিক জুম্ম বীর যোদ্ধারা নূতন উদ্যমে, নূতন কৌশলে স্বাধিকার সংগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সুযোগ্য অনুজ বিপ্লবী শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার (সন্তু) হাতে নেতৃত্বের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হল। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি পদেও তাঁকে বরণ করা হল। তার পরের ইতিহাস- জীবন মৃত্যু- পায়ের ভৃত্য, চিন্তা - ভাবনাহীন, সুকঠিন সংগ্রামের ইতিহাস। উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়, সফলতা এবং বিফলতার মধ্য দিয়ে একদিন আংশিক সাফল্য লাভ হল। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকার জুম্ম জনগণের স্বাধিকার মেনে নিলেন। "পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় অঞ্চল" ইহা স্বীকার করে নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদন করলেন। এই চুক্তির প্রস্তাবনা হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি চারিখন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হলেন। এই চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি নামে অভিহিত।

ঐতিহাসিক এই চুক্তির প্রায় নয় মাস পরে ১৯৯৮ সালের ২রা সেপ্টেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়। জনসংহতি সমিতির সভাপতি বিপ্লবী নেতা শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব ১৯৯৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রহণ করেন। আঞ্চলিক পরিষদের উপজাতীয় সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই জনসংহতি সমিতির সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ রয়েছেন। তন্মধ্যে রূপায়ন দেওয়ান, ঊষাতন তালুকদার, গৌতম কুমার চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা, কে এস মং, রক্তোৎপল ত্রিপুরা প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২ জন উপজাতীয় মহিলা সদস্যও আছেন এবং অউপজাতীয়দের মধ্যে ১ জন মহিলা সদস্যাসহ মোট ৭ জন সদস্য রয়েছেন। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণকে পদাধিকারবলে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য বলে গণ্য করার বিধানও রাখা হয়েছে।

আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব গ্রহণ করার দিন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাবী সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেল। অন্ততঃ সকলের মনে এই ধারণা। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে দ্বাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের রাজা জন কর্তৃক প্রজাগণকে প্রদত্ত ম্যাগনাকার্টা বা অধিকারের সনদ হিসেবে বিবেচনা করেন। ইহা শ্রুতিকটু এবং দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলাফল পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মধ্যে তেমন সাড়া জাগায়নি। জনগণ অঞ্চলিক পরিষদ চালু হওয়া প্রত্যক্ষ করেছে, আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলী তাদের যেমন চোখে পড়ছে না তেমনি ফলাফল তাদের দুয়ারে পৌঁছেনি। এখনো জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, উপজেলা বা থানা প্রশাসন কিংবা প্রশাসনের সর্বস্তরে আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিষ্ঠা ও চালুর কার্যকরী আইন করা হয়নি- ফলতঃ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে

আঞ্চলিক পরিষদ এখনো অপরিজ্ঞাত থেকে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পর্কীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে আঞ্চলিক পরিষদের ঘোষণা দিয়ে প্রশাসনের সর্বস্তরে সার্কুলার করার দায়িত্ব সরকারের। এই কর্তব্যও সরকারের।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির আদ্যপান্ত শর্তসমূহ কি কি সেই সব জনসংহতি সমিতি বিশদভাবে জুম্ম জনগোষ্ঠীর সাধারণ লোকের মধ্যে ইতিমধ্যে বার বার ব্যাখ্যা করেছেন। কাজেই চুক্তির ধারাসমূহ সাধারণ লোকের কাছে অজানা থাকার কথা নয়। আলোচনার সুবিধার্থে আমি এখানে চুক্তির কয়েকটি প্রধান অংশ উল্লেখ করছি।

চুক্তির "ঘ' খন্ডের ১ নং ধারাতে উল্লেখ আছে- বাংলাদেশ সরকার এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত শরণার্থীদের নেতৃবৃন্দের সাথে ১৯৯৭ সালে ৯ মার্চ আগরতলায় স্বাক্ষরিত ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধা সম্বলিত চুক্তি অনুযায়ী ২৮ মার্চ ১৯৯৭ তারিখ হতে জুম্ম শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মোট ২২,২২২ পরিবারে সর্বমোট ৬৪,৬০৯ জন জুম্ম শরণার্থী দেশে ফিরে আসেন। এই চুক্তির আওতায় গঠিত শরণার্থী পুনর্বাসন টাস্কফোর্স এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিধাদি দেওয়া হলেও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী জমি ও ভিটেমাটি ফেরত দেওয়া হয়নি। জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী জানা যায় ৩০৫৫ পরিবার বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ভূমি ফেরৎ পায়নি অদ্যাবধি।

- বাস্তুভিটা ফেরত পায়নি - ১৩৩৯ পরিবার।
- বাগান ভিটা ফেরত পায়নি- ৭৭৪ পরিবার।
- ধান্যজমি ফেরত পায়নি- ৯৪২ পরিবার।

সর্বমোট জমিজমা ফেরত পায়নি- ৩০৫৫ পরিবার।

এইসব জমি সবই রাজনৈতিকভাবে অভিবাসিত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত বাঙালী সেটেলারদের বেদখলে রয়েছে।

চুক্তির "ঘ" খন্ডের ১ নং ধারায় তিন পার্বত্য জেলায় আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করে চুক্তিতে প্রস্তাবিত টাস্কফোর্সের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে বলা হয়েছে। কিন্তু শরণার্থী পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স এই চুক্তির শর্ত লংঘন করে সেটেলারদেরও আভ্যন্তরীণ শরণার্থী সংজ্ঞায়িত করে তাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

শরণার্থী টাস্কফোর্সের ১৫ মে ২০০০ সালের একাদশ সভায় ৯০,২০৮ উপজাতীয় পরিবার এবং ৩৮,১৫৬ অউপজাতীয় (বাঙালী সেটেলার) পরিবারকে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসাবে পরিচিহ্নিত করা হয়। জনসংহতি সমিতিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল স্তরের জনগণের পক্ষ থেকে সেটেলারদেরক আভ্যন্তরীণ অউপজাতীয় উদ্বাস্তু হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বাতিল করা হোক। বহিরাগত ও অউপজাতীয় সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে স্থানান্তর ও পুনর্বাসিত করা হোক।

অতি সম্প্রতি জানা গেছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার সেটেলারদের আভ্যন্তরীণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করার জন্য আলাদা টাস্কফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

চুক্তির ২৪(ক) ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তৎনিম্নস্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। এবং পরিষদ তাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখতে হবে। কিন্তু সরকার এই শর্ত পূরণের উদ্দেশ্যে অদ্যাবধি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

চুক্তির "ঘ" খন্ডের ১৭(ক) ধারায় উল্লেখ আছে যে, সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সাথে সাথে সীমান্তবর্তী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা সেনানিবাস) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী সেনানিবাসে ফেরত নেওয়া হবে এবং এই লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে।

কিন্তু জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার দীর্ঘ ছয় বছর পরও ক্যাম্প প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে এখনো সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। বিগত সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীসহ বিভিন্ন মন্ত্রী আমলাগণ কখনো ৬২ টি ক্যাম্প কখনো ৭২ টি ক্যাম্প প্রত্যাহারের কথা বলে থাকেন। জনসংহতি সমিতির তথ্য মোতাবেক বিগত বছরগুলোতে এখনো ৩১টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলায় সাড়ে পাঁচ শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্প রয়েছে। কোন কোন ক্যাম্প থেকে সেনাবাহিনীর সদস্য প্রত্যাহার করা হলেও সেখানে আবার অন্যান্য আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে। চুক্তির "ঘ" খন্ডের ১১নং ধারায় উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করবেন। রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলা শহরে দু'টি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত আছে। খাগড়াছড়িতেও অনুরূপ একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে। উপজাতীয় ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জন্য যথাযথ কর্মকান্ড পরিচালনার নিমিত্তে সরকার কোন অর্থ বরাদ্দ প্রদান করেন না। কেবল মুষ্টিমেয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাসিক বেতন বরাদ্ধ দিয়ে কোন রকমে এইগুলি টিকিয়ে রাখা হয়েছে মাত্র।

চুক্তির "ঘ" খন্ডের ৩নং ধারায় সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য পরিবার প্রতি দুই একর জমি (চাষযোগ্য) স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতাসাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া এবং যদি প্রয়োজনমত জমি পাওয়া না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে টিলা জমির ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি ভূমিহীন জুমিয়াদের ভূমি বন্দোবস্তীর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউএনডিপি, এডিবি এবং আরো বিদেশী উন্নয়ন সংস্থা/ দাতা সংস্থাসমূহ এখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কোন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। চুক্তির অনেকগুলো শর্ত বা ধারার মাত্র কয়েকটি - এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়িত হলে "পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় অঞ্চল" বিবেচিত হওয়ার ন্যূনতম শর্ত হয়তো পুরণ হতে পারতো। চুক্তির পর পরই তৎকালীন সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে নানা তালবাহানা শুরু করে দেয়। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত তৎকালীন তিন উপজাতীয় সংসদ সদস্য সরকারের পদলেহী ভূমিকা গ্রহণ করে। তখন একজন মন্ত্রী, একজন প্রতিমন্ত্রী (শরণার্থী পুনর্বাসন টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান) একজন উপমন্ত্রী (পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান) পদমর্যাদায় আসীন। তারা সরকারের পক্ষে সাফাই গাইতে থাকেন মাত্র, তাদের এই ভূমিকা প্রকারান্তরে চুক্তি বাস্তবায়নে বিরোধীতার সহায়ক হয়ে উঠে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনগণের স্বাধিকার আন্দোলনের মুখে এবং আন্তর্জাতিক চাপের ফলে বাংলাদেশ সরকার বাধ্য হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। চুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে চুক্তির শর্তানুসারে জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য অস্ত্র জমাদান করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। তখনই সরকার ধারণা করে বসে যে, জনসংহতি সমিতি আন্দোলনের (সশস্ত্র) যতি রেখা টানা গেছে, জনসংহতি সমিতি আর স্বাধিকার আন্দোলনের মানসিকতাসম্পন্ন নেই, তাদের সংগ্রামী মনোবৃত্তির অবসান হয়েছে। যাহার কারণস্বরূপ বলা যায়, দীর্ঘ দুই দশক স্বাধিকার আন্দোলনের পর সরকার পক্ষ থেকে যখন চুক্তির মাধ্যমে স্বাভাবিক এবং সহজ জীবন-যাপনের সুযোগ লাভের আশ্বাস পাওয়া গেল, তখনই তারা স্বাধিকার আন্দোলন ত্যাগ করে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে গেলেন। আন্দোলনের স্তব্ধ গতি ও নিরস্ত্র জনসংহতি সমিতিকে সরকার আর বিপ্লবী আখ্যা দিতে রাজি নহেন। বরঞ্চ ঘরমুখো সাধারণ মানুষ বলে ধারণা করতে শুরু করেন। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না করার পিছনে এটাও একটা কারণ। সম্ভবতঃ প্রধান বা মূল কারণ।

তবে আসল কারণ ইতিহাসের গভীর অতীতে নিহিত রয়েছে। তা হচ্ছে এই- পার্বত্য চট্টগ্রাম (এককালে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল) এক সময় ছিল পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি। এর অধিবাসীগণ স্বতন্ত্র ঐতিহ্য সংস্কৃতির অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক হলেও বাইরের লোকেরা তাদের সবাইকে "জুম্ম" নামে অভিহিত করে। তাই তারা এখন জুম্ম নামে পরিচিত। রাজতান্ত্রিক কাঠামোয় সামন্তপ্রভূদের দ্বারা শাসিত হলেও স্বগোত্রীয় শাসকের অধীনে জুম্ম জনগোষ্ঠী স্বাধীনই ছিলেন। ভূমির উর্বরতাসহ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ, নৈসর্গিক সৌন্দর্যে অতুলনীয় ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ পার্বত্য অঞ্চলে জুম্মগণ সচ্ছল, স্বচ্ছন্দ ও সুখী জীবন-যাপন করতেন। ভারতের দোর্দন্ড প্রতাপশালী মোগল সাম্রাজ্যের শাসন এখানে কোন দিন প্রসারিত হয়নি। কেবলমাত্র এখানকার জুমে উৎপাদিত কার্পাস যৎসামান্য কর হিসাবে পেয়ে মোগল শাসকরা সন্তুষ্ট থাকতেন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ জয়ের পর বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের সর্বত্র তাদের শাসন বিস্তার করে। ক্রমে ক্রমে পার্বত্যাঞ্চলে জুম্মদের এই স্বাধীন ভূখন্ডে তাদের আগমন ঘটে। ১৮৬০ সালে বৃহত্তর চট্টগ্রাম কে এতদাঞ্চলে বিচ্ছিন্ন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে স্বতন্ত্র জেলা গঠন করতঃ শাসন বহির্ভূত এলাকা নামে Absolutely জুম্ম অধ্যুষিত এলাকা হিসাবে বৃটিশরা শাসন করতে থাকেন। ১৯৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি(C.H. Tracts manual) প্রবর্তন করে এ জেলায় বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। একরকম প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু এই বিধিতে বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হলেও বাজার ফান্ড আইন প্রবর্তন করে পরোক্ষভাবে বহিরাগতদের প্রবেশ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। কেননা, পার্বত্য চট্টগ্রামে যেইসব স্থানগুলি (বাণিজ্যিক) বাজার হিসাবে চিহ্নিত, সেইসব স্থানে বা বাজারে বহিরাগত যে কেহ ভূমি (দোকানের স্থান) অস্থায়ী বন্দোবস্ত পেতে পারে বা স্থায়ীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বসবাস করতে পারে। বলাবাহুল্য এভাবেই বাজার ফান্ডের চোরাগলি দিয়ে বহিরাগত অউপজাতীয় লোক পার্বত্য চট্টগ্রামে হু হু করে প্রবেশের মাধ্যমে তাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করে।

বৃটিশরা ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে এদেশ ত্যাগ করেন। The Indian Independence Act, Act of 1947 এর অধীনে ভারত ও পাকিস্তান এ দু'টো রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ট অঞ্চলগুলো নিয়ে পাকিস্তান এবং অবশিষ্ট হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, পারসিক, শিখ প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোক অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে ভারত গঠিত হয়। তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমান মোটেই ছিল না। অধিবাসীদের মাত্র ১.৫০% শতাংশ ছিল বাঙালী মুসলমান এবং ৯৮.৫০% শতাংশ অমুসলমান জুম্ম জনগোষ্ঠী ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী। এখানে উল্লেখ্যঃ The first schedule of the Indian independencey Act, 1947, contained the list of Bengal districts to be included in the new Province of East Bengal. It clearly laid down- ``In the Chittagong Division- the district of Chittagong, Noakhali and Tripura". There was no mention of the Chittagong Hill Tracts. (Greatest Blunder of partition- Excerpt from- All that glisters by Mukur Kanti Khisa.)

এই কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন ছাত্র, বুদ্ধিজীবী স্নেহ কুমার চাকমার নেতৃত্বে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ তারিখ ভোরে রাঙ্গামাটিতে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। পরে ২২শে আগষ্ট পাকিস্তানী ফৌজ এসে ভারতীয় পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করে।

দেশ বিভক্তির পর পাকিস্তানী শাসক মুসলমান জনগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে অমুসলমান জুম্মদের উপর কর্তৃত্ব শুরু করে। শিল্পোন্নয়নের নামে কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের হৃদয়ভূমি জলমগ্ন করে জুম্মদের ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। এই ধ্বংসাত্মক বাঁধ প্রকল্পের বিরোধীতা করতে সক্ষম হননি আমাদের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ বা জনগণ। জুম্ম জনগণের ভাবী জননেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এর বিরোধীতা করে কারাবরণ করেছিলেন। তাঁকে ১৯৬৩ সালে ১০ই ফেব্রুয়ারী ছাত্রাবস্থায় চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার করা হয়। পাকিস্তানের দীর্ঘ চব্বিশ বছরের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়েন এবং ষাট হাজার জুম্ম দেশ ত্যাগ করে ভারত ও বার্মায় (বর্তমান মিয়ানমার) গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশে পাকিস্তানী স্বৈরশাসনের অবসান হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে নূতনভাবে শোষণ- নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। মোঘল, বৃটিশ, পাকিস্তান- এই তিন জাতির শাসনামল ছিল রাজতান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক শাসনকাল। জুম্ম জনগোষ্ঠী শুধু শাসিত হয়েছিল, শোষিত হয়েছিল মাত্র। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সেই রূপ স্বৈরাচারী ও ঔপনিবেশিক শাসক নয় বলে দাবী করা হয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের যে ভূমিকা ও কার্যক্রম, তাতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের চরিত্র পুরোপুরি ঔপনিবেশিক ও স্বৈরাচারী বলে প্রমাণিত হয়। অন্ততঃ বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে ঠিক তাই প্রমাণিত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী করে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরোধীতা করে ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়। জুম্ম জনগণের অনেকেই প্রথম প্রথম ইউপিডিএফ এর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবীর কথায় আশাবাদী হয়ে উঠে। কিন্তু যখন ইউপিডিএফ চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসী তৎপরতা শুরু করে তখন ইউপিডিএফ এর প্রতি জুম্ম জনগণের মোহ ভঙ্গ হয়ে যায়। সকলেরই বুঝতে কষ্ট হলো না যে, ইউপিডিএফ নেতা প্রসিত বিকাশ খীসা সরকারের কোন এক প্রভাবশালী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর কুটনীতির ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। এখন ইউপিডিএফ এর আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসংহতি সমিতির নেতা ও নেতৃত্বকে ধ্বংস করা এবং চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া রুদ্ধ করে দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়....একথা বুঝতে কারো কষ্ট হয় না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বাস্তবতা হল এই যে, তিন যুগের (মোঘল, বৃটিশ আর পাকিস্তান) মধ্যে জুম্ম জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক যে অবস্থা ছিল, সেই অবস্থা থেকে তাদের উন্নতি হয়নি। বরঞ্চ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আমলে তাদের সার্বিক অবস্থার অবণতি হয়েছে মাত্র। এখনো শোষণ, নির্যাতন, ধর্ষণ, অপহরণ, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, বিতাড়ন অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি গত ২৬ আগষ্ট ২০০৩ মহালছড়িতে যে নৃশংস ঘটনা ঘটে গেল- জুম্ম জনগণের চার শতাধিক বাড়ীঘর, লুটপাট ও ভস্মীভূত করে দিল অবৈধ অভিবাসী বাঙালীরা, পার্বত্য চুক্তির পরও এরকম ঘটনা কিভাবে ঘটতে পারে বিশ্ববাসী তা বিস্ময়সহকারে প্রত্যক্ষ করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে মতবিনিময় প্রসঙ্গে আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির সভাপতি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সুশীল সমাজ এবং নেতৃবৃন্দ সাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে পর্যালোচনা ও মতবিনিময় হয়। সভার এক পর্যায়ে নেতৃবৃন্দ থেকে একটি সময়োপযোগী প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নটি এই- বিগত সরকার স্বয়ং পার্বত্য চুক্তি সম্পাদন করেও চুক্তি বাস্তবায়নে গড়িমসি করেছিলেন। বর্তমান সরকারও চুক্তি বাস্তবায়ন করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না। এরকম চলতে থাকলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন হবে কিভাবে?

এই প্রশ্ন সম্পর্কে পর্যালোচনা হয়, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয় অনেক। পার্বত্য চট্টগ্রামের অতীত ও বর্তমান এবং দেশের ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যে বাস্তবতা, সেই বাস্তবতাই দাবী করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন। বাংলাদেশ সরকারের উপলব্ধি করা উচিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হলেই বাংলাদেশে শান্তি আসবে। নতুবা নয়। বিদ্যমান বাস্তবতা দাবী করে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আপোষহীন ও অব্যাহত আন্দোলন। □

তথ্যসূত্রঃ ....

১. Greatest blunder of partition, Exerpt from all that glisters- by Mukur kanti khisa, year of publication- 1996.

২. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা- মঙ্গল কুমার চাকমা, ১০ নভেম্বর'৮৩ স্মরণে ২০০০, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

ঘুন্ডুসদের অনাক্রমণ চুক্তির প্রেক্ষাপট

কীটো

পার্বত্য চট্টগ্রামে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতির একটি ঐক্যের সনদ। এই সনদে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ত বাদ, আমলাপুঁজিবাদ, উগ্র ধর্মান্ধ ইসলামী সম্প্রসারণবাদের ধারক বাহক বাংলাদেশ সরকার অতীতে যেমনি কুঠারাঘাত করতে কোন দ্বিধা করেনি। আজো ঐতিহাসিক "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি" স্বাক্ষরের পরেও তার ব্যতিক্রম নয়। অতীতে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের দুলাগোষ্ঠীদের দিয়ে সুবিধাবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল ও দালাল সংগঠন- ট্রাইবেল কনভেনশন, রাজনৈতিক সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যার দোহাই দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন, ভাগ করে শাসন করো নীতি অনুসরণে- মারমা উন্নয়ন সংসদ, ত্রিপুরা উন্নয়ন সংসদ, বোম সোশ্যাল কাউন্সিল, মুরুং কমপ্লেক্স, সন্ত্রাসী সংগঠন মুখোশ বাহিনী, গপ্রক(গণ প্রতিরোধ কমিটি) ইত্যাদি গঠন করে জুম্ম জাতিকে ভাগ করে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিয়ে শাসন করতে চেয়েছিল। কিন্তু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং তার সুযোগ্য উত্তরসূরী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা(সন্তু)র যোগ্য নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকারের সমস্ত অপতৎপরতা ও হীন উদ্দেশ্য নস্যাৎ করে দিয়ে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর তারিখে বাংলাদেশ সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হন।

বাংলাদেশ সরকার হয়তো মনে করেছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের হাতে ধরা অস্ত্র জমা নিতে পারলেই জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে চালমাত করা সম্ভব হবে। অস্ত্র না থাকলে জনসংহতি সমিতি আর কিছুই করতে পারবে না। এটাই যদি কোন সরকার মনে মনে লালন-পালন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নিয়ে নানা তালবাহানা বা কালক্ষেপন করে ষড়যন্ত্রের পথে পা বাড়ায় তা হলে মস্ত বড় ভুল করা হবে। কারণ তদানীন্তন শেখ মুজিব সরকার সমস্ত উপজাতিকে রাঙ্গামাটির কোর্ট বিল্ডিং ময়দানে বাঙালী জাতিতে প্রমোশন দিয়ে যে ভুল করেছিলেন সেই ভুলের মাশুল সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে প্রতিটি ক্ষমতাসীন সরকারকে তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে শোধ করতে হয়েছিল। এর পরও কি বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদন করে তা দ্রুত এবং যথাযথ বাস্তবায়ন না করেই সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোন সুচতুর, বুদ্ধিমান সরকার জেনে শুনে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যার জন্য বিষপান করতে পারেনা। কারণ জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে অস্ত্র জমাদান করলেও আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন সরকারের কাছে জমা দেয়নি। জমা দেয়নি জনসংহতি সমিতির নীতি আদর্শ ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে। যেহেতু আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন জোরদার ও তীব্রতর করার লৌহকঠিন ঐক্যশক্তি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিটি সদস্যের অটুট রয়েছে। এই লৌহকঠিন ঐক্যশক্তিই জনসংহতি সমিতির প্রকৃত শক্তি। যে শক্তির পরিচালক স্বয়ং প্রগতিশীল নীতি আদর্শ। যে নীতি আদর্শ পৃথিবীর মধ্যে অপরাজেয়। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দ্রুত ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি হুমকি নয় বরং জনসংহতি সমিতি মধুরকণ্ঠে সবিনয়ে বাংলাদেশ সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দ্রুত এবং যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য বারংবার আবেদন নিবেদন করে আসছে।

অপরদিকে ১৯৮৩ সালের গৃহযুদ্ধ ছিল মূলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নীতি আদর্শ প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। একপক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল ও আপোষপন্থী চিন্তাধারা সম্পন্ন গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের নেতৃত্বাধীন বিভেদপন্থী চার কুচক্রী দল। অন্যদিকে প্রগতিশীল চিন্তাধারা সম্পন্ন বিপ্লবী কর্মীবাহিনী ও ব্যাপক জুম্ম জনগণ। নীতি আদর্শগত তফাতের কারণে গৃহযুদ্ধে হাজারবার প্রচেষ্টা চালিয়েও উভয়পক্ষকে একত্রিভূত করার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। কারণ তখনকার সময়ে এম. এন লারমা উভয় পক্ষকে "ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া"- নীতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী এবং যে কুকুরের লেজ বাঁকা হাজার বার চোঙায় ঢুকিয়ে রাখলেও লেজ বাঁকা হবার ন্যায় গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চার কুচক্রীরা অর্থ ও ক্ষমতার লোভে বাহ্যতঃ ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া নীতি মানলেও খুব সংগোপনে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে ১৯৮৩ সালে ১০ই নভেম্বরে গভীর রাতে জুম্ম জনগণের জাতীয় চেতনা ও জাগরণের অগ্রদূত, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে তাঁর একনিষ্ঠ আটজন সহযোগীসহ নৃশংসভাবে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করেনি।

যুগে যুগে আমরা দেখেছি বেঈমানী ও বিরোধীতা। গৌতম বুদ্ধের সময়ে দেখেছি দেবদত্তকে, নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে মীরজাফরের বিরোধীতা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেখেছি রাজাকার-আলবদরদের। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগনের সশস্ত্র আন্দোলনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বিরুদ্ধে চার কুচক্রী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিরোধীতা। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী ও চুক্তি বিরোধী প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের চরম বেঈমানী ও বিরোধীতা- যা জুম্ম জাতি কোন দিন ভুলে যেতে পারেনা, ক্ষমা করতে পারেনা।

জুম্ম জনগণের অবিসংবাদী নেতা এম. এন লারমা শহীদ হওয়ার পর শুরু হয় তুমুল গৃহযুদ্ধ। যে যাকে পায় সে তাকে রেহাই দেয়না। একজন সাধারণ ভলান্টিয়ার পর্যন্ত তখন প্রতিপক্ষের যে কাউকে মৃত্যুদন্ড দিতে পারতো। এক কথায় পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংহতি সমিতির অঘোষিত সামরিক শাসন চালু ছিল। বলাবাহুল্য একপক্ষ আরেক পক্ষকে সশস্ত্রভাবে উৎখাতের মধ্য দিয়ে গৃহযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

যে গৃহযুদ্ধের স্থায়িত্ব আন্তর্জাতিক রাজনীতিবিদেরা কমপক্ষে দশবছর ধরেছিলেন। জুম্ম জনগণের প্রাণপ্রিয় বিপ্লবী নেতা সন্তু

লারমার সুযোগ্য নেতৃত্বে ও পরিচালনায় সেই গৃহযুদ্ধ দু'বছরে শেষ হয়ে যায়। টনক নড়ে সারা বিশ্বে। চোখ পড়ে সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী পার্টি জনসংহতি সমিতির উপর। আরো সুদৃঢ় হয় জনসংহতি সমিতির ভিত্তি ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর চুক্তি বিরোধী প্রসিত-সঞ্চয় চক্র (ঘুভুস)দের সাথে চুক্তি পক্ষের বিরোধও ১৯৮৩ সালে গৃহযুদ্ধের কার্বন কপি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই চুক্তি পক্ষ-বিপক্ষের দ্বন্দ্ব বা বিরোধ আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাধা হতে পারেনা। কারণ এতে পক্ষ- বিপক্ষের মধ্যে নীতি আদর্শগত ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যগত ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। তাত্ত্বিক ভাষায় বলা যায়- একই নীতি আদর্শ ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যে বিশ্বাসীদের মাঝে যদি কর্ম সম্পাদনার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব বা বিরোধের সৃষ্টি হয় তাহলে সে দ্বন্দ্ব হল অবৈরী দ্বন্দ্ব। আর এই অবৈরী দ্বন্দ্বের বা বিরোধের সমাধান হতে পারে কেবলমাত্র আলাপ আলোচনা ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে। কিন্তু ভিন্ন নীতি আদর্শ ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পন্ন দুই বিপরীত শক্তির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ তা হচ্ছে- বৈরী দ্বন্দ্ব। আলাপ আলোচনা বা আত্মসমালোচনার মাধ্যমে বৈরী দ্বন্দ্বের সমাধান করা যায়না। বৈরী দ্বন্দ্বের বা বিরোধের সমাধান একমাত্র বল প্রয়োগের মাধ্যমে হতে পারে। এটাই গৃহযুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা- যা আমাদেরকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে। তার পরও অগণিত খেসারত স্বীকার করে জুম্ম জনগণের পক্ষে ঘুভুসদের সাথে (চুক্তিবিরোধী প্রসিত-সঞ্চয় চক্র) অনাক্রমণ চুক্তি করতে হয়েছিল খাগড়াছড়ির অনন্ত বিহারী খীসার বাড়ীতে। যার প্রধান মধ্যস্থতাকারী ছিলেন বাবু উপেন্দ্র লাল চাকমা, প্রাক্তন এমপি। চুক্তি বিরোধী প্রসিত-সঞ্চয় গ্রুপের পক্ষে নেতৃত্ব দেয় দীপ্তি শংকর চাকমা। জেএসএস যেহেতু তিন পার্বত্য জেলায় জুম্ম জনগণের নেতৃত্ব দেয় সেহেতু চুক্তি পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন বাবু তাতিন্দ্র লাল চাকমা। অনাক্রমণ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ২০/০২/২০০০ইং রোজ রবিবার বেলা ১১ টায়। উপেন্দ্র লাল চাকমা, অনন্ত বিহারী খীসা, নিপুল কান্তি চাকমা ও চঞ্চুমনি চাকমা নামে চারজন পর্যবেক্ষক হিসেবে চুক্তি সম্পাদনকালীন উপস্থিত ছিলেন। এ চুক্তিতে তিনটি বিষয় প্রাধান্য লাভ করে। তা হল - ১) যারা অপহৃত হয়েছেন তাদের উদ্ধারকল্পে উভয় পক্ষ পারস্পারিক সহযোগিতা প্রদান করা; ২) উভয় পক্ষ চলাফেরাকালীন কোন প্রকার বাধা, ধর-পাকড় না করা এবং মিটিং মিছিলে কোন প্রকার বাধা প্রদান না করা; ৩) যোগাযোগের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আলোচনায় বসার দিন, তারিখ ও স্থান ঠিক করা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ এবং ক্ষোভের সাথে বলতে হয় যে, চুক্তি বিরোধী বেঈমান প্রসিত-সঞ্চয় নামধারী নব্য চক্ররা অনাক্রমণ চুক্তির একটি দিন অতিক্রম করতে না করতেই মহালছড়ি থানার বাসিন্দা সুখেন্দু বিকাশ চাকমাকে ২১/০২/২০০০ইং সোমবার রাত্রেই প্রকৃতির ডাকে বাড়ীর বাইরে গেলে গুলি করে হত্যা করেই অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করেছে। আরো একটি অন্তরভরা বেদনা ও ক্ষোভ প্রকাশ না করলে বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যাবে। তা হল- আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে যে সকল জুম্ম বীর যোদ্ধারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েও নিজের জীবন বাঁচিয়ে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন সেই জুম্ম বীর যোদ্ধাদের প্রাণ বলি দিতে হয়েছে স্বজাতির নব্য চক্র, চুক্তি বিরোধী প্রসিত-সঞ্চয় সন্ত্রাসীদের হাতে। যারা পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের ধোঁয়া তুলে আন্দোলনের হাকডাক ছেড়েছে তারা জুম্ম জাতীয় বীর যোদ্ধাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সামনে বাড়ীতে হত্যা করে বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছে। অথচ অদ্যাবধি সেনা ও সেটেলারদের চামড়ায় আঁচড় পর্যন্ত দিতে পারেনি। একথা ভেবে আত্মজিজ্ঞাসা করে চরম লজ্জিত হওয়ার বদলে বরং নির্লজ্জভাবে বীরদর্পে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের মুখোশ পড়ে জেএসএস সদস্যদের ও চুক্তি পক্ষের ব্যাপক সংগ্রামী জনগণকে নির্বিচারে হত্যা ও নিপীড়ন করে চলেছে। এর পাল্টা জবাব কি সংগ্রামী জনগণ দেবেনা? অবশ্যই একদিন দেবে। চুক্তি পক্ষের ব্যাপক সংগ্রামী জনগণের নিকট হতে তাড়া খেয়ে চুক্তি বিরোধী ও সন্ত্রাসী প্রসিত-সঞ্চয় চক্রদের বাবুছড়া, লক্ষীছড়ি, মাজলং, গিরিফুল ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়ে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পকেটে ঢুকবেনা। পূর্ণস্বায়ত্তশাসন পেতে হলে বাংলাদেশ সরকারের সাথে লড়াই সংগ্রাম করে আদায় করতে হবে। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের মুখোশ পড়ে ব্যবসায়ী, ধনশালী আর. চাকুরীজীবিদেরকে অপহরণ করে নিয়ে সাধ্যাতীত মুক্তিপণ আদায় করা। আদায়কৃত টাকা দিয়ে চোরা লাইনে অস্ত্র ও গোলা-বারুদ কিনে চুক্তিপক্ষের লোকজন ও জেএসএস সদস্যদের হত্যা করে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করাই কি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন? যদি তাই হয় তাহলে সেটা সন্ত্রাসী দালালীপনা ছাড়া আর কি হতে পারে। তাছাড়া পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদানকারী সন্তু লারমা বা জনসংহতি সমিতি নয়, স্বয়ং বাংলাদেশ সরকার। তারপরেও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সাথে সশস্ত্র লড়াই সংগ্রাম না করে সন্তু লারমা বা জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী ও চুক্তি বিরোধী প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের সশস্ত্র লড়াই সংগ্রাম কেন? উত্তরে এককথায় বলা যায়- বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ একটি মহলের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে সন্ত্রাসবাদী দালালীপনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণ তাদের প্রত্যাখান করেছেন, মুখ ঘুরিয়ে বসেছেন। তার পরেও কি সমঝোতা? তার পরেও কি অনাক্রমণ চুক্তি? সমঝোতা আর অনাক্রমণ চুক্তি যাই বলুন না কেন আত্মরক্ষার একটা কবচ গলায় ঝুলিয়ে ফেললেও জনগণের কাছে কোণঠাসা হয় এবং যখন অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে তখন ঘুভুসরা আত্মরক্ষার কবচ হিসেবে 'সমঝোতা বা অনাক্রমণ চুক্তি" করতে সম্মত হয়। চুক্তিবদ্ধ হয়ে নিরিবিলি করে বিশ্রাম নিয়ে যখন শক্তি সঞ্চয় হয় তখন আবার সমঝোতা বা অনাক্রমণ নামক কবচটি লুকিয়ে রেখে চুক্তি পক্ষের ব্যাপক জনগণ ও কর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধ্বংস করতে চায়। এভাবে চলে আসছে ঘুভুসদের লড়াইয়ের কলাকৌশল। এক- 'ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া" নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে জুম্ম জনগণের অবিসংবাদিত ও প্রাণপ্রিয় বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে ১৯৮৩ সালে ১০ই নভেম্বরে হারাতে হয়েছে। দ্বিতীয়বারও কি সমঝোতা বা অনাক্রমণ চুক্তি করে বর্তমান আপোষহীন সংগ্রামী মহান নেতা সন্তু লারমাকে হারাতে যাবো? না তা কখনো হতেই পারেনা। তাই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে এবারের ১০ই নভেম্বর উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছে- আর নয় কালক্ষেপন, সর্বত্র গড়ে তুলুন চুক্তি বিরোধী নির্মূলীকরণের অভিযান।□

প্রসিত-সঞ্চয়-রবি শংকর-কবিতা চক্রের শত্রু মিত্র চিহ্নিতকরণের নীতি

লক্ষী প্রসাদ চাকমা অনীক

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু তাঁর 'বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গে' বই-এ লিখেছেন যে, 'সকলবাদের পেছনে একটি বাদ থাকে- তাহলো সুবিধাবাদ।' দুনিয়ায় যে যে দেশে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে, সেসব দেশের আন্দোলনকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোন না কোন দল অথবা একই দলের অভ্যন্তরে একটি অংশ আন্দোলনের মূলধারা থেকে সরে গিয়ে সুবিধাবাদের কোলে আশ্রয় নেয়। আদর্শ থেকে সরে আসে। তাদের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়ে উঠে আপোষ করা, স্বার্থ আদায় করা এবং যেন তেন করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া এবং এজন্যে তারা দেশী বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিবিপ্লবী অপশক্তির ষড়যন্ত্রের হাতিয়ারে পরিণত হয়। ফলে পার্টির অভ্যন্তরে জন্ম নেয় ভাঙ্গন ও বিভক্তি এবং কোন কোন সময় তা রূপ নেয় ভয়াবহ আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে। পার্টির নেতা, কর্মী এমনকি সাধারণ জনগণ পর্যন্ত এই গৃহযুদ্ধের শিকারে পরিণত হয় এবং অপ্রয়োজনীয় প্রাণহানি ঘটে। অন্য কোন বিদেশী ইতিহাস নয়, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনের ইতিহাসই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতির বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। জুম্ম জাতীয় ও জন্মভূমির অস্তিত্ব যখন চরম সংকটে ও হুমকীর মুখোমুখী তখনই জুম্ম জনগণ তাদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে একমাত্র রাজনৈতিক পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন করে। এই রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্বেই অস্তিত্ব রক্ষার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক দলগুলোর অদুরদর্শিতা ও সরকারগুলোর ভ্রান্ত নীতি নির্ধারণের কারণেই জনসংহতি সমিতির নেতা ও নেতৃত্বকে সশস্ত্র আন্দোলনের পথে ঠেলে দেয়। যা আজ অবধি একই পথ ও নীতি অনুসরণ করে যাচ্ছে প্রতিটি সরকার। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে বাঁকে বাঁকে দেখা দেয় ষড়যন্ত্রের পাঁয়তারা এবং এর পেছনে মদদ যোগায় দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিবিপ্লবী অপশক্তি। এই অপশক্তি জনসংহতি সমিতির অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা একটি সুবিধাবাদী অংশের কাঁধের উপর ভর করে। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ গৃহযুদ্ধের নায়ক 'গিরি-দেবেন-পলাশ-প্রকাশ' চক্র। মুখে বিপ্লবী বুলি কাজে সুবিধাবাদী মানসিকতা। তারা আন্দোলনের সুষ্ঠ ও সাবলীল গতিধারা উপেক্ষা করে ও পাশ কাটিয়ে সোজা পথের আওয়াজ তুলে ও দ্রুত নিষ্পত্তির তত্ত্ব হাজির করে কর্মী ও জনগণকে বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে নিয়ে যায়। অন্যদিকে এই আওয়াজ দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের 'গ্রীন সিগন্যাল' দেয়ার মতো কাজ করে। কোন এক কুক্ষণে এই দুই প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিবিপ্লবী অপশক্তির মধ্যে মিলন ও আঁতাত হতে বিলম্ব হয়নি। তারপর শুরু হয় আন্দোলন ধ্বংসের কাজ। সন্দেহ নেই এই প্রতিবিপ্লবী ধ্বংসযজ্ঞ আন্দোলনের ও আন্দোলনকারীদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র, এই ধ্বংসযজ্ঞ প্রতিবিপ্লবী সুবিধাবাদী ও দেশী বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল অপশক্তিকেও ছাড়ে না। পরবর্তীতে তাদেরও বিভিন্নভাবে নাজেহাল হতে হয়েছে এবং তা বুমেরাং হয়ে তাদের উপর আঘাত হেনেছে। যার জন্যে গোটা দেশ, জাতি ও সমাজকে চরম মূল্য দিতে হয়। এরকম উদাহরণ দুনিয়ায় অভাব নেই। আমাদের এই উপমহাদেশে ঘটে যাওয়া এমন উদাহরণ ভূড়ি ভূড়ি রয়েছে। কিন্তু দুঃখের কথা, এই বাস্তবতা থেকে আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা তা আমলে আনে না। আমরা ইতিহাস পড়ি, কিন্তু ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে চাই না। ইতিহাস পড়েও আত্মপ্রবঞ্চনা করি, দেশ-জাতি-সমাজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করি। ১৯৮৩ সালের গৃহযুদ্ধের ইতিহাস থেকে বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক, স্বার্থান্বেষী ও ক্ষমতার উচ্চাভিলাষী 'প্রসিত-সঞ্চয়-রবিশংকর-কবিতা চক্র'ও শিক্ষা গ্রহণে অপরাগতায় তাদেরকে আবার বিপথগামী করে।

চুক্তির আগে সশস্ত্র আন্দোলনের সাথে সংগতি রেখে তারই পাশাপাশি ব্যাপক জনগণকে সুসংগঠিত করে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত পার্টির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে গৃহীত হয়। ফলশ্রুতিতে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন এর জন্ম নেয়। এই সংগঠনসমূহের কর্ম তৎপরতায় আন্দোলনে একটা নূতন মাত্রা যুক্ত হয়। তবে সেটা একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত। এই সংগঠনসমূহের শিশু নেতৃত্বের কাঁধে সুবিধাবাদী ভূত চেপে বসে। আন্দোলনের চাপে পড়ে সরকার যে মুহূর্তে অবহেলিত, বঞ্চিত ও শোষিত জুম্মদের একটা চুক্তির মাধ্যমে অধিকার দিতে সম্মত হয় ঠিক তখনই গিরি-দেবেন-পলাশ-প্রকাশ চক্রের নব্য সংস্করণ প্রসিত-সঞ্চয়-রবিশংকর-কবিতা চক্র নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তারা চুক্তি মানে না, তারা পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন চায়। এজন্যে তারা আবারো সশস্ত্র সংগ্রাম করবে ইত্যাদি ইত্যাদি কথার ফুলঝুরি ছড়ায়। একেই বলে'বুলিতে বিপ্লবী'। এতই যদি যুদ্ধ করে আরো বেশী অধিকার পেতে চাওয়া তাহলে তখন কথা দিয়েও অস্ত্র ধরতে যাওয়া হয়নি কেন? (এখন তাদের ভাঙ্গা ভাঙ্গা হাতিয়ার খোঁজার প্রয়োজন হতো না।) 'ভাঙ্গা নৌকোয় কে চড়বে?' আহ কি সুন্দর জবাব! ২৬ বছরের দীর্ঘ প্রতিকুল সময় ধরে পাড়ি দিতে নৌকো ভাঙ্গা ভাঙ্গা হওয়াই তো স্বাভাবিক। ভাঙ্গা নৌকোকে মেরামত করে অকুল সমুদ্রের ঢেউ ভেঙ্গে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে যারা পারে তারাই তো বিপ্লবী। তাই বলি- ভাঙ্গা নৌকোয় চড়তে বিপ্লবীদের ভয় কিসের? জনগণের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা ভাল কাজ। এজন্যে জনগণ চিরদিন তাদের স্মরণ করবে। জুম্ম ইতিহাসে তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে। বলি- ওহে বিপ্লবীরা, তা জনগণের মাঝে সশস্ত্র আন্দোলন না করে বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম আর রাজধানী

ঢাকায় বসে থাকা কেন? এ কোন ধরণের আন্দোলন? জনসংহতি সমিতি ব্যাপক জনগণকে নিয়ে চব্বিশ বছর সশস্ত্র আন্দোলন করেছে এবং চুক্তির মাধ্যমে অধিকার আদায় করেছে। তা এতই যদি সশস্ত্র আন্দোলনের খায়েস হয়, তাহলে লেজুরবৃত্তি না করে একটু যুদ্ধ করে দেখো না চব্বিশ মাসও টিকে থাকতো পারো কি-না। সশস্ত্র আন্দোলন পান্তা ভাত খাওয়া নয়, ছেলের হাতের মোয়া নয় চাইলেই পাওয়া যাবে। সরকারের কোলে বসে, রাজধানীর বিলাসী জীবন চর্চায় বড় বড় বুলি আউড়ানো সহজ, সরলমনা ও পরিচ্ছন্ন সাদা কাগজের মতো ছাত্র ও যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করা সহজ, সশস্ত্র হামলার মুখে ঠেলে দেওয়া সহজ, কিন্তু সশস্ত্র আন্দোলন করা, আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া এই সুবিধাবাদী বুলিতে বিপ্লবীদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের পরিচয় আসলে তারা আপোষপন্থী, তারা ষড়যন্ত্রকারী, তারা স্বার্থান্বেষী, তারা ক্ষমতালিপ্সু, তারা মুখোশধারী বিপ্লবী, তারা চরম সুবিধাবাদী। তারা এখন দেশী-বিদেশী অপশক্তির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। তাই আজ তাদের সকল কাজের একটাই লক্ষ্য- জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে খতম করা, জনসংহতি সমিতির কর্মীদের খতম করা। তাদের এই 'জেএসএস খতম লাইন' আজ আমাকে অনেক পুরনো কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

'৭৫-এ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কয়েক মাস আগে কর্মী সম্মেলনে দেবেন এমন বক্তব্য উপস্থাপন করে যে, তার রাজনৈতিক জ্ঞানের গভীরতায় কতটা চর জমেছে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেদিন অবশ্য প্রয়াত নেতা এম এন লারমা আন্দোলনের শত্রু মিত্র চিহ্নিতকরণ বিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় তত্ত্ব, তথ্য ও উপাত্তসহ দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। কথায় বলে, 'চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী।' সেদিনের সেই তাত্ত্বিক বক্তব্য যদি গিরি-দেবেন-পলাশ-প্রকাশ চক্র হৃদয়াঙ্গম করতে পারতো তাহলে তারা কখনো পার্টির অভ্যন্তরে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে পার্টিতে বিভেদ সৃষ্টি করতো না, শত শত কর্মীর জীবন নিয়ে ছেলে খেলা খেলতো না। বেদনাদায়ক ১০ নভেম্বরের ঘটনাও ঘটতো না।

আজ ক্ষোভের সাথে বলতে হয়, ওহে গিরি-দেবেন-পলাশ-প্রকাশ চক্রের প্রেতাত্মা প্রসিত-সঞ্চয়-কবিতা চক্র তোমাদের কি এখনো হুশ হয় নাই? কারা তোমাদের বন্ধু, কারা তোমাদের শত্রু- তা কি এখনো বুঝতে শেখো নাই? বোধ করি তাই। তা না হলে তোমাদের একজন লাঠিয়াল নেতা ডাকা মিটিংএ জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করে- ক্যাম্পের কাছাকাছি তোমাদের অবস্থান, ক্যাম্পে উঠাবসা ও একসাথে খেলাধূলা করলে কিভাবে তোমরা পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন কায়েম করবে? জবাবে লাঠিয়াল নেতা বলেছিলো যে, জেএসএস খতম না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থান, এ চলাফেরা, এ উঠাবসা চলতে থাকবে। সত্যি তাদের এই নীতির শিকার হচ্ছে জেএসএস নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা। তাদেরই একজন শহীদ স্বাধীন। শহীদ স্বাধীন তো তোমাদের শত্রু ছিলো না। শহীদ স্বাধীন গ্রামের একজন অর্ধশিক্ষিত যুবক। ৭১'র স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জন্ম হয় বলে মা বাবা স্বাধীনতার মর্মবাণী অক্ষয় করে রাখতে ছেলের নাম রেখেছিলো 'স্বাধীন'। কালক্রমে বড় হয়ে সে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের স্বাধিকার আন্দোলনে শরীক হয়। সে সেলাই বিভাগে কাজ করতো। চুক্তির আওতায় প্রত্যাবর্তন করলে লোগাংএ সংসার পাতে। তার ছোট সংসার। এই ছোট সংসারে একটি মাত্র ফুটফুটে মেয়ে। মেয়ের মুখে তখনো কথা ফুটে নাই। আধো আধো বোল 'মা' 'বাবা' ডাকতে জানে। এই 'মা' 'বাবা' ডাক শুনার মধ্যেই মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের স্বার্থকতা। কিন্তু নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! মেয়ের 'বাবা' 'বাবা' ডাকার জন্যই স্বাধীনকে প্রসিত-সঞ্চয়-কবিতা চক্রের হাতে প্রাণ হারাতে হলো। সেই সাথে তার মেয়েকে হারাতে হয় সারাজীবনের জন্য বাবা ডাকার জন্মগত অধিকার। বাপ ও মেয়ের এই বিয়োগান্তক নাটকের অবসান হয় এভাবে-

একদিন সকালে স্বাধীনের গ্রাম প্রসিত-সঞ্চয়-রবি শংকর-কবিতা চক্র ঘেরাও করে। তখন স্বাধীনের স্ত্রী বাড়ীর বাইরে কাজে ছিলো। স্বাধীন প্রাণ বাঁচাতে বাড়ীর ছাদের উপরে উঠে লুকিয়ে থাকে। শিশু মেয়েটি নীচে একা কাঁদতে থাকে। কেঁদে 'বাবা' 'বাবা' বলে ডাকছিলো আর ছাদের দিকে তাকাচ্ছিলো। খুনীদের বুঝতে আর কষ্ট হয়নি যে, স্বাধীন ছাদের উপরে লুকিয়ে রয়েছে। তখন ছাদের উপর থেকে স্বাধীনকে নীচে নামিয়ে সেই নিষ্পাপ অবোধ শিশুর সামনেই প্রচন্ড মারধোর করা হয় এবং তার বাড়ীর উঠানে তারই মেয়ের সামনে তারা তাকে গুলী করে হত্যা করে। স্বাধীনের এই মৃত্যুর সাথে সাথে মৃত্যু হয় তার মেয়ের 'বাবা' ডাকার জন্মগত অধিকার। এই পিতৃহারা মেয়ে আর কোনদিন তার বাবাকে 'বাবা' বলে ডাকতে পাবে না। এই হলো- প্রসিত-সঞ্চয়-রবি শংকর-কবিতা চক্র এর 'শত্রু মিত্র চিহ্নিতকরণের নীতি'র চরম হঠকারিতার বহিঃপ্রকাশ। এভাবে ছয় বছরের মধ্যে আরও অর্ধশতাধিক জনসংহতি সমিতির সদস্যকে চুক্তিবিরোধী প্রসিত-সঞ্চয়-রবি শংকর-কবিতা চক্র এর সন্ত্রাসীদের হাতে জীবন দিতে হয়।

যারা ২৪ বছর আন্দোলনের আগুনে পোড় খেয়ে নিজেদের বিপ্লবী যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তুলেছে প্রসিত-সঞ্চয়-রবি শংকর-কবিতা চক্র এর কাছে তারা শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে আর যাদের (শাসকগোষ্ঠী) কাছে চক্ররা তথাকথিত পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবী করছে সেই শাসকগোষ্ঠী এখন তাদের মিত্র। তোমরা মনে রেখো রাজনৈতিক বেশ্যাবৃত্তি করে দালাল হওয়া যায়, সুবিধা আদায় করা যায় কিন্তু অধিকার আদায় করা যায় না। তথাকথিত পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন পাওয়ার আশা মরীচিকা মাত্র। বিগত ছয় বছর সময়ে তোমাদের কার্যকলাপ তাই প্রমাণ করে। বন্দুক কাঁধে নিয়ে চাঁদাবাজি করা যায়, জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীদের হত্যা করা যায় বটে, একজন সাচ্চা বিপ্লবী হওয়া যায় না। সুবিধাবাদী চরিত্র নিয়ে অধিকার আদায় করা যায় না। পরিণতিতে সুবিধাবাদীরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শাসকগোষ্ঠীর কোলে ঠাঁই নেয়- অতীতের বিপ্লবী ইতিহাস তাই বলে।□

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি আহত, পাহাড়ীরা অসহায়

ল্যরা চাকমা শাকুরা

পার্বত্য চট্টগ্রাম আবারও অশান্ত। সারা দুনিয়ার সভ্য মানুষ তা জানে। এই অশান্তির কারন মূলতঃ সেটেলারদের অনুপ্রবেশ ও জুম্মদের ভূমি বেদখল। এবং বাংলাদেশ সরকারের সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় বাঙালী সেটেলারদের কর্তৃক জুম্ম নিধন, জুম্ম নারীদের জোরপূর্বক ধর্ষণ, বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক অবকাঠামো ভেঙে দেয়া। মারাত্মক ক্ষতির শিকার হচ্ছে জুম্মরা। জুম্মদের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। পড়ছে সামাজিক ও জাতীয় জীবনে নেতিবাচক প্রভাব।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পেরিয়ে গেল। অথচ আজও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আশানুরূপ কোন ফল পাওয়া গেল না। বিগত সরকার তো বিশ্বাসঘাতকতা করেই নীরবে চলে গেল। আর বর্তমান সরকার? বিরোধী দলে থাকাকালীন সময়ে এই চুক্তিকে কালোচুক্তি বলে আখ্যায়িত করেছে। তারা এ চুক্তি বাস্তবায়ন করবে বলে কতটুকু আশা করা যায়?

প্রায় দু'যুগ ধরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। পার্বত্যবাসী প্রত্যাশা করেছিল শ্যামল শীতল শান্তির ছায়া। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারবে বঞ্চিত মানুষ। মুখরিত হবে চারদিক পাখীর কলকাকলীতে। ফসল ভরে উঠবে মাঠে মাঠে। মাঠের ফসল আন্দোলিত হবে দখিণা বাতাসে। ঘরে ঘরে হবে স্বপ্নের গোলাভরা ধান ও গোয়াল ভরা গরু। ফুটে উঠবে প্রতিটি মানুষের মুখে আশাদীপ্ত হাসি। কিন্তু সেই আকুল প্রত্যাশা জুম্মদের কাছে স্বপ্নাতীত হয়ে রইল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পেরিয়ে গেল। অথচ আজও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আশানুরূপ কোন ফল পাওয়া গেল না। বিগত সরকার তো বিশ্বাসঘাতকতা করেই নীরবে চলে গেল। আর বর্তমান সরকার? বিরোধী দলে থাকাকালীন সময়ে এই চুক্তিকে কালোচুক্তি বলে আখ্যায়িত করেছে। তারা এ চুক্তি বাস্তবায়ন করবে বলে কতটুকু আশা করা যায়? ক্ষমতায় আসার পর পরই বুঝা গেছে জনগণের সমস্যা নিয়ে কতটুক ভাবছেন বা আদৌ ভাবছেন কি-না।

উগ্র সাম্প্রদায়িক সেটেলার নেতা আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড চেয়ারম্যান পদ দখল করে একের পর এক অঘটন ঘটিয়ে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের নামে সেটেলারদের উন্নয়ন করছে। কখনো প্রকাশ্যে, কখনো লুকিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে অনুপ্রবেশ চলছে অনবরত। তাদের সেটেল করার কাজও হচ্ছে। মোট কথা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ চতুর্দিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, গতবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে যেসব নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাতে জুম্মরা জমি-জমা সম্পত্তি বিক্রয় করে জাতীয় কুলাঙ্গার নক্ষত্রলাল দেব বর্মণকে ঘুষ দিতে গিয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারন লাখ টাকার বিনিময় ছাড়া চাকুরী পাওয়া যায় না। আর এই লাখ টাকা যোগাড় করা উদ্বাস্তু জুম্মদের মধ্যে কজনেরই বা সামর্থ রয়েছে? তবু চাকুরী করতে হবে। তাই যার যা সম্বল সামান্য জমিজমা যা কিছু আছে তা বন্ধক দিয়ে কিংবা বিক্রি করে চাকুরী কিনতে হয়েছে। আর এতে লাভবান হয়েছে প্রধানত বাঙালীরা। এদের কাছে জমি বন্ধক হয়ে যাওয়ায় তারা স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে। তাছাড়া ২৬ আগস্ট মহালছড়িতে যে মর্মান্তিক ধ্বংসলীলা ঘটে গেল তা সত্যিই বর্বর ও অমানবিক। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে তা কি বিশ্বাসযোগ্য? তবু প্রতিনিয়ত ঘটছে, ঘটে চলেছে, ভবিষ্যতে ঘটবে। তাহলে কি পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশ আরও উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে? অতীতের সেই গা শিউরে উঠা ভয়াবহ দিনগুলো ফিরে আসছে? এটা কি বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্য? তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ আজ মারাত্মকভাবে আশাহত। পুনর্বার অতীতের সেই সশস্ত্র জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতিনিয়ত এরূপ ঘটনা ঘটতে থাকলে হয় তো সেসব দিন ফিরে আসতে বেশী দেরী নেই।

আজ ১০ নভেম্বর। সমগ্র জুম্ম জাতি শোকাহত। ১০ নভেম্বরের শহীদদের আত্মাহুতি কি বৃথা যাবে? এমএন লারমার আদর্শ কি ধুলোয় লুটাবে? কখনোই নয়। তাই আসুন, এই শোকাবহ দিনে একত্রিত হয়ে মহান নেতার আদর্শের আলোকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।□

গৃহযুদ্ধের কথা ও আজকের ইউপিডিএফ

ডাঃ সুজিত

আমার প্রয়াত মা সংযুক্তা চাকমা লারমা গোজার(গোষ্ঠী) মেয়ে হওয়াতে শৈশবে খাগড়াছড়ির খবংপুরিয়াতে আমার মামার বাড়ীতে থেকে ঐ স্কুলে লেখাপড়া করার সুযোগ হয়েছিল। স্কুলটা ছিল তাদের বাড়ীর একদম লাগোয়া। সেই সুবাদে তাদের পরিবারের সাথে ঘনিষ্টভাবে মিশবার একটা সুযোগ হয়েছিল। সুভাষিণীর কাকা প্রয়াত বিমল চন্দ্র দেওয়ান এবং সুরেন্দ্র লাল চাকমা আমার আদি গুরুদেব। তাঁরা দুজনেই শিক্ষকতার জন্য সরকারের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। আমি আমার এই গুরুদেবদের এখনও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। আমিও ঐ স্কুলের একজন জেনারেল বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলাম। তখনকার দিনে জেনারেল বৃত্তি মাসিক ৫টাকা, সেমি-জেনারেল বৃত্তি মাসিক ২টাকা এবং ক্লাসের ফি ফ্রি।

প্রাসঙ্গিক না হলেও উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, তখনকার দিনে রাজাকে ৫ টাকা নজরানা দিয়ে পদবী বা গোজা-গোষ্ঠী পরিবর্তন করা যায়। বোরবোয়া গোজারা নাকি বাৎসরিক ৬ টাকা রাজার খাজনা মওকুফ পেতেন। সেই ৬ টাকা খাজনা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য অনেক বাজে গোজাও বোরবোয়া গোজাতে ঢুকে গেছেন। রাজারাও হয়তো রাজা থেকে রায় উপাধি গ্রহণ করেছেন। ইন্দুমতি খীসার ভাই মুরতি মোহন খীসা তখনকার সময়ে একজন উচ্চ শিক্ষিত, তখনকার সময়ে নরমাল স্কুল পাশ; লম্বা-চওড়া, টকটকে লাল, বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী এবং খুব রাগী। তাকে চোখে চোখে দেখতেও ভয় লাগতো। তিনিই রাঙামাটিতে গুরু ট্রেনিং স্কুলের প্রধান ছিলেন। নাটকের দল করতেন আর মদের নেশায় বিভোর থাকতেন। আমি নিজেই শুনতাম এবং দেখতাম তিনি নেশা করে বাড়ী ফিরতেন আর সুভাষিণীদের পরিবারদের উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে বলতেন, তোরা ৫টাকার দেওয়ান, আমাদের পুর্ব পুরুষরা খীসা ছিল আর তোমরা কবে দেওয়ান হলে, তোমরা ৫ টাকা দিয়ে দেওয়ান কিনেছো- এইভাবে নানা আক্রমণাত্মক বাক্যবাণ ছুঁড়ে দিতেন। আমার কথা হচ্ছে- কোন এক সময় তারাও খীসা কিনেননি তারও বা কি প্রমাণ আছে? সে যাই হোক, টাকা দিয়ে গোজা-গোষ্ঠী বা পদবী বদলী করার রেওয়াজ তখন ছিল। তাই খীসা থেকে দেওয়ান টাকা দিয়ে বদল করা হলেও অন্যায় তো কিছু হয়নি।

ভাগ্যক্রমে সুভাষিণী দেওয়ানের বিয়ে হয় মহাপ্রুম নামক স্থানে উচ্চ শিক্ষিত, সমাজ সংস্কারক, ধার্মিক, ভদ্র, নম্র, বিনয়ী ও প্রগতিশীল পরিবারে প্রয়াত চানমনি লারমার তৃতীয় পুত্র প্রয়াত চিত্ত কিশোর লারমার সাথে। চিত্ত কিশোর লারমা ছিলেন মহাপ্রুম জুনিয়র হাই স্কুলের নিবেদিতপ্রাণ প্রধান শিক্ষক। মহাপ্রুম সে সময় জুম্মদের শিক্ষা বিস্তারে পীঠস্থান হিসেবে স্বীকৃত। অপরদিকে ইন্দুমতি খীসার বিয়ে হয় মুবাছড়িস্থ খুলারাম মহাজনের প্রথম পুত্র খগেন্দ্র খীসার সাথে। খুলারাম মহাজন ছিলেন সেই সময়ের ধনী কৃষক এবং সামন্ততন্ত্রের ধারক বাহকদের একজন। যুগে যুগে ভালোর সঙ্গে মন্দের, প্রগতির সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীলতার পারস্পরিক বিপরীত অবস্থান। আমাদের সংগ্রাম সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে। আমার আশ্চর্য্য লাগে, অনন্ত বিহারী খীসাকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি সাড়া দেননি। তার ছেলে প্রসিত বিকাশ খীসাকেও একই অনুরোধ করা হয়েছিল। নয় মাস পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে যুদ্ধ করে ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন আমরা দেখেছি। যুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশের নির্বাচনে শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে গণ জোয়ারের সেই সময়ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এম এন লারমার ডাকে সাড়া দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর জনসাধারণ মুজিব সাহেবের নৌকা চেঙ্গী, মাইনী, কাচালং, শঙ্খ, মাতামুহুরীর অতল পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে মুজিবশাহীকে হতবাক করে দিয়েছেন। তখনই শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষদের আর দমিয়ে রাখা যাবেনা। এম এন লারমা সংসদে গেলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবী নিয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্য শেখ মুজিবর রহমান সাহেব এম এন লারমার দাবী শুধু প্রত্যাখ্যান করেননি, অধিকন্তু হুমকি দিয়ে বললেন, দেখ লারমা বেশী বাড়াবাড়ি করবেনা, তুমি বাংলাদেশের রাজনীতির মূল স্রোতে মিশে যাও। বাংলাদেশে যারা বাস করবে তারা সবাই বাঙালী। এই কথা এম এন লারমা মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু শেখ মুজিবর রহমান সাহেব ভুলে গেছেন যে, জাতীয় সংসদ

নির্বাচনে পাঁচ লাখ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ নদী-নালায় তাঁর নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছেন।

আমি সেই সময় সিলেট মেডিক্যাল কলেজে চাকুরী করতাম। আমার ডিউটি থাকতো অপারেশন থিয়েটারে। এম এন লারমা যা বলতেন জাতীয় দৈনিকে তার বক্তব্য ফলাও করে প্রকাশ করা হতো। সে সময় উক্ত মেডিক্যাল কলেজে ড. মোহাম্মদ আলী ই.এন.টি এসোসিয়েট প্রফেসর। বাড়ী চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানায়, সে জন্য তিনি আমাকে 'দেশী' বলে সম্বোধন করতেন। যখন অপারেশন আরম্ভ করতেন আমাকে বলতেন, দেশী আঁরার লারমা কালিয়ে সংসদত কি কইয়ে দেক্কন না? তিনি 'আমাদের লারমা' ছাড়া কথা বলতেন না। অন্যান্য প্রফেসররা তাঁকে মস্করা করে বলতেন, চট্টগ্রামের মানুষতো, সেও পাহাড়ী। তাতে বোঝা যায় প্রগতিশীল বাঙালীরাও আমাদের ন্যায্য দাবী এক বাক্যে সমর্থন করেন।

এম এন লারমা সংসদ থেকে ফিরে এসে শেখ মুজিবর রহমান সাহেবের দাম্ভিক, জাত্যাভিমানী ও একগুঁয়ে মনোভাবের কথা জনগণকে জানালেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আমাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার আদায় করা সম্ভব নয়। বন্দুকের নল হতে রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে-এই শ্লোগানকে সামনে রেখে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দিলেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট শেখ মুজিবর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে আরও বেশী ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, ধরপাকড়, জেল-জুলুম, সমতল ভূমি থেকে হাজার হাজার বাঙালী অনুপ্রবেশ, জুম্মদের জায়গা-জমি, ভিটেমাটি বেদখল, উচ্ছেদ ইত্যাদি পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক গুণ বেড়ে গেল। এদিকে জুম্মরাও বসে নেই। ১৯৭৬ সালের ১৮ জুন রেংখ্যং-এ তক্তানালা নামক স্থানের বিডিআর ক্যাম্প আক্রমণ করে শত্রুর বিরুদ্ধে জুম্মদের বন্দুক প্রথম গর্জে উঠেছিল। এই যুদ্ধে আমিও অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেই থেকে একটানা যুদ্ধ করে শত্রুকে কোনঠাসা করে রেখেছিলাম রেংখ্যং, বিলাইছড়ি, সুবলং, বরকল-হরিণা পর্যন্ত। অর্থাৎ রেংখ্যং ও কর্ণফুলীর দক্ষিণ অংশে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছিল। বিলাইছড়ির ধুপশীল ডাকবাংলো থেকে শত্রুবাহিনীকে বিতাড়িত করে ঐ ডাক বাংলোতে আমাদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছিলাম। ক্যাপ্টেন মোঃ আনিস মন্তব্য করেছিলেন, শালা আমরা পারবো কিভাবে? পাহাড়ের প্রতিটি গাছ-বাঁশ এমনকি কলা গাছেরাও লারমার কথা বলে। তার মানে এই কলা গাছের আড়াল থেকেও তারা আমাদের কাছ থেকে মার খায়। সেই থেকে আমাদের জয়ের ধারা অব্যাহত গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

১৯৭৮ সালের শেষভাগে জুম্ম জাতির কুলাঙ্গার গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ তাদের নাম গজাতে শুরু করে। তবুও আমাদের অগ্রযাত্রা থেমে থাকেনি। ১৯৮২ সালে প্রতিক্রিয়াশীল, ক্ষমতালিপ্সু, উচ্চাভিলাষী বিভেদপন্থীরা দেশী-বিদেশী দালাল চক্র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কংগ্রেস ডাকার প্রস্তাব দেয়। আমাদের মহান নেতা কংগ্রেস ডাকলেন। কংগ্রেসে তারা (বিভেদপন্থীরা) শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। কিন্তু তারা গণতান্ত্রিকভাবে পরাজয় স্বীকার না করে অনাকাঙ্খিত গৃহযুদ্ধ শুরু করলো। ভবতোষ চাকমা নামে এক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে প্রশ্ন করে বললেন, তারা (বিভেদপন্থীরা) নাকি মারজিনাল ভোটে হেরে গেছেন? উল্টো প্রশ্ন করলাম, ভোট কয়টার জন্য হয়? মারজিনাল ভোটে হোক আর লার্জ নামবার ভোটে হোক তারা হেরে গেছে তো? ভোট হয় একটার জন্য আপনি মানছেন? তিনি স্বীকার করে বললেন, হ্যাঁ। প্রিয় নেতা এম এন লারমা ক্ষমা করা এবং ভুলে যাওয়া নীতিতে যখন একত্রিত হওয়ার আয়োজন করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এমন সময় জুম্ম জাতির কুলাঙ্গার, বিভেদপন্থী কুচক্রিরা অতর্কিতে আক্রমণ করে প্রিয় নেতা এম এন লারমা এবং তার আট সহযোগীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে জুম্ম জাতির ইতিহাসে কালো অধ্যায়ের সূচনা করলো। হত্যার আগের মূহুর্তে হত্যাকারীদের উদ্দেশ্য করে নেতা বলেছিলেন, তোমরা আমাকে মেরে কি অধিকার পাবে? যদি পাও মার। সঙ্গে সঙ্গে লেলিয়ে দেয়া দুই পাগলা কুত্তা এলিন এবং মংহ্লাপ্রু এসএমজি'র ট্রিগার টিপে প্রিয় নেতার বুক ঝাঁঝড়া করে দেয়। তিনি আর কোন কথা বলতে পারেন নি। শুধু ডান হাত তুলে দুই আঙুলে 'ভি' চিহ্ন দেখিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নেমে এলো সারা জুম্ম জাতির কাছে শোকের কালো ছায়া। সারা বিশ্ব হতবাক! শুরু হলো ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ। মারিশ্যায় এক মেজর মন্তব্য করেছেন, প্রীতি কুমার লারমাকে মেরে ভালো করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামে একজন মাত্র লোক জন্ম গ্রহণ করেছেন, তাকে মেরে পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন গলা টিপে হত্যা করা হলো। কিন্তু তারা জানে না জীবিত লারমা থেকে শহীদ লারমা আরও বেশী শক্তিশালী।

বর্তমান তথাকথিত ইউপিডিএফ কর্মকর্তাদেরও পার্টির ৭০ দশকের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। পার্টি জন্মলগ্ন থেকে নানা প্রতিকূল সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, ইসলামিক ধর্মান্ধতাবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনী, দক্ষিণাঞ্চলে রামেহ্রা, বামেয়েতা, ফরিয়া, আরাকান কমিউনিষ্ট পার্টি, টিটিপি, পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি, এম এন এফ, পার্বত্য চট্টগ্রাম কনভেনশন, আঙ্গুল বাহিনী, ঘুক্কুরুক বাহিনী, গরম-ঠাণ্ডা বাহিনী প্রভৃতি সমস্ত বাহিনীকে পরাজিত করে আসছে। বর্তমান চুক্তি বিরোধী (জনগণের ভাষায় গুণ্ডষ বাহিনী) পরাজিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইউপিডিএফ কি চায় তা পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর কাছে আজো পরিষ্কার নয়। তাদের কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নেই। তারা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চায় কিন্তু কার কাছে চায়? তাদের কার্যকলাপে মনে হয় সন্তু লারমা বা জনসংহতি সমিতির কাছে তারা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চায়। তা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের

নিরীহ শান্তিকামী মানুষের উপর এত অত্যাচার কেন! নিরীহ শান্তিকামী মানুষদের উপর অত্যাচার করে কি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আসবে? আমি বলবো, তথাকথিত ইউপিডিএফ নেতা-কর্মীদের মূখ্য শত্রু ও গৌণ শত্রু চিহ্নিত করার সাধারণ জ্ঞানটুকুও নেই। ২০০১ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারী বিদেশীদের ধরে নিয়ে তাদের কতিপয় নেতা-কর্মী ঢাকা-চট্টগ্রাম, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুরে বিলাস বহুল হোটেলে রাত যাপন করলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ জনগণ অপূরণীয় ক্ষতির স্বীকার হয়েছেন। এই ক্ষতি পূরণ কখন হবে সেটার উত্তর কেউ দিতে পারবেন না। সেটার উত্তর খুঁজে পাবার আগেই আরও ২৬ আগষ্ট ২০০৩ মহালছড়িতে সেটেলার ও সেনাসদস্যদের দিয়ে শান্তিকামী নিরীহ জনসাধারণের উপর এমন বর্বরোচিত ঘটনা কোন বিবেকবান মানুষ মেনে নেবে না, নিতে পারে না। সেনা সদস্যদের দাবী তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। Operation success but patient death..অপারেশন ঠিকভাবে হয়েছে কিন্তু রোগী মারা গেছে। শান্তি কমিটি করেছে, কিন্তু জনসংহতি সমিতিকে নেয়নি। জনসংহতি সমিতিকে নিলে গোপনীয়তা ফাঁস হবে।

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনে আমি রাঙামাটি হতে খাগড়াছড়ি যাচ্ছিলাম। পথে গাড়ী খারাপ হওয়াতে মহালছড়িতে ঘন্টা দেড়েকের মত আমাদের অবস্থান করতে হয়েছে। সময় পাশ করার জন্য গাড়ী থেকে নেমে কিছু দূর হেটে আসতেই দেখতে পায় একটা বাঁশ ঝাঁড়ের নীচে ৮/১০ বছরের এক মেয়ে ও এক ছেলেসহ এক পরিবার গোমড়ামুখে বসে আছে। কৌতুহলী হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ভোট দিতে আসছেন? বাড়ী কোথায়? পুরুষ লোকটা বললো, মাইল দেড়েক হবে পশ্চিম দিক থেকে। ভোট কোথায় দিয়েছেন জিজ্ঞাসা করতেই দুইজনে একসঙ্গে বলে উঠলেন, কোথায় আর তীর মার্কায়! লোকটা বললেন, আগে থেকে বলে দেয়া হয়েছে, তীর মার্কায় ভোট না দিলে আর ঘরে ফিরে না যেতে। এখন চিন্তা করছি তারা বিশ্বাস করবে কিনা। আমি তাদের বললাম, জোর দিয়ে বলবে তীর মার্কায় ভোট দিয়েছি। মেয়েটি বলল, বাড়ীতে কয়েকটা মুরগী ও একটা ৪/৫ মুঠির শুকর আছে আমাদের সম্বল। আমরা এদিকে আসার সময়ে সেগুলি সেদিকে খেয়ে দিল কিনা কে জানে! মেয়েটি আক্ষেপ করে বললো, মরতেও পারি না, বাঁচতেও পারি না, কোথায় যাবো! তাহলে বুঝুন, তারা কিভাবে ভোট আদায় করেছে। ইউপিডিএফ ভেবেছিল জনসংহতি সমিতি যখন এই অসম নির্বাচন বয়কট করছে এই সুযোগে আমরা লুটে নিই। কিন্তু সোনার হরিণ ধরা কি এত সহজ? দেখা যাক তাদের নির্বাচনী ফলাফল। বলাবাহুল্য যে ফলাফল বন্দুকের নলের জোরেই সন্ত্রাসের মাধ্যমে আদায় করা হয়েছিল।

১। রাঙামাটি পার্বত্য জেলায় পাহাড়ী ভোট- ১,৭৪,৫৮৭
প্রসিত বিকাশ খীসা পায়-১৪,২৮৫ ভোট = ৮.১৮ %(প্রায়);
২। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় পাহাড়ী ভোট- ১,৬৭,১৮৫
প্রসিত বিকাশ খীসা পায়- ৩৪,৩৯৯ ভোট= ২০.৫৭%(প্রায়)
৩। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পাহাড়ী ভোট- ৬২,৩৫৫
রাংলাই মুরং(ইউপিডিএফ) পায়- ৬,৫১১ ভোট= ১.৪৪%।

১৯৭১ সালের নির্বাচনে এম এন লারমা ৯৮% ভাগ জনসমর্থন পেয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের ডাক দেন। পরবর্তীতে বন্দুকের নল থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে- এই শ্লোগানকে সামনে রেখে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেন। এমতাবস্থায় আঞ্চলিক পরিষদ পেতে দুই দশকেরও বেশী আন্দোলন করতে হয়েছে। এর মধ্যেও কত ত্যাগ-তিতিক্ষা, হত্যা, নির্যাতন, জেল-জুলুম, কত কাঠ-খড় পুড়ে গেছে। শান্তি চুক্তির পর আমি আমার কাজের জন্য বেশ কয়েকবার ঢাকায় গেছি। এক সময় আমার পরিচিত এক বন্ধুর বাসায় উঠি। কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বললেন, একটা কথা বলবো দাদা, বেশী হলে মাফ করে দেবেন। তার নিরাপত্তার কারণে এখানে তার নাম দিলাম না। বললেন, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য আমিও কম মর্মাহত নয়। পার্টি ভুল করেছে ছাত্রদের হাতে বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সা দিয়ে। যে কারণে পার্টির আজ এই অবস্থা। আমরা ঢাকায় আছি, ছাত্রদের টাকা উড়ানোর খেলা দেখেছি। আমরা অবাক হতাম- এই টাকা কোথা থেকে আসে। তারা নাকি ভাবতেন, পার্টির কি টাকা বানানোর মেশিন আছে নাকি! অথচ আমরা যারা ভিতরে (আন্ডার গ্রাউন্ডে) ছিলাম পরিবারের পূর্ণ বয়স্করা পেতেন মাসিক ১৫ কেজি চাউল, ১০ বৎসর বয়সীরা পেতো ৭ কেজি। আর চাউল ছাড়া কিছুই পেতো না। আমাদের জন্য বরাদ্ধ ছিল দিনে ৪০০ গ্রাম চাউল, যাকে বলে মানবেতর জীবনযাপন। অপরদিকে ইউপিডিএফ নেতা-কর্মীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিপ্রিয় মানুষদের উপরে খুন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অত্যাচার-নির্যাতন করে। তাদের নেতা-কর্মীরা বিলাসবহুল হোটেলে রাত যাপন করে। পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবী করে দিবাস্বপ্ন দেখে এবং কল্পনার সাগরে ভাসতে ভাসতে কত বৎসর লাগবে অংকটা তারা ভাল করে মিলিয়ে দেখেছেন কি?

আজ ১০ নভেম্বর জুম্ম জাতির ইতিহাসে কালো দিবস। বিশ্বের অধিকারহারা, শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের বন্ধু এবং জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত এম এন লারমার ২০ তম শহীদী বার্ষিকীতে কামনা করি তাঁর স্বপ্ন সফল ও সার্থক হোক। □

Recognisation of the Traditional Institutions through the 1997 CHT Accord

Rupayan Dewan

The British administration brought the tribal Rajas under the Deputy Commissioner (DC), the Chief Administrative Officers of the CHT (Section 7 of the CHT Regulation 1 of 1900) for the first time in history. The Rajas who once were the rulers of the vast areas even beyond the present CHT region, had to become Circle Chiefs. All powers, from executive to judicial were vested with the DC. Being the representative of the Central Government, they played key role in all matters with discretionary power. The tradition still continues even after 32 years since the birth of Bangladesh discriminating the local Jumma (hill people of the CHT) officials.

Since the birth of Islamic Republic of Pakistan it continued recognition of the Excluded Area status of the CHT introduced earlier by the British. The first Constitution gave its recognition in 1956, however the second Constitution introduced in 1962 changed the name of the status as Tribal Area keeping all the clauses of CHT Regulation 1900 in tact. The CHT Regulation 1 of 1900, which is still valid, has been weakened after many amendments by the successive governments of Pakistan and Bangladesh in favour of the non-indigenous people of the plains. During the period of Pakistan the Deputy Commissioners violating the Rule 38 and Rule 39 of the CHT Regulation 1900 had totally stopped meeting the Advisory Council formed by the Circle Chiefs and convening Chiefs' Conference. The Rule 34 dealing with land rights of the Jumma people has been under continuous onslaught of the centre. Rules 51 and 52 dealing with expulsion of undesirable elements and immigration into the CHT have respectively been abolished. Land settlement to accommodate the Bengalee settlers was completed under direct involvement by the Army, ignoring the traditional institutions. Even the appointment of Karbaris has also been directly interfered by the Army, during the period of insurgency. Though it has been the prerogative of the Raja and the Mouza Headmen since British period.

Along with the passage of time the traditional institutions have been more and more weakened in this way. These are now in a moribund condition yet the successive Governments could not abolish these totally. However, after a long gap, 1997 the Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS) and the Bangladesh Government signed the historic CHT Accord with provisions for amalgamation of the traditional Raja-Headman-Karbari administrative system with the democratic institutions for better and meaningful role. The CHT Accord 1997, the Hill District Council Acts of 1998 and the CHT Regional Council Act, 1998 have a good number of provisions to this end. Clause 19 of part D of the Accord gives the Circle Chiefs access to the Ministry of CHT Affairs (MoCHTA) as members of the Advisory Committee to assist the Ministry and clause 12 of part B of the Accord authorizes them to join the Hill District Councils' (HDCs) meetings.

Clause 4 of part B of the Accord authorizes the Circle Chiefs to determine- on the basis of the certificate by the concerned Mouza Headman, or Union Council Chairman or Municipality Chairman as the case may be for filing nomination paper for contesting an election- whether a person is a non-tribal or not and if he is a non-tribal, then to which community he does belong. This is also applicable in determining the permanent residence status of the non-tribals. We should appreciate that, this is a big responsibility devolved upon the headmen, which has boosted up their position in the society as well.

Clause 5 of part D of the Accord has given the Circle Chiefs due involvement in the Land Commission as members for resolving thousands of land disputes with the Bengalee settlers, Security Forces, Forest Department and so forth. Clause 26(C) of part D of the Accord has brought the Headmen under the supervision and control of the HDCs for their functions. Since the Section 64 of the Hill District Council Act of 1989 has been further strengthened through the Accord the Land

Management has become a subject of the Hill District Councils and hence the headmen are supposed to be a part of the HDCs. Similarly, the Accord recognizes tribal laws and social justice through clause 34 of part B. Of course, some changes have been brought in the Act. The clause like- the "tribal law" has become "tribal custom". Section 22E of the CHT Regional Council Act 1998, was incorporated on the basis of clause 9 of part C of the Accord which stipulates supervisory and coordinating authority of the CHTRC over tribal custom, tradition etc. and social justice.

In this way the traditional institutions such as the offices of Raja-Headman-Karbari have been integrated into the democratic institutions like the MoCHTA, CHTRC and HDCs. This involvement has opend up a scope to get the traditional system involved in development sector. The HDCs have no set up of their own at Upazila or union level to implement and supervise their development activities. The Union Parishads under the LGRD Ministry are confined to their mandate and programmes. The Headmen and Karbaries are totally out of the development scenario and hence they can be actively involved in development consultation, supervision and monitoring. The CHTRC has already given its full support to involve the Raja-Headman-Karbari system in a Danida HYSAWA project, which is under process for getting clearance from respective quarters. We can keep in our mind that the Rule 38 of the CHT Regulation 1 of 1900 entrusts the Rajas to work to "spread education and improve health and material condition of the people residing in their circles".

But, this is not the end. The centuries-old traditional Raja-Headman-Karbari system now is in most precarious condition, which needs a careful programming for overall development in the context of its capacity building as an institution as well as capability building at individual level. The allowance they get from the government in exchange of their service is nothing but a humiliation, which needs a bigger change. This will not automatically happen but it needs to make happen. They have their own associations in three Hill Districts, which need immediate reorganization and activation. They have to enlighten themselves for their rights in one hand and get prepared to shoulder the new responsibility in a bigger way on the other. The capacity building of the CHT traditional institutions can really be an area of interest to the donor community, which can also be considered as their positive gesture towards the CHT Accord that was supported by them in December 1997.

* This paper has been presented before the distinguished participants of the Joint Meeting of the CHT Leaders and Donors on the topic "Capacity Building of the Traditional Leadership and Institutions in the CHT", organized by the LCG Technical Working Group on the CHT at Rajbari compound in Rangamti on 30th October, 2003.

সবুজ পাহাড়ের সন্তান

পারমিতা তঞ্চঙ্গ্যা

কিশোরীর আর্তনাদে প্রকম্পিত সবুজ পাহাড়
কুন্ডলী পাকানো ধোঁয়ায় আবছা স্বপ্ন
হৈ চৈ, হট্টগোল
লেফট রাইট, লেফট রাইট
এ্যাকশন....................
ধ্বংসাবশেষ, কয়লার স্তুপ
একতাল মাটির দলা সুখ-স্বপ্ন!

পবিত্র ক্যায়াঙঘরে বুটের ছাপ;
নিস্পাপ শিশুর পদদলিত দেহ;
মায়ের সম্ভ্রম হারানোর গগণ বিদারী চিৎকার;
বেয়নেটের বাটে পিতার নির্যাতিত শরীর;
হায়! কারও দৃষ্টিগোচর হয়না।
গড ফাডারের হাতের ইশারায়
অগ্নিকুন্ডে পরিণত পাহাড় সন্তানের আশ্রয়,
আশা-আকাঙ্খা।

আকাশের ছায়ায়, মাটির আশ্রয়ে
অভূক্ত নিরাপরাধ পাহাড় সন্তান;
বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে
দানবতার মূল হোতা বুক ফুলিয়ে চলে
আশ্রয়হীন অসহায় পাহাড় সন্তান
পালিয়ে বেড়ায় মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারের ভয়ে!

সবুজ পাহাড় নীলচে হয়
মনুষ্যরূপী দানবের হিংস্রতায়।
অসহায় পাহাড় সন্তান মাথা তুলে দাঁড়ায়
দানব রুখবে কঠোর হাতে
সবুজ পাহাড় শক্তি যোগায়। □

এসো আমরা এক হই

ল্যরা চাকমা শাকুরা

এসো জুমবাসী, অপেক্ষার প্রহর শেষ
এম এন লারমার মতো আবারও কেউ দৃশ্যপটে আবির্ভূত হই।
চারদিকে গোলা-বারুদের গন্ধ বেরুচ্ছে,
আবারও সংগ্রাম চাই
চাই বেঈমানের শাস্তিস্বরূপ অস্ত্র।

এসো আবারও কাঁধে তুলি অস্ত্র
অনুভূতিহীন বর্তমান শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে।
যদিও এই মুহূর্তে আমরা রিক্ত, নিস্ব, রোগাক্রান্ত, ক্ষুধিত..
তবু এসো সামান্য খাদ্যকে সম্বল করে শক্তির বৃত্তটাকে বাড়াতে,
ফিরে আসুক আবারও সেই আত্মধ্বংসী রক্তক্ষয়ী ইতিহাস।
এসো পার্বত্যবাসী, এসো সংখ্যালঘুর দল
সংখ্যাগুরুর মাথা মাটিতে লুটিয়ে দিই।
এসো হে পাহাড়, বন-বাঁদাড়ের মানুষ
এই রক্ত হননের উৎসবে সামিল হতে।
এসো জ্বালিয়ে দিই, পুড়িয়ে দিই তাদের
যারা আমাদের পূর্ব পুরুষদের ভিটা কেড়ে নিয়েছে;
ছিনিয়ে নিয়েছে আমাদের মুখের অন্ন সোনার ধান্য জমি;
যারা আমাদের পার্বত্য এলাকাকে পরিণত করেছে
ভূস্বর্গ থেকে নরকে।
এসো দশ ভাষা-ভাষি আবারও এক হই,
সমস্ত ক্লান্তি, অবসাদ মুছে
আমাদের সোনার মাটির দিকে চেয়ে;
স্মিতস্বরে নয়, উদাত্ত কণ্ঠে বলো-
আমরা স্বাধীন নিরাপদ জীবন চাই। □

ম্রুং ভাষার কবিতা

তন ম্ নাদ ফুং

য়াংঙান ম্রো

তন ম্ নাদ ফুং
পাংমাদ (মেনলে)।
লাক ম না দ,
টক্রা প্রেন য়োং,
রি য়োং খতি,
সাং য়োং লাইয়োং
তরা তন চং, নাই রেং খতি,
চক্রা প্রেন য়োং।
রি ঙাক খতি, সাক ঙাক লাই ঙাক,
তন খতি চং।
পাং মাত কেন ক,
ওয়াং তম তনরদ।
প্রেন ঙাক তলাং,
সোং নাম ঙাকপ্রেন,
পাং মাত ক কেন
নাদ য়োং চক্রা
পাং মাত ক কেন,
প্রেন ঙাক তলাং।

বাংলা অনুবাদে কবিতা

স্বর্গ খুবই কাছে

স্বর্গ খুবই কাছে
বলল মেনলে।
স্বর্গ দূর নয়
পবিত্র, নম্রতা, উদারতা,
মিষ্টি মধুর হাসি,
কাজ কর্ম ভাল।
মানুষ দেখলে
হাসিমুখে কুশলাদি
যে জিজ্ঞাসা করে তাদের
কাছে স্বর্গ কাছে।
আর তাদের কাছে স্বর্গ দূর
যারা অন্যের নিন্দা করে
সম্মান করে না যোগ্য ব্যক্তির,
শ্রদ্ধা করে না শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে।
যারা ভাল কাজ করে
তাদের কাছে স্বর্গ
একেবারে কাছে। □

আ ন্দো ল ন

তনয় দেওয়ান

আন্দোলন এক হৃদপিন্ডের মতোন
যেখান থেকে অবিরত রক্ত ঝরে।
কখনো মিছিলের গতিতে অবিরাম চলন্ত পা
পীচঢালা কালো রাজপথের বুকে।
উত্তপ্ত সভার মাঝখানে পাতাবাহারের মতো
তোমার বিচ্ছিন্ন যেকোন ডাল চারাগাছ হবে
দাবদাহ প্রচন্ড গ্রীষ্মের মাটিফাটা পৃথিবীতে
বর্ষা আসার অনেক আগে।
আদর্শহীন দিনাতিপাত মোর,
আমি যে অন্ধকারের ঘোরে
এখনো অনেক প্রশ্নের উত্তর বাকী রেখে
প্রভাত সূর্যের আলোয় দৃষ্টিহীন।
আমার আকাংখিত অধিকার অর্জনে
বর্জিত হলো জমে থাকা আশা।
পরিবর্তনের তপ্ত নিঃশ্বাসে তোমার ফসল
প্রতিদিন পরিপক্ক হয় চিন্তার মারপ্যাচে।
গোধুলী লগনে আলোর মুখ বিদায় নেয় যেভাবে
আদর্শের বীজ তেমনি অংকুরোদগমহীন।
যেন ১০ নভেম্বরের রাত নেমেছে জুম পাহাড়ে
মধ্যাকাশে উদিত সূর্যও সজল নয়নে
সরীসৃপ প্রেতাত্মাদের নাচন দেখে কাঁদে।
মৃত্যু যখন ছিল অজানা দ্বীপে নির্বাসিত
এখন তা তাড়া করে সর্বত্র। অথচ
মৃত্যুকে তাড়া করে কেটেছে জীবন,
উত্তাল যৌবনে রোমাঞ্চহীন জলপাই রঙ
কেড়ে নিয়েছিল ষোড়শীর মায়াবী মুখ।
ফিরে এসে ফিরে আসা হলো না
সুবিধাবাদীরা সব করেছে লুট। □

কবিতা

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

সজীব চাকমা

তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ
যিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, ওকালতি, শিক্ষকতা করেছেন
অপরের হিত সাধনে, অন্ধকারাচ্ছন্ন এক জনগোষ্ঠীকে
আলোকোজ্জ্বল পথে নিয়ে যেতে; মৃতবৎ অসাড় এক জাতিকে
নতুন দিনের স্বপ্ন দেখাতে।

তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ
যিনি সংসদ সদস্য হয়েও, বিত্ত বৈভবের মহাকর্ষীয় সীমায় পরিভ্রমণ করেও
কক্ষচ্যুত হননি আপন পরিক্রমা থেকে;
পতিত হননি স্বার্থের চোরাবালিতে।
তিনি ছিলেন অপরিমেয় সেই মানুষ-
নিজের সুনিশ্চিত ফুলশয্যা হেলায় তুচ্ছ করে
ছুটে যান বহু দূর অতীতে আটকে পড়া অচ্ছ্যুত জুম ভূমিতে,
কঠিন কঠোর জীবন আর মারণাস্ত্রকে তুচ্ছ করে
এক সভ্যতার বীজ বপন করবেন বলে।

তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ
জীবনে শত্রুতা হয়নি কারো সাথে,
অথচ তিনিই শেখান লড়তে রাইফেল কাঁধে
অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে
একজন পুলিশ আর একটি লাঠিই ছিল যথেষ্ট যাদের তাড়াতে।

তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ
যিনি নিজের নয়, নিজের পরিবার বা গোষ্ঠীর নয়, কেবল নিজের জাতির নয়
তিনি ভেবেছেন পাহাড়ের সব শোষণ জর্জরিত সভ্যতা বঞ্চিত মানুষের কথা
বলেছেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে
নিপীড়িত জাতি ও মানুষের কথা, কৃষকের কথা, শ্রমিকের কথা, অবদমিত নারীর কথা।

তিনি ছিলেন জনপ্রিয়, অবিসংবাদিত নেতা, কঠোর সংগ্রামী ও বিপ্লবী চিন্তাবিদ,
অসীম ধৈর্যশীল, সাহসী, আত্মবিশ্বাসী, সৎ ও দুরদর্শী, সংগঠক ও সমাজসেবক,
দার্শনিক ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী
অথচ তিনি ছিলেন নিতান্ত সাদাসিধে, নিরহংকারী, মিতভাষী, মিতব্যয়ী,
ভদ্র, অমায়িক ও ক্ষমাশীল;
আসলে আমাদের কাছে তিনি ছিলেন অপার আকাশের মত,
দুরগামী কোন অভিযাত্রীর নিকষ অন্ধকারে ধ্রুবতারার মত,
ক্লান্ত পথিকের ছায়াময় সুশীতল বটের মত।

তিনিও গান গাইতেন অন্য অনেকের মত গুন গুন করে,
বাঁশী বাজাতেন অবসরে, কাপড়-চোপড় ধুতেন নিজেই আর
ইস্ত্রি করতেন সে সব ভাঁজ করে বালিশের তলায় রেখে সযতনে;

ক বি তা

প্রকৃতি দর্শন করতেন আপন মনে, দিগন্তের পাহাড় দেখতেন,
দেখতেন অসীম আকাশের তারাভরা রাত;
বনের মাঝ দিয়ে যেতে যেতে কোন সহযাত্রী খেয়ালবশে
যদি দা এর ঘায়ে কেটে ফেলেন কোন সবুজ বৃক্ষের ডাল কিংবা
যদি ছিড়ে ফেলেন কোন লতা-পাতা,
সবিনয়ে তিনি বলেন, প্রকৃতির সৌন্দর্য নষ্ট করা- এ ঠিক নয়, এ ঠিক নয়!
তিনিও মাঝে মধ্যে যেতেন পাহাড়ী ঝর্ণায় আমিষের প্রয়োজনে
সাথীদের সাথে মাছ-চিংড়ি ধরতে,
কিন্তু অতিরিক্ত ধরতেন না কোনমতে;
অযথা অযাচিতভাবে পশু-পাখী শিকার কিংবা হাতি, হরিণ, বুনো পাখি, বুনো মহিষ
এমনতর দুর্লভ প্রাণী হত্যার ক্ষেত্রে ছিল তার তীব্র বারণ।
এমনকি সহযোদ্ধাদের দ্বারা ধৃত এক বুনো কচ্ছপের জন্যও তার
কী আকুল উদ্বেগ! তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে ছেড়ে দিতে দেন দূর বনে;
আর স্ত্রী জাতীয় জীবজন্তু হত্যার বেলায়ও ছিল প্রবল বারণ।

তিনি ছিলেন এমন এক মানুষ
অতীতে আর কাউকে দেখেনি এমন পাহাড়ের কোন মানুষ
কাউকে পায়নি এমন আপন করে,
যার নাম জপে জুম্মদের বুক ভরে যায়
যার চোখে জুম্মরা দেখে পৃথিবীর মুখ
অথচ তাকেই হত্যা করেছে একদল জাতকানা অবিবেচক। □

....

কৃতজ্ঞতাঃ শ্রী চন্দ্র শেখর চাকমা, শ্রী বিজয় কেতন চাকমা ও শ্রী মঙ্গল কুমার চাকমা।

জ্বলন্ত আত্মবিশ্বাস

উ উইন মঙ জলি

পাহাড়ের সবুজাভ দিগন্ত ঘিরে আজ
বিক্ষুব্ধ বায়ুমন্ডলে ঘনায় ঝড়ো হাওয়া;
তারই মাঝখানে দৃঢ় প্রত্যয়ে হেঁটে চলে
সাহসী তরুণ জুম্ম প্রাণের পদক্ষেপ।
নূতন অরুনোদয়ের পথ বাতলে দিতে
সংগ্রামের অনামী উল্লাস প্রতিটি মননে।
অনেক বাধার পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ করে
রচে গৌরবময় দূরন্ত স্তব-গাঁথা।
তীর বেগে ছুটে চলে অভীষ্ট লক্ষ্যে,
ধ্বনিত হয় সঙ্গীতমুখর তরঙ্গমালা।।

নির্বোধেরা ভয়ে বিলাপ করে প্রলাপ বকে,
আতংকে লুকোতে পারলে তারা বাঁচে।
বোকা স্তাবক দল স্বভয়ে আশ্রয় খোজে,
উটপাখী যেমন বালুচরে মাথা গুজে।
অট্টহাসি হেসে জ্ঞানপাপী কালো দানব
তাদের উপহাস করে সর্পিল ফণা তোলে।।

সবুজ এই পাহাড়তলে মুক্তি পাগল
দু:সাহসী তরুণ তাজা জুম্ম প্রাণ,
শেকলে বেধে রাখা দু:খিনী মাকে
মুক্ত করার শপথে দৃঢ় দীপ্তিমান।
ধ্বনিত হয় জ্বালাময়ী প্রজ্জ্বলিত ক্রোধ
আর চূড়ান্ত বিজয়ের জ্বলন্ত আত্মবিশ্বাস।।
তাই দেখে জ্ঞানপাপী বৃদ্ধ কালো দানব
চুপিসারে ছাড়ে ক্লান্তির দীর্ঘশ্বাস।। □

ক বি তা

নি ম ন্ত্র ণ
টিপু চাকমা

হে প্রজন্ম,
বিলাসিতা জগতের তামাশা দেখে দেখে
আর কতকাল ভুলিয়ে রাখবে নিজেকে?
জানি,
তোমার বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষের সহজ সরল মন
শিখিয়ে দেয়নি লাভ ক্ষতির হিসাব, কাকে বলে মূলধন।
কিন্তু তুমি কি জানো-
আজন্ম স্বার্থপর শাসক শোষকের দল
আকণ্ঠ লুটে নিচ্ছে তোমার বেঁচে থাকার সম্বল!

যদি তোমার মোহ-মুগ্ধ অন্ধকার পোহায়
এসো এই ১০ ই নভেম্বর '৮৩-র স্মরণ সভায়।
এখানে জুম্ম জাতির রক্তাক্ত ইতিহাস পাঠ করা হয়,
এখানে শত্রু-মিত্র, ঘাতক,
বহুবিধ মানুষের পরিচিতি তুলে ধরা হয়।

এসো, এম এন লারমার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে
লও লড়াইয়ের শপথ
চিনে নাও আলোকিত মুক্তির একমাত্র পথ।□

অ ত্যা চা র
অলকা চাকমা জ্যাসি

যেমনি করে বাজপক্ষীরা উড়ে গগণে মুক্ত মনে
তেমনি করে দু'পাওয়ালা বাজপক্ষীরা
মোদের পার্বত্য জুম্ম জনতার উপর করছে অত্যাচার।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জুম্ম জনগোষ্ঠীর বসতিতে
অত্যাচার করে চলছে সহজ সরল জুম্মদের। নিপীড়িত
তারা, অত্যাচার করছে আমাদের উপর
জীবনযাত্রায় বৃহত্তম বিপর্যয়।
মনোরম এলাকা চতুরদিকে হরিৎ পর্বতে ঘেরা
তারই মাঝে অবারিত ঝর্ণার কুলকুল ধ্বনিতে
আজ শুনতে পাই আমি
আমার প্রিয় ব্যক্তির বলিষ্ঠ
সেই প্রতিবাদের প্রতিধ্বনির সুর।
হিংস্র জন্তুদের আগমনে বাপ ভাইয়েরা ছেড়েছে বসত
অতল সাগরের মত অসীম জলের মাঝে
খরখুটোর ন্যায় ভেসে যায়
মনে যেন হয় মালিক কেউ নেই।
পবিত্র ধর্মস্থান, বিশাল মাটির ঘর, কাঠের বাড়ী
বাঁশের মাচাং নিমিষে কয়লাপিন্ডের রূপ করে ধারণ
চেঙে, মেয়নী, কাজলঙ, কাউখালী লঙগুদু, সুবলঙ
নানিয়েচর, শঙ্খ, মাতামুহুরীতে
বাজপক্ষীদের ঠোঁটের আঘাতে
বয়ে যায় বাপ-ভাইদের রক্ত।
সেই তীক্ষ্ম ঠোঁট থেকে রেহাই পাচ্ছে না জুম্ম মেয়েরা
নিপুণ কৌশলে জুম্ম মেয়েদের জীবন
করছে চিরতরে পঙ্গু।
নেমে আসে জীবনে কালো মেঘের কালবৈশাখীর ছায়া।
করি গো মিনতি জুম্ম জনতা হয় যেন একতা
করি গো আশা, প্রত্যাশা এই আমি
বাপ ভাইয়েরা অত্যাচার থেকে ফিরবে একদিন
সুখের সেই দিন আসবে একদিন
অত্যাচার আর কোনদিন থাকবে না পার্বত্যে।
হবে মোদের সুখের অনাবিল দিন আর আনন্দ
আমাদেরও হবে একদিন ভোর
হবে সূর্যের উদয়।□

স্মৃতিচারণ

মহান নেতার শিক্ষা

আশাপূর্ণ চাকমা
নৈতিক

এক

১৯৭৫ সাল। আমি তখন পার্টির ৮ম জেডএলসি (জোনাল লীডারশীপ কোর্স) শেষ করার পর সেকেন্ড ল্যাফটেনেন্ট হিসেবে কেসি সাব-জোনে (খাগড়াছড়ি- কমলছড়ি অঞ্চল) কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলাম। মহিলা সমিতি গঠন, যুব সমিতি গঠন আর পঞ্চায়েতগুলোকে সক্রিয় করার জন্য সদা ব্যস্ত সময় কাটছিলো আমাদের। অন্যদিকে শত্রুরা তখন তাদের ক্যাম্পগুলো বিভিন্ন স্থানে সম্প্রসারণ করছিলো।

সেদিন সকালে অগ্রজ সহযোদ্ধা তুফান (শুভেন্দু প্রবাস লারমা ওরফে বুলু) ও বুড়ো ওস্তাদের নির্দেশমত প্রকাশের (প্রীতি কুমার চাকমা) কাছে চিঠি পৌঁছে দেওয়ার জন্য রওয়ানা হলাম। কমলছড়িতে প্রকাশকে না পেয়ে সরাসরি হেডকোয়ার্টারের উদ্দেশে আবার পথচলা শুরু করলাম। মহালছড়ি উপজেলার মুভাছড়ি এলাকার প্রত্যন্ত বদাকাপ্যা আদাম। পার্টির তৎকালীন হেডকোর্য়াটার। প্রায় দুপুরে সেখানে পৌঁছলাম। কিন্তু তখন সেখানে প্রকাশ ছিল না। সে কাজের জন্য বাইরে ছিল। এসময়ে হেডকোর্য়াটারের একজন দায়িত্বশীল কর্মীর সাথে আলাপ করছিলাম। পরে আমাদের আলাপ এক প্রকার তর্কের পর্যায়ে চলে যায়। তবে আমাদের আলোচনার অল্প কিছুক্ষণ পরে মহান নেতা তার সাথে দেখা করার জন্য আমাকে ডেকে পাঠান।

দোচালা শনের ছাউনি দেয়া একটা ঘর। সবার জন্য বাঁশের তৈরী বিছানা করা আছে। দেখি যে, তিনি সেখানে পূর্ব মুখী হয়ে বসে আছেন। ছাই রঙের একটা শার্ট গায়ে জড়ানো। ফুলপ্যান্ট পড়া। তার পাশে বিনেন্দু বিকাশ চাকমা (দীপংকর)ও বসে আছেন।

নেতার পিতা চিত্ত কিশোর লারমার বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করি। সেই সময়ে তিনি সেখানে মাঝে মাঝে যাওয়ায় যদিও আমি তাকে চিনতাম। কিন্তু পার্টিতে যোগ দেওয়ার পর জেডএলসি কোর্স শেষ করে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে সেদিনই তার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য আমার সামনে উপস্থিত হয়।

আমি ঘরের ছাউনীর নীচে পৌঁছার সাথে সাথে তিনি দাঁড়িয়ে আমাকে অভিবাদন জানালেন। আমি তাঁকে পায়ে ধরে প্রণাম করছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে হাতে ধরে নিবৃত্ত করলেন এবং বসতে বললেন। বসার পর আমাকে প্রশ্ন করলেন- তুমি কেমন করে এখানে পৌঁছলে?

আমি বললাম- প্রকাশকে খোঁজার জন্য আমি কমলছড়ি আসি। কিন্তু সেখানে আমাকে বলা হয় যে, তিনি হেডকোয়ার্টারে আছেন। তাই আমি সরাসরি এখানে চলে এসেছি।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন- বাইরের খবর কি?

আমি বললাম- সবকিছু ভাল আছে। তবে আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়নরা খাগড়াছড়ির দিকে চলে যাচ্ছে।

আমাদের দেখা হবার আগে আমি জনৈক একজন কর্মীকে দিয়ে তার কাছে সহযোদ্ধা তুফান এর লেখা চিঠিটি পাঠিয়েছিলাম। তিনি এবার জানতে চাইলেন- চিঠিটি কেমন করে নিয়ে এসেছ?

জুতার মোজার ভিতরে করে নিয়ে এসেছি- আমি জানালাম।

তিনি একটু স্বস্তি প্রকাশ করলেন। তারপর আবার মন্তব্য করলেন- যদি তুমি বিডিআর এর মুখোমুখি হতে তাহলে তারা চেক করলে তো ধরা পড়তে।

আমি একটু হতভম্ব হয়ে পড়লাম।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন- তুমি হেডকোর্য়াটারে আসার সময়ে কেমন করে এলে? তোমাকে কেউ কিছু বলেছে কি-না?

ওপি (অবজারবেশন পোস্ট)-তে দায়িত্বরত একজন কর্মী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল আমি কোথায় যাচ্ছি। তখন প্রকাশের কাছে যাচ্ছি বলে তাকে উত্তর দিয়েছিলাম। তারপর সে আর কিছু বলেনি এবং আমাকে যেতে ইশারা করলো।

এবার তিনি প্রশ্ন করলেন- সেখানকার সবাই ভাল আছেন?

হ্যাঁ, সবাই ভাল আছেন- বললাম আমি।

তুমি তো চিঠি নিয়ে এসেছ। এখন তোমাকে চিঠির উত্তর বয়ে নিয়ে যেতে হবে। তুমি কেমন করে তা নিয়ে যাবে? আমি বললাম- জুতার নীচে ঢুকিয়ে নিয়ে যাবো।

যদি যাওয়ার পথে শত্রুর হাতে ধরা পড়ো তখন কি করবে?

আমি বললাম- শত্রুর হাতে ধরা না পড়ার জন্য তাদের এড়িয়ে গোপন রাস্তা দিয়ে আমি চলে যাব।

তিনি আশ্বস্থ হলেন এবং তার লেখা চিঠিটি হাতে হাতে যেন তুফানকে দিই তা আমাকে বুঝিয়ে বললেন। আরও বললেন যে, তাকে না পেলে যেন তা বুড়ো ওস্তাদকে দিয়ে দিই। শেষে তিনি আমার মঙ্গল কামনা করে আমাকে বললেন- আমাদের জনগণের মধ্যে কতিপয় শত্রুভাবাপন্ন লোক আছে। তারা আমাদের অবস্থান জানতে পারলে অসুবিধা হতে পারে।

আমি এরপর আবার তাকে সেলাম করে বিদায় নিলাম। তিনি আমাকে কিছুদুর এগিয়ে দিতে আসলেন।

দুই

১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাস। তখন পার্টির হেডকোয়ার্টার বদাকাপ্যা আদাম হতে বদলী করা হচ্ছিল। বদলীর একটা পর্যায়ে মহান নেতা ৭৫ জনের দলবল নিয়ে গাছবান এলাকার বগড়াপাড়ায় অবস্থান করছিলেন। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আমরা তাদের জন্য রাতের খাবারের ব্যবস্থা করলাম। তারপর দিন সকাল। আমি প্রকাশের সাথে আলাপ করছিলাম। আলাপের এক পর্যায়ে প্রকাশ আমাকে জিজ্ঞেস করে- কেসি সাবজোনের খবর কি?

তখন আমি তাকে বললাম-

> এখানে যে সকল প্রতিক্রিয়াশীলরা আছে তাদের মধ্যে একজনকে ধরা হয়েছে। তাকে মারপিট করে আবার ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এলাকাটি আগের চাইতে অনেক সংগঠিত হয়েছে।

এসময়ে বেড়ার অপর পাশে প্রয়াত নেতা যে ছিলেন তা আমরা জানতাম না। তিনি আমাদের আলাপ শোনার পর আমাদের কাছে স্বয়ং এগিয়ে এলেন। তখন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন- সিক্কো, আমরা কোন দারোগা নই, পুলিশ নই। আমরা হলাম বিপ্লবী। জনগণ হলো পানি আর আমরা হলাম মাছ। কাজেই জনগণের সাথে আমাদের থাকতে হবে। তাদেরকে বোঝাতে হবে। বিপ্লবীরা কখনো জনগণকে বোঝানোর জন্য মারধোর করে না। তাই মারধোর করে কাউকে বোঝানো যায় না। '

তিনি আবার প্রশ্নের সুরে বললেন- তুমি বই পড় না?

বই পড়ার সময় হাতে থাকে না- উত্তর দিলাম আমি।

স্ট্যালিন, মাওসেতুঙরা কেমন করে সময় বের করে? তারা তো এর চাইতেও বেশী গভীর ও গুরুত্বপুর্ণ কাজে জড়িত থাকে। তুমি দেখ, পার্টির বিবৃতি, দলিলপত্রাদি আমাদের কর্মীরা মন দিয়ে পড়ে না। তাই পার্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে পারে না, বুঝতে পারে না। তাই পার্টির অবস্থা এরকম। তাছাড়া অনেক পার্টি কর্মী সমালোচনা মোটেও গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু সমালোচনা-আত্মসমালোচনা প্রক্রিয়াই হলো পার্টির মূল চালিকাশক্তি। কারণ সমালোচনা-আত্মসমালোচনার মাধ্যমেই ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

আমি একটু লজ্জিত হলাম। মুহূর্তে আমার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। একপ্রকার সম্বিৎ হারিয়ে ফেললাম। যেন কিছু আমাকে সবসময় তাড়া করছে বলে অনুভব করতে লাগলাম।

রাত কেটে গেলো। উজ্জ্বল ভোরের দিন শুরু হলো। পাখীগুলো গাছে গাছে কচি পাতায় নাচানাচি করছে। আর একে অন্যকে ডাকছে। তাদের কিচির মিচির শব্দে বনের নির্জনতা যেন প্রাণ পেয়েছে। আমরা পাখী আর বনের মিতালীতে যেন অতিথি। কিন্তু সেদিন আমরা একেবারে পানছড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেব। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো কুরোইদিছড়ার কারিগর পাড়া প্রাথমিক স্কুলে। নিরাপদে আমরা গাইড দিয়ে মহান নেতাসহ কেন্দ্রীয় টীমকে কুরোইদিছড়ার কারিগর পাড়া প্রাথমিক স্কুলে পৌঁছিয়ে দিলাম। সেখানে পৌঁছার পর কারিগর পাড়া প্রাথমিক স্কুলের একটি রুমে তিনি আমাকে ডেকে বসালেন। তারপর ফিরে যাবার ব্যাপারে আমাদের পরিকল্পনা জানতে চায়লেন। আমি যথাসম্ভব গোছালোভাবে সবকিছু বললাম। তারপর তিনি আমার উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন-

> জনগণের সাথে সবসময় ভাল ব্যবহার করবে, কখনো খারাপ আচরণ করবে না। শত্রু কে, মিত্র কে তা আমাদের চিনতে হবে। এজন্য বই পড়তে হবে। বই পড়া ছাড়া কোনদিন রাজনীতি করা যায় না। যেমন তুমি একজন দায়িত্বশীল কর্মী, তুমি যদি পড়াশুনা না করো জনগণকে কিভাবে বুঝাবে? আমাদের জুম্ম জাতির সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে জানা দরকার। আমাদের সমাজ হলো পিছিয়ে পড়া সামন্ত চিন্তাধারার সমাজ। যে কোন মুহূর্তে যে কোন ব্যক্তি পার্টির বিরুদ্ধে যেতে পারে। তবে কোনদিন একজন জুম্ম বাঙালী হতে চায় না। কিন্তু স্বার্থের খাতিরে আমাদেরকে আঘাত হানতে পারে। যাক কেসি সাবজোনে চার প্রকারের জাতির লোক আছে। যেমন- চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও বাঙালী। তাদের সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হবে। তাই অধ্যয়ন ও অনুশীলন ছাড়া কাজ করা ভাল হবে না। দেখ, বিপ্লবী রাজনীতি ছাড়া জুম্মরা টিকে থাকতে পারবে না। কেউ ভাসা ভাসাভাবে রাজনীতি করলে বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করতে পারবে না। আমাদেরকে পেশাগতভাবে রাজনীতি করতে হবে; নেশাগতভাবে নয়। বহিরাগত বাঙালীরা আমাদের মাতৃভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামকে দ্রুত বেদখল করে নিচ্ছে। তাদের এই বেদখলের প্রক্রিয়াকে প্রতিরোধ করতে না পারলে অতি শীঘ্রই এটা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হবে। কাজেই গণতান্ত্রিক বা সশস্ত্রভাবে আমাদেরকে প্রতিরোধ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আমি যা জানি কেসি সাবজোনের জনগণ যথেষ্ট

সহযোগিতা দেয়। তাদের সহযোগিতায় পার্টিকে সুদৃঢ় ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলন সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হবে।

তিনি এবার একটু থামলেন এবং আমাকে আবার প্রশ্ন করলেন- আচ্ছা আমরা বিপ্লব করার জন্য লড়ছি, তুমি কি জান- বিপ্লব এর অর্থ কি?

আমি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরে বললাম- বিপ্লব মানে পরিবর্তন। সমাজের আমূল ও মৌলিক পরিবর্তন।

আমার উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হলেন। তারপর একটু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন যে-

আমাদের জুম্মরা হলো ঘরমুখী। কাজেই কর্মীদের মনেও প্রচন্ড পিছুটান। তাই এরা ঘরে ফেরার জন্য সবসময় উদগ্রীব হয়ে থাকে। কিন্তু যে ঘরের মাটি অন্যেরা কেড়ে নিচ্ছে সে ঘরের মাটির মালিকানা বজায় রাখার জন্য গভীরভাবে চিন্তা করে না।

তিনি সবশেষে জানতে চায়লেন- জুম্মদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কে সাহায্য সহযোগিতা দেয়?

তৃতীয় কুমার ত্রিপুরা- আমি বললাম। তিনি গাছবানের লোক। সবসময় আমাদেরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করেন।

তখন পশ্চিম আকাশে সূর্যটা হেলে পড়ছে। বিকেলের মিষ্টি ম্লান রোদে সন্ধ্যার স্পর্শ লাগতে শুরু করেছে। আমরা ফেরার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। তিনি আমাদের সাবধানে পথ চলার জন্য আবারও পরামর্শ দিতে ভুলে গেলেন না। রাত্রি ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে আমরাও নিজেদের গন্তব্যে ফিরে চলার জন্য দ্রুত পা চালাতে লাগলাম। □

জুম্ম জাতি উপাখ্যান

মুরুং জাতির কিছু ঐতিহাসিক তথ্য

রাঙ্কোয়াপু

টংকোপতি চিনিপাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কনওয়াই মুরুং সেদিন আমাদের রামজু পাড়াতে এসে অনুরোধ করে বললেন- 'আমি অনেক দিন যাবত বুড়োবুড়িদের নিকট থেকে খোঁজাখুঁজি করে মুরুং জাতির ঐতিহাসিক কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। সেগুলো লিপিবদ্ধ করে প্রচার করার জন্য আমাকে পরামর্শ বা সাহায্য করুন।' আমি তার মৌখিকভাবে বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্যগুলো সন্নিবেশিত করে মুরুংদের কিছু ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে লিপিবদ্ধ করছি।

প্রায় হাজার বৎসর আগে মুরুং জাতির বসতি ছিল চীনদেশের কোন এক শহরে। তখন তাদের ছিল না নিজস্ব ভাষা; ছিল না নিজস্ব সংস্কৃতির গান বাজনা। সেহেতু তারা অনেক কাল ধরে বিধাতার কাছে অক্ষর ও নিজস্ব গান বাজনা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করছিল। একদিন বিধাতা তাদের প্রার্থণা পূরণ করার জন্য কলাপাতাতে মুরুংদের জন্য অক্ষর তৈরী করে একটি গরুকে দিয়ে পাঠালো। এবং স্বপ্নে মুরুং জানালো- আমি তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করেছি এবং একটি গরুর মাধ্যমে তোমাদের জন্য কলাপাতাতে অক্ষর তৈরী করে পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমরা সবাই লেখাপড়া শিখে নিও। অন্যদিকে গরুটি আসার পথে প্রচন্ড খাদ্যাভাবে ক্ষুধার যন্ত্রণায় মৃত্যু মুখের কাছে পৌছুলো। তখন সে ভাবলো আগে জীবন রক্ষা তারপর অন্য কথা। ফলে সে বিধাতার লেখা অক্ষর সম্বলিত কলাপাতাটি খেয়ে ফেলল। এদিকে মুরুংরা অক্ষর পাওয়ার আশায় দিন গুণতে লাগলো। কিন্তু কোথাও গরুর দেখা নেই। পরে একদিন মুরুংরাই গরুটির সাক্ষাৎ পেল। তখন তারা বিধাতার পাঠানো অক্ষরের কথা জিজ্ঞেস করলো। গরুটি তখন ভয়ে ভয়ে তার ক্ষুধার কষ্টের কথা বলে বাঁচার জন্য খেয়ে ফেলেছে বলে জানালো। সে কথা শুনে মুরুংরা রেগে গিয়ে গরুকে বেঁধে পাড়াতে নিয়ে আসলো। কেন বিধাতার পাঠানো অক্ষর সে খেয়ে ফেলেছে তার রাগ মেটাতে তারা সারারাত ধরে গরুকে পেটালো। সকালে বর্শা দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলে গরুটির মাংস সবাই ভাগাভাগি করে খেল। তখন থেকেই মুরুংরা এ পর্যন্ত গরু হত্যা প্রথা পালন করে আসছে।

পরে বিধাতা আবার মুরুংদের উপর সহায় হলেন। তিনি কথা দিয়েছিলেন মুরুংদের জন্য অক্ষর ও সংস্কৃতির জন্য গান বাজনা শিক্ষা দিবেন। এখন গান বাজনা কিভাবে মুরুংদের নিকট পাঠানো যায় তা নিয়ে বিধাতা বড়ই চিন্তায় পড়লেন। একদিন একজন মুরুং কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে একপর্যায়ে মূর্ছিত হলো। তখন পরিবারের সবাই করুণ সুরে কান্নাকাটি করতে লাগলো। তখন বিধাতা চিন্তা করলেন এখন তাদের কাছে গান বাজনা পৌছে দেয়ার সুযোগ হয়েছে। তখন বিধাতা মুর্ছিত মুরুং এর শরীরে প্রবেশ করে তার আত্মাতে গান বাজনাগুলো শিখে দিয়ে তাকে প্রাণ দিয়ে বেঁচে তুললো। এবং বিধাতা প্রস্থান করলো। তখন রোগাক্রান্ত মুরুংটি বেঁচে উঠলো। তারপর সে সকল মুরুংদেরকে গান বাজনা শিখালো। তখন হতে মুরুংরা নিজস্ব সংস্কৃতিকে গান বাজনা দিয়ে গরু হত্যা অনুষ্ঠানে উৎসব করে আসছে।

কিন্তু চীন দেশের শাসক একসময় তাদের উপর চরম শোষণ, নির্যাতন এবং অন্যায় করতে লাগলো। বৎসরের পর বৎসর ধরে চলে আসা এ নিপীড়ন নির্যাতনে মুরুংরা অতিষ্ট হয়ে তথা অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাধ্য হয়ে দেশত্যাগের কথা ভাবলো। এবং প্রাণরক্ষার জন্য বার্মার আরাকান প্রদেশে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু দেখা গেল যে, একভাগ পালাতে সক্ষম হলেও অন্যরা পালাতে অক্ষম। বিশেষ করে যাদের ঘরে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ও চলাচলে অক্ষম বুড়োবুড়ি রয়েছে তারা পালাতে অক্ষম। তখন তারা অনুরোধ করলো ভাইসব যারা পালাতে সক্ষম তারা আগে পালিয়ে যান। আমাদের জন্য আরাকানে ঘর তৈরী করে রেখো। যদি প্রাণে বেঁচে থাকি তবে আমরা সেখানে আসলে যেন আশ্রয় লাভ করতে পারি। এভাবে যারা সক্ষম তারা পালিয়ে এসে ক্রমান্বয়ে আরাকানে বসতি স্থাপন করতে শুরু করলো এবং তারা ফেলে আসা আত্মীয় স্বজনদের জন্যও বাড়ীঘর তৈরী করে দিল। তখন থেকে মুরুং পরিবারগুলোতে দুটি করে ঘর তৈরীর প্রথা সৃষ্টি হলো। একটি হলো নিজেরা থাকার জন্য অন্যটি অতিথিদের থাকার জন্য। নিজেরা থাকার ঘরকে তারা মালঘর বলে এবং অতিথিদের থাকার ঘরকে কাচারী ঘর বলে। সেজন্য কোন মুরুং পরিবারের কাছে অতিথি আসলে তারা কাচারী ঘরে আপ্যায়ন করে থাকে। যা এখনো প্রচলন আছে।

আসলে ম্রো বা মুরং শব্দটি তাদের নিজেদের নয়। এটা আরাকানী শব্দ। আরাকানের ভাষায় ম্রো অর্থ শহর। ম্রোরা যেহেতু চীনদেশে শহরে বাস করতো তাই আরাকানীরা তাদের শহরবাসী বা ম্রো বলে ডাকত। এই ম্রো শব্দটা কালের আবর্তে ম্রো জাতির পরিচয় তুলে ধরেছে। দু:খজনক হলেও এখন মুরুংরা তাদের নিজেদের পূর্ব জাতির নামটি কেউ জানে না। কালের গর্ভে নির্যাতন নিপীড়নের কারণে দেশত্যাগে বাধ্য হয়ে তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

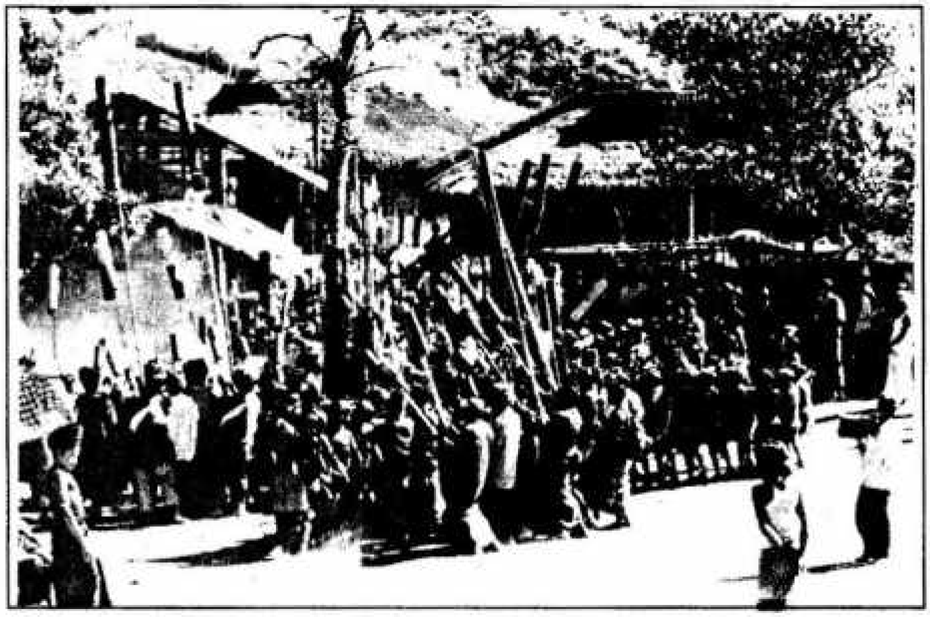

আরাকান দেশে বসতি করার এক পর্যায়ে আরাকানীরা ভিন্ন দৃষ্টিতে বা পরদেশী হিসেবে আখ্যায়িত করে আবার ম্রোদের উপর নানা প্রকারে নিপীড়ন, নির্যাতন চালাতে আরম্ভ করে। আরাকানীদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ম্রোরা আবার পালাতে বাধ্য হয়। তখন তারা বর্তমান কক্সবাজার জেলার দক্ষিণে টেকনাফে বসতি স্থাপন করে। সেখানেও তারা সুদীর্ঘকাল ধরে বসতি স্থাপন করতে পারেনি। সেখানেও আরাকানীদের বসতি ছিল বলে তারা উচ্ছেদ হয়ে পড়ে এবং বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণে সাগরের পাড়ে বাঁশখালি নামক স্থানে নতুন বসতি শুরু করে। কিন্তু বাঁশখালীতে বাঙালী জলদস্যুদের আক্রমণে তারা বসতি স্থায়ী করতে পারেনি। বাঙালী জলদস্যুদের আক্রমণ হতে বাঁচার জন্য তারা চাকমা রাজার রাজ্যে বর্তমান রাঙামাটি জেলার কাপ্তাইয়ে নতুনভাবে বসতি স্থাপন শুরু করে। কাপ্তাই-এ বসতি তাদের জন্য বেশ সুবিধাজনক হয়ে উঠে। তখনকার চাকমা রাজা বাহাদুর মুরুংদের জাতীয় জীবনের দু:খ দুর্দশার কথা জানতে পেরে সেন্হবশে তাদেরকে বসতি করার যাবতীয় অধিকার দিয়েছিল। সেখানে মুরুংরা দীর্ঘকাল ধরে নিরাপদে বসতি করে পুরুষের পর পুরুষ ধরে জুম চাষ করে জীবন নির্বাহ করে আসছিল। একসময়ে জুম চাষের উপযোগী জায়গার অভাব দেখা দিলে তারা কাপ্তাই ছেড়ে ক্রমান্বয়ে শঙ্খ মাতামুহুরী নদী ধরে বর্তমান চিম্বুক পাহাড়ের দিকে বসতি স্থানান্তর করতে থাকে। তখন এই চিম্বুক পাহাড়ের নাম চিম্বুক ছিল না। আনুমানিক বর্তমান হতে শত বৎসর আগে বর্তমান বান্দরবান-থানচি সড়কের ১৮ মাইল নামক স্থানে বর্তমান পাবলা হেডম্যান পাড়াতে পাবলা হেডম্যানের দাদু যার নাম ছিল চিম্বুক সর্দার সে জুম চাষ ও বসতি শুরু করে। তখন থেকে তার নামে পাহাড়টি চিম্বুক পাহাড় নামে পরিচিত হয়ে উঠে। যেমন কাপ্তাইয়ে থাকাকালে বর্তমান কাপ্তাই বাঁধের আনুমানিক ১ মাইল নীচে কর্ণফুলী নদী হতে মুরুংরাই পানি আনার ঘাট হিসেবে ব্যবহার করতো বলে বর্তমানে সেটি মুরুং ঘাট নামে আজও পরিচিত। অনুরূপভাবে বাঁশখালীতেও বসতি গড়ার সময়ে গরু হত্যা উৎসব পালন করার সময় নিক্ষেপ করা পাথরগুলো এখনো কোন কোন স্থানে রয়েছে যা তাদের স্মৃতিকে বহন করে। সে সময়ে কয়েকজন মুরুং বাধ্য হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে হয়েছিল বলে জানা গেছে। যারা বর্তমানে পুরোপুরি মুসলমান বাঙালী হয়ে সেখানে বসবাস করছে। তবে ইতিহাসের পাতায় কাপ্তাই আর চিম্বুক এলাকায় এখনও মুরুংদের অস্তিত্ব টিকে রয়েছে।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আরও জানালেন যে, মুরুংরা হাজার বছরের ইতিহাসে কখনো সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারেনি। শুধু দেশ ছাড়া ও বিতারণের পথে তারা দু:খ কষ্ট ভোগ করে চলেছে। যদিও কাপ্তাই, মাতামুহুরী ও শঙ্খ নদীর পাহাড়ের কোলে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করছে কিন্তু শিক্ষার অভাবে, অধিকারের অভাবে যুগের পর যুগ ধরে তারা যাযাবর জীবনধারা কাটাচ্ছে।

এরই মধ্যে বর্তমান সরকার মুরুং এলাকার অস্তিত্ব চিরতরে মুছে দেবার জন্য বিভিন্ন জায়গাজমি কৌশলে কেড়ে নিচ্ছে। মুরুং জাতি পুনরায় বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য হচ্ছে। এভাবে বিতাড়িত হলে মুরুং জাতি কিভাবে বেঁচে থাকবে? বর্তমানে অন্য কোথাও যাওয়ার মতো অবস্থা তাদের নেই। তাহলে নিজের দেশে পরবাসী হয়ে কি মুরুং জাতির বেঁচে থাকা সম্ভব? □

ঘ ড়ি

জগদীশ চাকমা

নিদ্রাহীন রাত্রি কাটানোর পর সমর বন্ধুদের নিয়ে সকালে হাইড আউট থেকে বের হয়ে আসলো। প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাইড আউট করেছিল বলে সমরের বন্ধুরা ভাল ঘুমিয়েছিল রাত্রে। গভীর ঘুমে কেতু স্বপ্ন দেখলো দুই কপোত-কপোতী পাশাপাশি বসে মনের আনন্দে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করছে। মাঝে মধ্যে ডানার ঝাঁপটায় কপোত কপোতীকে আদর করল। এক সময় কপোতী উড়ে বসে অন্য ডালে। কপোতও উড়ে সঙ্গে সঙ্গে বসে তার পাশে। এভাবে চলে তাদের লুকোচুরি খেলা। শেষে এক অজানা বিপদের আশংকায় হঠাৎ করে দুই কপোত-কপোতী উড়তে থাকে আকাশে। দু'টি পাখী দু'দিকে উড়ে যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ঘুম থেকে জেগে সেই স্বপ্নের কপোত-কপোতীর লুকোচুরি খেলা চোখের পর্দায় ভাসতে থাকে তার। হঠাৎ তার খেয়াল হয় তার স্বপ্ন ছিল গতকালের সমর আর রীণার মিলনের একটা রূপ। অনেক দিনের পর মিলনে দু'জনে যেন নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে। একে অপরের সান্নিধ্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাদের এই মিলন কি বাস্তব রূপ লাভ করবে? এক অজানা আশংকায় তার মন ব্যথিত হয়ে উঠে। যদি সেই স্বপ্নের কপোত-কপোতীর মত সমর ও রীণার জীবন চলার পথে দু'দিকে ছিটকে পড়ে!

রীণা সমরদের অপেক্ষায় ছিল। সে খুব ভোরে উঠে বিন্নি ভাত রেঁধেছে। লংকা পড়া বিন্নি ভাতের গন্ধে সারা মোনঘরটি আমোদিত হয়েছে। রীণাও সেই সুগন্ধে যেন মাতাল।

কিছুক্ষণ পর সমর তার বন্ধুদের নিয়ে মোন ঘরে পৌঁছলো। বিন্নি ভাতের সুগন্ধে তাদের মন উদ্বেলিত হল। উঁচু মই দিয়ে মোনঘরের উপরে উঠে দেখলো রীণা হাড়ি বাসন গোছাতে ব্যস্ত। তাকে যেন কেমন চঞ্চল লাগল সমরের। নূতন পিনোন-হাদি পড়ে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে রীণাকে। যেন আনন্দ উচ্ছল-প্রেমময়ী এক অভিসারীনি। সমর দাড়িয়ে দেখতে থাকে রীণাকে। রীণা লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়। রীণা ভাষা খুঁজে পায় না। কি বলতে গিয়ে কিছুই বলতে পারলো না।

ঃ মামাদের দেখছি না। তারা কোথায়? সমর শুধুলো।

ঃ তারা মরিচ তুলতে গেছে। তোমরা বস। সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় রীণা।

রীণা এক জগ পানি ও কয়েকটা কয়লা নিয়ে আসে তাদের মুখ ধোয়ার জন্য। সমরের বন্ধুরা ব্রাশ ও টুথ পেষ্ট দিয়ে দাত মাজতে শুরু করে। সমর কিন্তু রীণার হাত থেকে একটা কয়লা নিয়ে দাত মাজতে থাকে। তার বন্ধুরা কিছুটা অবাক হয় সমরকে কয়লা দিয়ে দাত মাজতে দেখে।

ঃ কেন, তোমার ব্রাশ ও পেষ্ট আনোনি?

ঃ আছে। তবে আজকে কয়লা দিয়ে মাজবো।

সমর ও বন্ধুরা মুখ ধোয়া শেষ করে মাচার উপর বসে পড়ে। মাচার বিছানো চাজাগুলো লাল চিকচিক করছিল। কি পরিচ্ছন্ন। চাজাগুলোর ফাক দিয়ে স্নিগ্ধ হাওয়া ভেসে আসছিল।

রীণা লংকা পড়া বিন্নি ভাত বাড়লো। একটি থালায় সব ভাতা বেড়ে তাদের সামনে রেখে দিল। বললো

ঃ শুধু ভাত খাও। গুড় চিনি কিছুই নেই।

সমর নিজের রুকচেক থেকে এক মোচা চিনি বের করে বললো ---

ঃ তুমি খাবে না? এসো আমার কাছে চিনি আছে।

রীণা যেন সে ডাকের অপেক্ষায় ছিল। সেও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। তারপর সবাই গোল হয়ে বসে বিন্নি ভাত দলা দলা করে খেতে শুরু করল।

এভাবে সমর তার বন্ধুদের নিয়ে কয়েকদিন রীণাদের মোনচাপে কাটাল। সেই মোনচাপে ২০টি জুম চাষী ছিল। জুমের ধান, তিল, তুলা তোলা শেষ। এখন কাচা-পাকা মরিচ তুলতে সবাই ব্যস্ত। রীণা সমরদেরকে অনেকের মোনঘরে নিয়ে গেল। মোনচাপের যুবক-যুবতীরা তাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। সমর তাদেরকে দেশের কথা, জুম্ম জাতির কথা ও আন্দোলনের কথা শুনাল।

কমান্ডার সমরের ভাষণে রীণাও উদ্বেলিত হয়। তারও ইচ্ছে হয় সমরদের সাথে যোগ দিতে। দেশ ও জাতির কাজ করতে। কিন্তু তা কি সম্ভব? সে যে অবলা নারী। নারীরা কি দেশের কাজ করতে পারে না? রীণা উত্তর খুঁজে পায় না। এভাবে রীণা ভাবতে থাকে দেশ ও জাতির কথা, সমরের কথা। মনে মনে সে গর্ববোধ করে বিপ্লবী সমরেরা আজ তার মোনঘরের মেহমান।

গ্রাম থেকে অনেক দুরে রীণাদের মোন চাপ। গ্রাম্য যুবকেরা এক বেলায় যেতে পারলেও রীণার একদিন লাগে গ্রামে পৌঁছতে। রীণা ঠিক করে সে গ্রামে যাবে। তারপর বাজারে গিয়ে সমরের জন্য একটা জিনিস কিনবে। কিন্তু কি দেবে সমরকে? শার্টিং? স্যুটিং? লুঙ্গি? গামছা? না সবই আছে সমরের। তাছাড়া এগুলোর আর কতদিন টিকবে? তাই অনেক দিন টেকে এমন জিনিস তাকে দেবে সে। কিন্তু কি দেবে? অনেক চিন্তা করেও ভেবে পায়না রীণা। শেষে ঠিক করে বাজারে গিয়ে একটা কিনে নেবে।

সমরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রীণা চলে যায়। সারাদিন সে পথ চলতে চলতে সমরের কথা ভাবছিল। কখন যে ভাঙ্গা মোন, বড়চুক মোন ও পাথুরী মোন পাড় হয়ে নাড়েই ছড়ি পৌঁছে তার খেয়াল নেই। সেদিন হাটতে তার ক্লান্তি আসেনি। উচু মোন উঠতে ঘন ঘন দম নিতে হয়নি। চুয়ানো পানিতে ভেজা পিচ্ছিল শিল-সাদারা হাটতে পা পিছলে পড়েনি। কি এক অনাবিল আনন্দে হেটেছে রীণা সেদিন।

পরদিন রীণা বাজারে এসে কি কিনবে ভেবে পায়নি। বাজারটার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরেছিল কয়েকবার। সারি সারি দোকানে সাজানো ছিল কত জিনিস পত্তর। মনোহারী দোকানীরা তাকে ইশারায় ডাকে। কত রঙের চুলের ফিতা, নখ পালিশ, চুলের ক্লিপ, স্নো-পাউডার আরো কত জিনিস সাজানো। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই রীণার। তার আজ কসমেটিকের কোন প্রয়োজন নেই। তার চায় কাঙ্খিত পুরুষের মন জাগানো একটা কিছু। কিন্তু কি কিনবে? ভাবতে থাকে --------- জুতা? বেল্ট? টর্চ? স্যুটিং? শার্টিং? কোনটি তার পছন্দ হয় না। এভাবে বেলা গড়িয়ে যায়। অনেক ভাবলো, অনেক সময় গেলো। অথচ কিছু কেনা হলো না। অবশেষে হঠাৎ খেয়াল হলো, ক'টা বাজে? তাকে যে বাড়ি ফিরতে হবে। হাতে তার ঘড়ি নেই। সে গেলো ঘড়ি দেখতে। তখনই তার মনে পড়লো আমারই মতো সমরেরও একটা ঘড়ি দরকার।

অবশেষে একটা ঘড়ি কিনে রীণা সমরের জন্য। ঘড়িটা চলনসই। সমরের মনের মত হবে তো? যাক, সমর যখন ঘড়িটা দেখবে আমাকে মনে পড়বে তো? ঘড়িটা তো সমর হাতে পড়বে। আমাকে মনে রাখবে তো? এসব কিছু ভাবতে ভাবতে রীণা বাড়ি চলে আসে। খুশীতে তার দেহ মন চঞ্চল হয়ে উঠে। কালকে সমরের হাতে পড়িয়ে দেবে ঘড়িটা। সমর নিশ্চয়ই খুশী হবে। ঘড়িটা দেখলে নিশ্চয়ই তাকে মনে পড়বে। আনন্দে তার মন নেচে উঠে।

গভীর রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না রীণার। সে শুধু ভোরের অপেক্ষায় থাকে। আজ দু'দিন হলো সে সমরকে দেখেনি। হয়ত সমরও অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রয়েছে। ধীরে ধীরে রাত গভীর হতে থাকে। অন্ধকার নেমে আসে। রাতের নিস্তব্ধতায় কি দারুন নীরবতা নেমে আসে। আকাশের চাঁদ যেন আজ লুকিয়ে আছে। তারকা রাশিও হারিয়ে গেছে। শুধুমাত্র মিটমিট জোনাকিগুলো ছুটোছুটি করছে। রীণা দেখলো নিজের হাতটাও দেখতে পাচ্ছে না। কি বিদঘুটে অন্ধকার। রীণার ভয় হয়। সে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। আরো অন্ধকার ঘিরে ধরে তাকে। রীণা চোখ বন্ধ করে। সে শুধু শুনতে পায় সেই ঘড়িটির টিক টিক শব্দ।

অমাবশ্যার ঘোর অন্ধকারে সমস্ত পৃথিবী যখন নিস্তব্ধতায় অভিভুত, তখন ঘড়িটি আপন গতিতে চলমান। টিক্ টিক্ , শব্দ শুনতে শুনতে রীণাও ঘুমিয়ে পড়ে। শেষ রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গে রীণার। সে শুনতে পায় তাদের মোন চাপে ৪টি রকেট বোমা ফুটলো। তারপর অনেক দূরে সোনালী রঙের আভার আর্ভিভাব ঘটলো। ইতিমধ্যে পাড়াপড়শি সবাই জেগে উঠে। কেহ কেহ বলতে থাকে নিশ্চয়ই মোন চাপে আর্মিরা আগুন দিয়েছে। রীণারও মনে হয় তাই। কিন্তু সে ভাবতে পারে না। ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে রীণা। কেউ জানেনা কেন কাঁদে রীণা। কি অজানা আশংকায় কাঁদে সে? সে জানেনা সমরের কি হলো? বুড়া মা বাপের কি হলো? ঘড়িটা কাকে দেবে সে? ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দটা কি সমরের কথা বলে? রীণা কিছুই জানেনা। শুধু কাঁদতে থাকে। □

প্র তি বে দ ন

মহালছড়ির ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত মানবিক কার্যক্রম

মহালছড়ি সাম্প্রদায়িক হামলার ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য জাতিসংঘ পরিবার কর্তৃক মানবিক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের চাহিদা নিরূপণের জন্য যৌথ চাহিদা নিরূপণ মিশন গত ৬-১১ অক্টোবর মহালছড়ি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসহ খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি সফর করেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্তসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে কথাবার্তা বলেছেন। মি. ভিনসেন্ট ও'রেইলি-এর নেতৃত্বে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট এই যৌথ চাহিদা নিরূপণ মিশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১ জন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের ১ জন এবং জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ইউএনডিপি'র ৩ জন, ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (ফাও) ২ জন, ইউনিসেফ'র ৬ জন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র ৫ জন ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচী'র ১ জন প্রতিনিধি রয়েছেন।

মিশনটি ৭ অক্টোবর সকাল বেলায় খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের সাথে এবং দুপুরে জেলা প্রশাসনের সাথে আলোচনায় মিলিত হয়। জেলা প্রশাসনের সাথে আলোচনাকালে খাগড়াছড়ি জেলার পুলিশ সুপার বলেন যে, রূপন মহাজনের অপহরণের ফলে এলাকায় চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল এবং এক পর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ফলতঃ এই অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটে। এ প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি রূপায়ণ দেওয়ান বলেন যে, অপহরণের পর ২৫ আগষ্ট আয়োজিত জনসভায় সেটেলাররা ঘোষণা দেয় যে "সেনাবাহিনী, পুলিশ ও প্রশাসন তাদের পক্ষে রয়েছে। কাজেই ভয়ের কিছুই নেই। তারপর দিন সকাল রূপন মহাজনকে ছেড়ে দেয়া না হলে পাহাড়ীদের উপর হামলা করা হবে।" কিন্তু তাদের এই ঘোষণা সত্ত্বেও পুলিশ, সেনাবাহিনী ও সাধারণ প্রশাসন কেন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি তা তিনি পুলিশ সুপারের কাছে জানতে চান। তিনি বলেন- সাধারণ নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীদের উপর কেন হামলা করা হলো? ঘটনা ঘটেছে মহালছড়ি বাজার এলাকায় কিন্তু কোন যুক্তিতে পাঁচ মাইল দূরবর্তী কেরেঙ্গ্যানাল, দূরপর্য্যানাল, বসন্ত পাড়া ইত্যাদি গ্রামে হামলা করা হলো যেখানে কোন পুলিশ কিংবা আর্মী ক্যাম্প নেই, নেই কোন সেটেলার গ্রাম?

চাহিদা নিরূপণ মিশন ৮-১০ অক্টোবর যথাক্রমে লেমুছড়ি, নুয়া পাড়া, পাহাড়তলী, স'মিল পাড়া, রামেশু কার্বারী পাড়া, বাবু পাড়া, বসন্ত কার্বারী পাড়া, কেরেঙ্গানাল, দুরপর্যানাল গ্রামে সরেজমিন সফর করে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ যাচাই করেন ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে কথা বলে চাহিদার তথ্যাবলী সংগ্রহ করেন। সরেজমিন পরিদর্শনের শেষ দিনে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি এবং খাগড়াছড়ির সিভিল সার্জন কেরেঙ্গানাল গ্রামের ধর্ষিতা কালাসোনা চাকমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। কালাসোনা চাকমা প্রতিনিধিদের কাছে তাঁর উপর সংঘটিত পাশবিক অত্যাচারের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, দুইজন সেনা সদস্য তাকে ধর্ষণ করে। রূপায়ণ দেওয়ান ফিজিক্যাল অবজার্বেশন-এ কালাসোনা চাকমার বয়স জানতে চাইলে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ডাঃ নার্গিস পারভিন ৩৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হবে বলে জানান। খাগড়াছড়ির সিভিল সার্জন ৩০ বছরের উর্দ্ধে হবে বলেন। তিনি অবশ্য পৃথক পৃথকভাবে কালাসোনার বয়স জানতে চান। উল্লেখ্য যে, হামলা চলাকালে কমপক্ষে ১০ জন জুম্ম নারী ধর্ষণের শিকার হয়। ইউএনডিপির নিরাপত্তা কর্মকর্তা অবসরপ্রাপ্ত জনৈক কর্ণেল বলেন যে, কালাসোনা চাকমার ধর্ষণের অভিযোগ কেউ বিশ্বাসই করে না। কেননা ৬০ বৎসরের বৃদ্ধাকে ধর্ষণের রুচি কারোই নেই। যে এ অভিযোগ শুনবে সে হাসিতে ফেটে পড়ে। উল্লেখ্য যে, মহালছড়ির ওসি ও কর্তব্যরত ঐ অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল কালাসোনা চাকমা গ্রামে নেই বলে মিশনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালায়। মিশনের দুই মহিলা ডাক্তার, খাগড়াছড়ির সিভিল সার্জন ও রূপায়ণ দেওয়ান ধর্ষিতা কালাসোনা চাকমার সাথে আলাপকালে দুঃখ করে বলেন যে, ধর্ষণ ঘটনার পর থেকে তার স্বামী তাকে গ্রহণ করছে না। ফলে সে চরম মানসিক ও আর্থিক কষ্টে দিনাতিপাত করছে। কালাসোনা চাকমার স্বামীকে বুঝানোর পর সে তার স্ত্রীকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়। উল্লেখ্য যে, কালাসোনা চাকমা রূপায়ণ দেওয়ানের কাছে অভিযোগ করেন যে মহালছড়ির আর্মীরা তাকে খোঁজ করছে। তাই তিনি তার কাছে নিরাপত্তার সাহায্য কামনা করেন। সাদা পোশাকে কর্তব্যরত মহালছড়ি জোনের মেজর নাজমুল কালাসোনা চাকমার পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেন। মিশনের ডাক্তারবৃন্দ কালাসোনা চাকমার সাইকো-সোসিয়াল ও শারীরিক অবস্থা যাচাই করেন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দেন।

এই ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত মানবিক সাহায্যের জন্য জাতিসংঘের "অফিস অব দ্য কমিশনার ফর হিউম্যানিটারিয়ান এজিষ্টান্স" বা 'ওছা' মোট ৮০ হাজার মার্কিন ডলার বরাদ্দ করেছে। অন্যান্য দাতাগোষ্ঠী থেকে ৪০ হাজার ডলারসহ সর্বমোট ১,৭৫,০০০ ডলারের প্রাথমিক বাজেট ধার্য্য করা হয়। কিন্তু মিশন প্রতিনিধিরা সরেজমিন ঘুরে মন্তব্য করেছেন যে, যে পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাতে উক্ত বরাদ্দে কোন কূলকিনারা পাওয়া যাবে না। উল্লেখ্য যে, মহালছড়ির সাম্প্রদায়িক হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য জরুরী ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত মানবিক সাহায্য প্রদানের জন্য ইউএনডিপি গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সরকারের নিকট এক প্রস্তাব পেশ করে এবং গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সরকারের পক্ষ থেকে উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। তারই আলোকে ২৮ ও ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম

বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘ পরিবারের পাঁচটি বিশেষায়িত সংস্থার মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখিত প্রস্তাব ও বৈঠকসমূহের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যৌথ চাহিদা নিরূপণ মিশন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন করে চাহিদা নিরূপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই মানবিক ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সাহায্য কার্যক্রম যথাক্রমে আশু ও মধ্য মেয়াদী ভিত্তিতে বাস্ত বায়ন করা হবে। দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রমের জন্য পৃথক পরিকল্পনা নিতে হবে। ১-৩১ অক্টোবরের মধ্যে আশু কার্যক্রম এবং ১৫-৩১ ডিসেম্বর ২০০৩ এর মধ্যে মধ্য মেয়াদী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানা যায়। আশু কার্যক্রমের মধ্যে আনুমানিক ৫০০ পরিবারের ২০০০ জনের জন্য খাদ্যশস্য, তৈল, লবনসহ রান্না সামগ্রী, জরুরী স্বাস্থ্যসেবা ও গৃহ নির্মাণ করা হবে। মধ্য মেয়াদী আওতায় স্কুল, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বাজার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রম এবং দীর্ঘ মেয়াদী আওতায় ক্ষতিগ্রস্তদের স্থায়ীত্বশীল জীবনযাত্রা উন্নয়ন এবং সমষ্টিগত ক্ষমতায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। গত ১২ তারিখ রাঙ্গামাটিস্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত র‍্যাপআপ বৈঠকে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী'র প্রতিনিধি মিজ রেহানা বানু জানুয়ারী থেকে জুন ২০০৪ পর্যন্ত বিনামূল্যে চাউল ও অনতিবিলম্বে ভোজ্য-তেল, ডাল, লবণ এবং শিশুদের জন্য বিস্কুট সরবরাহের আশ্বাস মিশনকে দেন। দুইজন ডাক্তার নিয়োগ দিয়ে অনতিবিলম্বে একটি মোবাইল মেডিক্যাল টীম গঠনের জন্য সুপারিশ করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র প্রতিনিধিবৃন্দ। অনুরূপভাবে অন্যান্য সংস্থাসমূহও বিভিন্ন সুপারিশ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি রূপায়ণ দেওয়ান এই প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক পরিষদের সম্পৃক্ততার বিপরীতে সক্রিয় তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালনের জন্য সুপারিশ করেন। তিনি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদকে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার জন্য সুপারিশ করেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে জাতিসংঘের একাধিক বিশেষায়িত সংস্থা যৌথভাবে এবারই প্রথম কোন একটি কাজে হাত দিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকেও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী'র কান্ট্রি ডিরেক্টর মিঃ ডগলাস ক্যাসন কুট্স-এর সঙ্গে ১৭ সেপ্টেম্বর সাক্ষাৎ করে মহালছড়ির ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য খাদ্য সাহায্য চাওয়া হয়।□

আওয়ামী লীগ কর্তৃক গড ফাদার তালিকা প্রণয়ন ও কিছু কথা

সম্প্রতি আওয়ামী লীগ বিএনপি তথা জোট সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ১০২ জন গডফাদারকে চিহ্নিত করেছে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার চরম অবনতি, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির ফলে জনজীবনে দুর্ভোগ সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের অবনতিশীল ভাবমূর্তি দেখা দেওয়ার সময়ে আওয়ামী লীগের এই গডফাদার চিহ্নিতকরণ নি:সন্দেহে বিএনপি সরকারের চরম ব্যর্থতা ও রাজনৈতিক দেউলিয়াপনাত্বকে তুলে ধরেছে। কিন্ত পার্বত্যবাসী হতবাক হয়েছে সেসব গডফাদারের তালিকায় খাগড়াছড়ির সেটেলার নেতা ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নাম না দেখে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত সন্ত্রাস, ভূমি বেদখল ও সাম্প্রদায়িকতার হোতা হলো ওয়াদুদ ভূঁইয়া। পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের এক দশমাংশ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। এ অঞ্চলে গত ২৬ আগস্ট খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়িতে সেটেলার নেতা ওয়াদুদ ভূঁইয়ার প্রত্যক্ষ মদতে ৩৫৯ জুম্ম বাড়ীতে লুটপাতের পর অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, শতাধিক বাড়ীতে লুটপাত করা হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে দুজনকে, ধর্ষণ করা হয়েছে ১০ জন মা বোনকে, আহত করা হয়েছে অর্ধশতাধিক ব্যক্তিকে। শুধু তাই নয়, একই উপজেলায় পাকুজ্যাছড়ি এলাকায় জুম্মদের ভূমিতে দুই শতাধিক বাড়ী নির্মাণ করে সেটেলাররা শত শত জমি বেদখল করেছে। ওয়াদুদ ভূঁইয়ার সন্ত্রাসের কারণে সমগ্র খাগড়াছড়ির লোকজন জিম্মি হয়েছে। কিছুদিন আগে আওয়ামী লীগ আমলের খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে তার চেলাচামুন্ডারা খাগড়াছড়ি বাজারে প্রকাশ্যে মারধোর করে আহত করেছে। ওয়াদুদ ভূঁইয়ার সন্ত্রাস ও হুমকীর মুখে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা কল্প রঞ্জন চাকমা খাগড়াছড়িতে পর্যন্ত পা দিতে পারে না। চুক্তিকে লঙ্ঘন করে সে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড চেয়ারম্যান পদটি বেদখল করেছে। এই ওয়াদুদ ভূঁইয়ার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসী ও পা চাঁটা কুকুরেরা সন্তু লারমার ফাঁসি দাবী করছে। চুক্তিকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে প্রতিনিয়ত লঙ্ঘন করে চলেছে। এসকল অপকর্ম, সন্ত্রাস, খুন ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থকারী ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে কেন গড ফাদারের তালিকায় অর্ন্তভূক্ত করা হলো না তা পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের একান্ত জিজ্ঞাসা। তাহলে কি ধরে নেয়া যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তি লঙ্ঘন, সন্ত্রাস, খুন ও অপহরণের মতো জঘন্য কাজে জড়িত থাকলেও সে আওয়ামী লীগের কাছে পূজনীয় ব্যক্তি? নাকি পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় আওয়ামী লীগ কিছু বলতে নারাজ?

প্রকৃত কথা হলো আওয়ামী লীগের নিজের দলেও দীপংকর তালুকদারের মতো গডফাদার রয়েছে। এই দীপংকর তালুকদার ইউপিডিএফ এর সাথে যোগসাজশ করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে সেটেলারদের জুম্মদের ভূমিতে পুনর্বাসন করার হীন প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। তাই আওয়ামী লীগ গড ফাদারের তালিকায় ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নাম অন্তর্ভূক্ত করেনি সচেতন মহল মনে করছে।□

প্রতিবেদন

দিনাজপুরে আদিবাসী উচ্ছেদের প্রতিবাদে সমাবেশ ঃ জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের যোগদান

গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩ দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে 'সামাজিক বনায়নের নামে আদিবাসীদের জমি হুকুমদখল ও অধিগ্রহণ বন্ধসহ ১১ দফা বাস্তবায়নের দাবীতে আদিবাসীদের এক সমাবেশ ও স্মারকলিপি পেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'জীবন দেবো তবুও ভূমির অধিকার ছাড়বো না', 'ভিক্ষা চাই না, করুনা চাই না, বাঁচার মতো করে বাঁচতে চাই'-এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত আদিবাসীদের সমাবেশে আদিবাসীদের দাবী ও ঘোষণার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের পক্ষ থেকে যোগদান করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি রূপায়ন দেওয়ান ও সাধারণ সম্পাদক চন্দ্র শেখর চাকমা। আদিবাসীদের অধিকার ও দাবীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে সেখানে আরও যোগদান করেন গণফোরামের প্রেসিডিয়াম সদস্য পংকজ ভট্টাচার্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল।

এদিন প্রথমে আদিবাসীরা নবাবগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ঘেরাও করে তাদের ১১ দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপিতে বনবিভাগের অধিগ্রহণকৃত জমির বাইরে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে বন বিভাগের বেআইনি দখল বন্ধ, বনায়নের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, বন বিভাগের অধিগ্রহণকৃত জমির তালিকা তহশিল অফিসে টাঙিয়ে প্রচার, অধিগ্রহণকৃত ভূমির প্রকৃত মালিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান, বেআইনিভাবে দখলকৃত জমি পুনরায় ভূমির প্রকৃত মালিকদের ফিরিয়ে দেয়া, সামাজিক বনায়নের নামে অন্যায়ভাবে কৃষকদের হয়রানি বন্ধ করাসহ বিভিন্ন দাবী জানানো হয়।

স্মারকলিপি প্রদানের পরপরই নবাবগঞ্জের বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ নবাবগঞ্জ উপজেলা শাখার উদ্যোগে আদিবাসীদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় আদিবাসী নেতা সুভাষ মান্ডির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পংকজ ভট্টাচার্য, রূপায়ন দেওয়ান, চন্দ্র শেখর চাকমা, মেসবাহ কামালসহ আদিবাসী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সরেন, এ্যাডভোকেট বাবুল রবি দাশ, এ্যাডভোকেট গনেশ সরেন, এ্যাডভোকেট রফিকুল আমিন, লক্ষীকান্ত হামজা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, আদিবাসীরা নিজের জন্মভূমিতে পরবাসী, অধিকার বঞ্চিত এবং আদিবাসীরা এই ভূমির সন্তান হয়েও এদেশে তাদের ভূমির অধিকার নেই। বনায়নের নামে সরকার আদিবাসীদের ভিটেবাড়ী কেড়ে নিচ্ছে, তাদেরকে নিস্ব থেকে নিস্ব করে দিচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে আদিবাসীদের উপর এই নির্যাতন-জুলুম বন্ধ করার দাবী জানান। উল্লেখ্য, সামাজিক বনায়নের নামে আদিবাসীদের ভূমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়ায় সম্প্রতি দিনাজপুরের ১৩টি উপজেলায় বসবাসরত প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার আদিবাসীর সামাজিক জীবন আজ হুমকীর সম্মুখীন। পরিবেশ রক্ষার নামে গাছ লাগানোর কথা বলে এডিবির অর্থায়নে সরকারের বন বিভাগ আবার সেখানে শুরু করেছে আদিবাসীদের বসতভিটা ও ফসলী জমি কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র। □

ঘাগড়ায় ইউপিডিএফ কর্তৃক ২ ব্যবসায়ী অপহরণ। সেনা কর্মকর্তার সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টির অপচেষ্টা

গত ৬ অক্টোবর ২০০৩ রাঙামাটি জেলাধীন কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া বাজার থেকে চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ দুই ব্যবসায়ীকে অপহরণ এবং নারীসহ অপর দুইজনকে গুলীবিদ্ধ করে আহত করেছে। জানা গেছে, চুক্তি বিরোধীরা প্রথমে অপহৃতদের মুক্তিপণ হিসেবে ৫৫ লক্ষ টাকা দাবী করে, পরে আবার কমিয়ে ২৫ লক্ষ টাকা নির্ধারিত করে। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘাগড়া জোনের কতিপয় সেনা কর্মকর্তা ঘাগড়া বাজার এলাকায় পাহাড়ী-হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য, এই দিন সন্ধ্যা প্রায় ৭টায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী দিব্যেন্দু চাকমা (৩৪), মিলন চাকমা সুগত (৩২) ও অমলেন্দু চাকমা (প্রাক্তন মেম্বার) এর নেতৃত্বে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ এর একটি সশস্ত্র দল হঠাৎ ঘাগড়া বাজারে এসে হানা দেয়। এসময় বাজারের বেশ কয়েকটি দোকান ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। একসময় নিজ দোকানে অবস্থানরত ব্যবসায়ী পরিমল দে (৪৫) এবং তপন মিত্র (৩৫) ও তার দোকান কর্মচারী তপন চন্দ্র দে কে চুক্তি বিরোধীরা অস্ত্রের মুখে অপহরণ করতে উদ্যত হলে দোকান কর্মচারী তপন চন্দ্র পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তৎক্ষণাৎ চুক্তি বিরোধীরা তপন চন্দ্রকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লে তপন চন্দ্র গুলীবিদ্ধ হয়ে আহত হয়, তবে সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এসময় চুক্তি বিরোধীদের কর্তৃক ছোঁড়া গুলীতে হোসনে আরা বেগম (৪০) নামে অপর এক পথচারী মহিলাও

আহত হয়। অপরদিকে চুক্তি বিরোধীরা ব্যবসায়ী পরিমল ও তপন মিত্রকে অপহরণ করে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য, এই ঘটনার সময়'ঘটনাস্থল হতে মাত্র ৪০/৫০ গজ দুরে পুলিশ অবস্থান করলেও অপহৃতদের উদ্ধার ও অপহরণকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের জন্য তাদের কোন তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি। ঘটনা ঘটার প্রায় পৌনে এক ঘন্টা পরই স্থানীয় ক্যাম্পের সেনাসদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়। শুধু তাই নয়, প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা যায়, চুক্তি বিরোধী অপহরণকারীরা যখন বাজারে হানা দিতে রাঙামাটি-চট্টগ্রাম সড়কস্থ ঘাগড়া উপজাতীয় কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির অফিসের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলে তৎস্থলে কর্তব্যরত আর্মড পুলিশের মুখোমুখী হয়। এ সময় সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধের চেষ্টা না করে উল্টো আর্মড পুলিশরা পালিয়ে যায় বলে জানা যায়। যার ফলে চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসীরা বাজারে এসে নির্বিঘ্নে এই সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটাতে সক্ষম হয়।

এই ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কাউখালী উপজেলা শাখার পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি অবিলম্বে অপহৃতদের উদ্ধার ও অপহরণকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবী জানানো হয়েছে। চুক্তি বিরোধীরা এ যাবৎ এই এলাকায় নানা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও চাঁদাবাজি চালালেও এবং চুক্তির পক্ষের বেশ কয়েকজনকে খুন করলেও তাদের গ্রেফতারের ব্যাপারে প্রশাসনের তরফ থেকে এ পর্যন্ত কার্যকর কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। যে কারণে চুক্তি বিরোধীরা তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দিন দিন বৃদ্ধি করে চলেছে।

এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘাগড়া জোনের কতিপয় সেনা কর্মকর্তা এলাকায় পাহাড়ী-হিন্দু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টা চালাচ্ছে' বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, গত ৮ অক্টোবর ২০০৩ দুপুর প্রায় দেড়টায় ঘাগড়া ফরেষ্ট অফিসে এসে ৭ ইবিআর এর মেজর সামাদ ঘাগড়া বাজারের হিন্দু ভদ্রলোক ডাঃ সন্তোষ কুমার সেন এবং হেডম্যান ও বাজার চৌধুরী স্নেহ কুমার দেওয়ানকে ডেকে পাঠান। সেনা কর্মকর্তার ডাকে ডাঃ সন্তোষ কুমার সেন ও হেডম্যান স্নেহ কুমার দেওয়ান ফরেষ্ট অফিসে এসে উপস্থিত হলে সেনা কর্মকর্তা হেডম্যানকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, আপনার নাতি সোহাগ দেওয়ান কি করে? জবাবে হেডম্যান বলেন, আমার নাতি গার্লস স্কুলের শিক্ষক। সেনা কর্মকর্তা বলেন, আপনার নাতিতো একজন ইউপিডিএফ এর সদস্য। আমিতো জানি না বলে হেডম্যান উত্তর দিলে সেনা কর্মকর্তা আর কোন আলোচনা না করে তাকে চলে যেতে বলে। হেডম্যান বাইরে পার্শ্ববর্তী এক দোকানে বসে ডাঃ সন্তোষের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। হেডম্যান চলে যাওয়ার পর সেনা কর্মকর্তা ডাঃ সন্তোষের সাথে আলাপ শুরু করেন। শুরুতেই সেনা কর্মকর্তা ডাঃ সন্তোষের কাছে জানতে চান যে, আশেপাশে চাকমাপাড়া আছে কিনা। ডাঃ সন্তোষ ইশারায় দেখিয়ে বলেন, এগুলি সবই তো চাকমাপাড়া। এরপর সেনা কর্মকর্তা প্রস্তাবের সুরে ডাঃ সন্তোষকে বলেন যে, চলুন না একটা কাজ করি। আমিও সাথে থাকবো। দু'চারটা পাহাড়ী বাড়ী পুড়িয়ে দিই। একথা শুনে ডাঃ সন্তোষ বলেন, আপনার ব্রেন (মাথা) ঠিক আছে নাকি! এখানে পাহাড়ীদের সাথে আমাদের যে উঠাবসা-আন্তরিকতা আমরা সেটা নষ্ট করতে চাই না। কাজেই সেটা অসম্ভব। এই ঘটনা যদি কেউই ঘটাতেও চায় তাহলে আমাদেরকেই আগে মেরে ফেলতে হবে। সেনা কর্মকর্তার এই কুপ্রস্তাব ডাঃ সন্তোষ অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিলে শেষ পর্যায়ে সেনা কর্মকর্তা উল্টো বলেন যে, আপনাকে একটু ট্রাই করে দেখলাম।

উল্লেখ্য, সেনা কর্মকর্তার এই অপপ্রস্তাবের কথা জানাজানি হলে তার সত্যতা জানার জন্য গত ৯ অক্টোবর ২০০৩ বাজারে স্থানীয় পাহাড়ী-বাঙালী মুরুব্বীদেরকে নিয়ে এক সভা ডাকা হয়। সভায় পাহাড়ী প্রতিনিধি ছাড়াও বাজরের সেক্রেটারী আমীর হোসেন, কাঞ্চন করসহ অনেক বাঙালী প্রতিনিধিও উপস্থিত হন। এই সভায়ই ডাঃ সন্তোষ সেন সেনা কর্মকর্তার সাথে তার উক্ত আলাপ-আলোচনার সত্যতা স্বীকার করেন।

তারপর ১১ অক্টোবর তারিখে কাউখালী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা শাহ আলম মৃধার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আইন শৃঙ্খলা সভায় জোন কমান্ডার বলেন যে, ঘাগড়া বাজারে ইউপিডিএফ এর হামলা এবং দুইজন ব্যক্তিকে অপহরণের ঘটনাটি পিসিপি ও জনসংহতি সমিতির ব্যর্থতার কারণে ঘটেছে।

পরে ইউপিডিএফ সমর্থিত ঘাগড়া ইউপি চেয়ারম্যান সাথোয়াই প্রু কার্বারী, ডাক্তার শিমুল দে, বিএনপি'র কাউখালী থানার সভাপতি জসিমউদ্দিন খোকন ও ডাক্তার সন্তোষ সেন। তারা প্রথমে ৪ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ প্রদান করে। পরে আরও ৩ লক্ষ টাকা দিয়ে অপহৃতদের মুক্তির ব্যাপারে বোঝাপড়া করেন। এর সূত্র ধরে ২১ অক্টোবর তারিখে নানুপুর থেকে ছেড়ে দেয় এবং সকাল ৮টার দিকে ঘাগড়া বাজারে এসে পৌঁছে। □

প্র তি বে দ ন

তিন ভূঁইফোড় সংগঠনের মিথ্যাচার

তিনটি ভূঁইফোড় সংগঠন সম্প্রতি তাদের চরম দালালীপনা ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। তাদের স্মারকলিপি ও প্রচারণা হতে বুঝা যায় যে, সেনাবাহিনীর ব্রিগেড অফিসের কর্ণেল, মেজরদের দুষ্ট মগজেই এই সংগঠনগুলো জন্মলাভ করেছে। তারপর তাদের পদলেহী কিছু সুবিধাবাদী অর্থব লোক দিয়ে এই সংগঠনগুলোকে দিয়ে তাদের সেবা করার ও জুম্ম জনগণ এবং আন্দোলনের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য লালন পালন করা হচ্ছে। এই তিনটি সংগঠন হলো- ১) আদি জনগোষ্ঠী সমন্বয় পরিষদ ২) পার্বত্য বাঙালী ছাত্র পরিষদ ও ৩) পার্বত্য গণ পরিষদ।

গত ২৮/৯/০৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে আদি জনগোষ্ঠী সমন্বয় পরিষদের প্রদত্ত স্মারকলিপিতে তারা বিএনপি'র গুণগান করেছে এবং যথারীতি সন্তু লারমার অপসারণ দাবী করেছে। তার পাশাপাশি চাকমা ও মারমা জাতিদের বাদে কেবলমাত্র বাঙালীসহ অন্যান্য জাতিদের সকল অগ্রাধিকার প্রদানের দাবীও জানিয়েছে। সে সাথে শান্তিচুক্তি সংশোধন এবং আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ ভেঙে দেয়ার জন্য দাবী জানিয়েছে। আবার আবদার করেছে যেন ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ হতে অপসারণ করা না হয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো তারা নতুন করে সেনাক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের কথা বলেছে। শুধু তাই নয়, সাজেক ইউনিয়নে রাস্তা তৈরী করে রাস্তার উভয় পার্শ্বে চাকমা ও মারমা বাদে বাঙালীসহ পাংখু ও লুসাইদের আবাসন ও পুনর্বাসন প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসনের দাবী করা হয়েছে। এই স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর প্রদান করেন এল থাংয়া পাংখুয়া ও রনী মুরুং। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ঠিকানা দেখানো হয়েছে রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলা।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়েছে, "সুদীর্ঘ গত ২৩ বৎসর পার্বত্যাঞ্চলের শান্তিবাহিনী নামে উপজাতীয় সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের ভয়-ভীতিতে অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণভাবে জীবন অতিবাহিত করার পর এবং বর্তমান জাতীয়তাবাদী দলের সরকার ক্ষমতায় এবং আপনার মহান নেতৃত্বে ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার কারণে পার্বত্যবাসী সকল মানুষের জীবনে কিছুটা নিরাপত্তা ফিরে এসেছে বটে।"

এই স্মারকলিপি হতে স্পষ্ট যে, সাজেক ইউনিয়নের প্রত্যন্ত এলাকায় সেনাবাহিনী বাঙালী পুনর্বাসন করতে চায় এবং সেজন্য চাকমা মারমা বাদে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জুম্ম জাতিসমূহের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে চায়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে সেনাবাহিনীই সকল জাতির অধিকারহরণকারী। তাই এই ষড়যন্ত্র কখনো সফল হবে না। তাছাড়া তাদের দোসরদের সংশ্লিষ্ট জাতির কাছে কোন আবেদন নেই। এসকল পদলেহীরা নিজেদের যেমনি সর্বনাশ ডেকে আনছে তেমনি জুম্ম জাতির জন্য সর্বনাশ করতে সোচ্চার হয়েছে।

উক্ত তারিখে পার্বত্য বাঙালী ছাত্র পরিষদ ও পার্বত্য গণ পরিষদ নামে অপর দুটি সাম্প্রদায়িক ও দাঙ্গাবাজ সংগঠনও প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করেছে। পার্বত্য বাঙালী ছাত্র পরিষদ সকল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও ভেটেনারীতে অউপজাতীয় কোটার জন্য আবেদন করেছে। কিন্তু তার সাথে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড চেয়ারম্যান পদ হতে ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে অপসারণ না করারও আবেদন জানিয়েছে। তার পাশাপাশি সন্তু লারমার অপসারণ দাবী করেছে।

অপরদিকে পার্বত্য গণ পরিষদ মহালছড়িতে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনাকে জনসংহতি সমিতিকে জড়িত করে মিথ্যাচার করতে মোটেও লজ্জাবোধ করেনি। এমনকি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বনাম পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এর মধ্যে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টির অপচেষ্টা করেছে। তার সূত্র ধরে সন্তু লারমাকে চেয়ারম্যান পদ হতে অপসারণ করার দাবী জানিয়েছে।

ব্রিগেড অফিসের পকেট সংগঠনগুলো বিশেষ করে পার্বত্য গণ পরিষদ ও পার্বত্য বাঙালী ছাত্র পরিষদ সাম্প্রদায়িক উস্কানী, দাঙ্গা সৃষ্টি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশকে অশান্ত করার জন্য সেনাবাহিনীর গুটি হিসেবে কাজ করে চলেছে। তাদের জানা থাকা উচিত সেনাবাহিনীর ইন্ধনে ইউপিডিএফ বাঙালীদের অপহরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে আপনারা যদি পাহাড়ী-বাঙালীর সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে চান তবে সেনাবাহিনীর লেজুরবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে সেনাবাহিনীর মুখোশ উন্মোচন করুন। শুধু তাই নয়, বিএনপির একটি অংশের এহেন মদত প্রদান শুধু মাত্র বিএনপিকে দূর্বল করবে না, সার্বিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দেবে। অতীতে বিএনপির নাটের গুরু নাজিম উদ্দিন ব্রিগেড অফিসে বসে ছাত্রদলের কর্মীদের দিয়ে পার্বত্য ছাত্র পরিষদ করে কোন ফায়দা লুটতে পারেনি। বরং মনিস্বপন দেওয়ান এর সাবেক শান্তিবাহিনীর সদস্যকে নেতা মেনে নিয়ে ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট স্বাদ পাচ্ছেন। এখন ওয়াদুদ ভূঁইয়া তার স্থান দখল করে চলেছে। কিন্তু পরিণতি কোনমতেই শুভকর হবে না। কেননা সরিষার ভিতর ভূত রয়েছে। আজ ইউপিডিএফ এর মতো সন্ত্রাসী সংগঠনটির সাথে সেনাবাহিনীর নিবিড় সখ্যতা বজায় রয়েছে। তাই সেনাবাহিনী তাদের প্রয়োজনে ইউপিডিএফকে ব্যবহার করে বাঙালীদের রক্তে পরিস্থিতি উত্তেজনাকর করবে আর সুফল ভোগ করবে। □

প্র তি বে দ ন

সরকারের ইচ্ছেতেই আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদসমূহকে দুর্বল করে রাখা হয়েছে - সন্তু লারমা

পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ যে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, উন্নয়ন, আইন-শৃঙ্খলাসহ সকল ক্ষেত্রে চরম অরাজকতা চলছে তার জন্য দায়ী স্বয়ং সরকার। সরকার ইচ্ছে করলেই অতি সহজে এসব দূরীভূত করতে পারে। সরকারের ইচ্ছেতেই আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদসমূহকে দুর্বল করে রাখা হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদকে যথাযথভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। মহালছড়িতে পাহাড়ীদের উপর জঘন্য হামলার ঘটনা সংঘটিত করা হচ্ছে। ইউপিডিএফ-কে পরিস্থিতি অবনতির জন্য সরকারই ব্যবহার করছে। এসবই করানো হচ্ছে যাতে চুক্তি বাস্তবায়িত না হতে পারে। যাতে স্থানীয় পরিষদসমূহ কার্যকর হতে না পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বিরাজিত সমস্যা সরকার অতি সহজেই সমাধান করতে পারে এবং উন্নয়নের প্রকৃত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। দাতাগোষ্ঠীর উচিত সরকারকে একযোগে বলা যাতে সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন করতে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করে। চুক্তি বাস্তবায়ন ছাড়া কোন উন্নয়নই স্থায়ীত্ব পাবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের উন্নয়ন দরকার। এ উন্নয়নের স্বার্থে দাতাগোষ্ঠীকে কাজ করতে হবে।

গত ৩০ অক্টোবর ২০০৩ রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দ এবং দাতাগোষ্ঠীর মধ্যে অনুষ্ঠিত যৌথসভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এ বক্তব্য প্রদান করেন।

দিনের বিকাল বেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কনফারেন্স হলে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পর্বে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মণিস্বপন দেওয়ান। এই পর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি রূপায়ণ দেওয়ান। এছাড়া রিসোর্স পার্সন হিসেবে দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের ব্রিফ করেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ মানিক লাল দেওয়ান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মা ম্যা চিং, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জুলফিকার আলী। সভায় ইউরোপিয়ান কমিশন, ডানিশ এ্যাম্বেসী, অষ্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন, ডিএফআইডি, নেদারল্যান্ড এ্যাম্বেসী, ইউনেস্কো, ফাও, এডিবি, আইএফআরসি, ডব্লিউএফপি, ইউএনডিপি, আইএলও, কেয়ার এবং এমএসএফ-এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের চরম সমন্বয়হীনতা, দ্বৈততা, আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতিশীল পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে কথা উঠে আসে। দাতাগোষ্ঠী-পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের উপমন্ত্রী এব যুগ্ম সচিবকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করা হয় এসব সমাধানের প্রকৃত দায়িত্ব কার এবং কেন এসব হচ্ছে? উপমন্ত্রী মনিস্বপন দেওয়ান তার বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রুলস্ অব্ বিজনেস-এর ১৯টা দায়িত্ব পড়ে শোনান এবং স্বীকার করেন যে এসবই তার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। তিনি অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক শ্রী রূপায়ণ দেওয়ানকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট আপনাদেরকে বুঝতে হবে। ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে আপনাদের বন্ধুত্ব গড়তে হবে। দাতাগোষ্ঠীর প্রতি বলেন আমি উপমন্ত্রী দায়িত্বে আছি। আমার উপরে আমার মন্ত্রী হিসেবে রয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। উপমন্ত্রী হিসেবে আমার ক্ষমতাও কম। উল্লেখ্য যে, সিএইচটি ইন্সটিটিউশনসমূহের মধ্যে চীফ, হেডম্যান, কার্বারীদের (ট্রাডিশনাল ইন্সটিটিউশন) চুক্তি অনুযায়ী এখনো জেলা পরিষদের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়নি।

'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত নেতৃত্ব এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি'র উপর পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দ এবং দাতাগোষ্ঠীর মধ্যে আহূত যৌথসভা দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। দিনের সকাল বেলায় চাকমা সার্কেল চীফের রেসিডেন্স কম্পাউন্ডে সার্কেল চীফ ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম পর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর রিসোর্স পার্সন হিসেবে দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের ব্রিফ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি রূপায়ণ দেওয়ান, মং সার্কেল চীফ পাইহ্লা প্রু চৌধুরী, বোমাং সার্কেল চীফের প্রতিনিধি চৌহ্লা প্রু এবং খাগড়াছড়ি হেডম্যান এসোসিয়েশনের সভাপতি শক্তিপদ ত্রিপুরা।□

তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ প্রকল্প এবং শুভংকরের ফাঁকি

সম্প্রতি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় PMTC (Bangladesh) Ltd. কর্তৃক ক্ষুদ্রায়তন চা চাষের সম্ভাবনা যাচাইয়ের জন্য তিন পার্বত্য জেলা, উত্তর বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলায় বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক একটি সমন্বিত সমীক্ষা চালানো হয়। উক্ত সমীক্ষার সুপারিশ অনুসারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পৃষ্টপোষকতায় বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ প্রকল্প' (Small Holding Tea Cultivation in the Chittagong Hill Tracts) নামে পার্বত্য জেলাসমূহে যে চা চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সমীক্ষায় রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় মোট ৪৬,৮৭৫ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ করা যেতে পারে বলে অভিমত দেয়া হয়। উক্ত সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক প্রাথমিকভাবে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় এলাকায় ৪৬২.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই পাইলট প্রকল্পের আওতায় তিন পার্বত্য জেলায় প্রতি জেলায় ১০০ হেক্টর করে মোট ৩০০ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ করা হবে বলে পরিকল্পনা নেয়া হয়। কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে ৯.৫% সুদে চা চাষীদের ঋণ দেয়া হবে।

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদসহ পার্বত্যবাসীর অভিমত হচ্ছে, উক্ত ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ প্রকল্প পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উক্ত ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ প্রকল্পে আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের পরিবর্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসক, ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা রাখা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের যেমন - পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কোন ভূমিকা নেই। অথচ বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে যথাক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং চুক্তি মোতাবেক প্রণীত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ অত্রাঞ্চলের সকল উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করবে এবং জেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। অথচ এ যাবৎ উক্ত প্রকল্প উদ্বুদ্ধকরণ সভাসহ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। সার্বিকভাবে বলা যায় যে, এই ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ প্রকল্পে আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই প্রকল্পটির 'প্রকল্প ধারণা পত্র' (পিসিপি) অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ।

অপরদিকে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষের সাথে সরাসরি ভূমি ও ভূমি মালিকানা সম্পৃক্ত রয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভূমি কমিশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম প্রধান সমস্যা ভূমি বিরোধসমূহ এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের মধ্যে এখনো ৩,০৫৫ পরিবার নিজ জায়গা-জমি ফেরৎ পায়নি। এখনো প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের ৪০টি গ্রাম সেটেলার বাঙালীদের বেদখলে রয়েছে। অধিকন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা হয়নি। আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের শত শত একর জায়গা-জমি এখনো সেটেলারদের বেদখলে রয়েছে। এমতাবস্থায় ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ আরো জটিল আকার ধারণ করতে বাধ্য।

সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য যে, উক্ত চা চাষ প্রকল্পের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক আমলের নীল চাষের মতো অভীষ্ট চা চাষীরা ক্রীতদাসে পরিণত হবে। কেননা চাষীরা চা পাতা উৎপাদনের অধিকারী হলেও চা প্রক্রিয়াকরণ ও চা বিপণনের ক্ষেত্রে চাষীদের কোন হাত থাকবে না। ফলে চাষীদের উৎপন্ন সবুজ চা পাতার দাম সম্পূর্ণতঃ কারখানা মালিকদের উপর নির্ভর করবে। বর্তমানে ফলজ বাগান চাষীদের মতো পানির দামে তাদের সবুজ চা পাতা বিক্রয় করতে বাধ্য হবে। এতে করে কৃষকরা ঋণগ্রস্ত হয়ে সর্বশান্ত হয়ে পড়বে।

তাই ভূমি কমিশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী এবং আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের যথাযথ পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন বাস্তবায়ন তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ প্রকল্প স্থগিত রাখার জন্য পার্বত্য অধিবাসীদের পক্ষ থেকে দাবী জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে গণমুখী ও সুষম উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এ যাবৎ যা কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে তার অধিকাংশই এতদাঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীদের আশা-আকাঙ্খা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। □

দক্ষিণ আফ্রিকায় ৫ম ওয়ার্ল্ড পার্ক কংগ্রেসে জনসংহতি সমিতি প্রতিনিধির যোগদান

গত ৮ সেপ্টেম্বর হতে ১৭ সেপ্টেম্বর'২০০৩ দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান শহরে অনুষ্ঠিত প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ এবং আদিবাসী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ৫ম 'ওয়ার্ল্ড পার্ক কংগ্রেসে' প্রথম বারের মত পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের পক্ষ থেকে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি হিসেবে সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য গৌতম কুমার চাকমাও অংশগ্রহণ করেছেন। এতে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের পরিবেশ সংশ্লিষ্ট ন্যায্য অধিকারের কথা তুলে ধরে বিভিন্ন প্রস্তাব রাখেন এবং তাঁর প্রস্তাব কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত সুপারিশমালায় অন্তর্ভূক্ত হয়।

উল্লেখ্য, ৮ সেপ্টেম্বর হতে ১০ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে শুরুর পূর্বে ৬ সেপ্টেম্বর ও ৭ সেপ্টেম্বর ডারবানের ব্লু ওয়াটার্স হোটেলে বিভিন্ন দেশের আদিবাসী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের দুইদিনব্যাপী এক প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেন। প্রস্তুতি সভায় আলোচনাকালে বিশেষত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার আদিবাসী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিগণ স্বীয় দেশের স্ব স্ব অঞ্চলের আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার ও মানবাধিকার হরণ করে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের protected area যেমন- সংরক্ষিত বনাঞ্চল, পার্ক এবং সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন। তাই ভবিষ্যতে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে আদিবাসী স্বার্থ ক্ষুন্ন করে যাতে আর কোন প্রকার protected area করা না হয় সে জন্য আদিবাসীদের পক্ষ থেকে জোরালো বক্তব্য উত্থাপন করা হয়। উক্ত প্রস্তুতিমূলক সভায় জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি আদিবাসীদের ন্যায্য অধিকারকে পদদলিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংরক্ষিত বনাঞ্চলসহ বাংলাদেশের অপরাপর আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ইকো পার্ক তৈরী এবং বনায়নের ক্ষেত্রে বিশেষত ভূমি অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন এবং অপরাপর আদিবাসীদের বক্তব্যে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এই সভায় আদিবাসী প্রতিনিধিদের কর্তৃক 'আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং সংরক্ষিত এলাকা' বিষয়ে 'খসড়া সুপারিশমালা' গৃহীত হয়।

তবে কংগ্রেসের মূল অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয় ৮ সেপ্টেম্বর 'ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস সেন্টার'-এ। উদ্বোধন করেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট থাবো এমবেকি। এতে আরো বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা এবং জর্ডানের রাণী নূর। নেলসন ম্যান্ডেলা তাঁর বক্তব্যে সংরক্ষিত এলাকা সৃজন এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যুব শক্তিকে সংশ্লিষ্ট করার আহ্বান জানান।

৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সকাল ৯টা হতে ১২টার মধ্যে ৫ম ওয়ার্ল্ড পার্ক কংগ্রেসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত হয় সিম্পোজিয়াম। এতে বিভিন্ন নির্বাচিত বিশেষজ্ঞগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের বিভিন্ন প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ১০ সেপ্টেম্বর সকালেও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। এতেও নির্বাচিত বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং উভয় সিম্পোজিয়ামে কিছু নির্বাচিত বিশেষজ্ঞ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন। ১০ সেপ্টেম্বর বিকেলে ওয়ার্কশপ এর Streams (Theme বা বিষয়বস্তু) এর উপর দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। ১১, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন Stream এর আলোকে ওয়ার্কশপ। ১৩ সেপ্টেম্বর বিকেলে ওয়ার্কশপ শেষে 'Indigenous peoples and protected Areas' এর উপর বিভিন্ন বিষয়ে ৩২টি সুনির্দিষ্ট 'সুপারিশমালা' কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয়। যাতে অনেক সাধারণ বিষয় ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের মত সংঘাত পরবর্তী সংরক্ষিত এলাকাগুলোর পুনর্গঠনের বিষয়টি স্থান পায়। সুপারিশমালার পাশাপাশি একই সময়ে কংগ্রেস কর্তৃক Durban Accord (ডারবান চুক্তি), Durban Action Plan (ডারবান কার্যপরিকল্পণা), Message to the convention on Biological Diversity, Emerging Issues ইত্যাদি দলিলও গ্রহণ করা হয়। ১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় Protected Areas এর বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মশালা। ১৬ সেপ্টেম্বর সকালে 'সংরক্ষিত এলাকার জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব' এবং বিকেলে আফ্রিকার বিষয়ে আলোচনা হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের ফলাফল বিষয়ে সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং কংগ্রেসে গৃহীত সুপারিশমালা ও অন্যান্য গৃহীত দলিলপত্রাদি অনুমোদিত হয়।

উল্লেখ্য, ওয়ার্ল্ড পার্ক কংগ্রেস সাধারণতঃ প্রতি দশ বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়। সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক World Conservation Union ('বিশ্ব সংরক্ষণ ইউনিয়ন' সংক্ষেপে IUCN) নামের এক সংগঠন এই কংগ্রেসের আয়োজন করে। এই IUCN আবার 'বিশ্ব ব্যাংক' ও অন্যান্য কয়েকটি সংস্থার ফান্ড গ্রহণ করে। এর রয়েছে বিশ্বব্যাপী আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক। □

আ ন্ত র্জা তি ক

ফিলিপাইনে জুম্ম এবং ইগোরোত ইস্যু নিয়ে আলোচনা ফোরাম অনুষ্ঠিত

২৪ অক্টোবর ২০০৩ ফিলিপাইনের কোর্ডিলেরা (Cordillera) অঞ্চলের অন্যতম প্রধান শহর বাগিও সিটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কোর্ডিলেরা পিপলস এ্যালায়েন্স (সিপিএ) ও টেবটেবা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জুম্ম জনগণ এবং কোর্ডিলেরা অঞ্চলের ইগোরোত (Igorot) জনগণের আন্দোলন ও সমস্যা সম্পর্কে এক আলোচনা ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফোরামে দুই দেশের দুই আদিবাসী জনগণের ইতিহাস, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন, দুই জাতিরাষ্ট্রে তাদের অবস্থান ও বিরাজমান দমন-পীড়নের উপর বিশদ আলোচনা করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা এবং টেবটেবা ফাউন্ডেশনের অন্যতম সংগঠক মিঃ সালভাদর রামো আদোর। অপরদিকে কোর্ডিলেরা অঞ্চলের ইগোরোত জনগণের ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন কোর্ডিলেরা পিপলস এ্যালায়েন্সের মহাসচিব মিঃ উইন্ডেল বাংগুয়েট এবং সাপ্তাহিক নর্ডিস পত্রিকার বিশিষ্ট কলাম লেখক এবং আদিবাসী অধিকার কর্মী এ্যাডভোকেট আর্থার। আলোচনা ফোরামে সিপিএ, টেবটেবা ফাউন্ডেশন, সাপ্তাহিক নর্ডিস, ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইন্ডিজিনাস পিপলস ইন দ্যা ফিলিপাইন (ক্যাম্প), কোর্ডিলেরা উইমেন্স এডুকেশন এন্ড রিসার্স সেন্টার, সিপিএ'র ইয়ুথ ফ্রন্ট, ইউনাইটেড চার্চ অব খ্রিষ্ট ইন দ্যা ফিলিপাইন (এনএলজে), মালেক্সসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনার শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে প্রথমে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন টেবটেবা ফাউন্ডেশনের সালভাদর রামো আদোর এবং মূল বক্তব্য প্রদান করেন জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা। মঙ্গল কুমার চাকমা প্রাক-ঔপনিবেশিক, ব্রিটিশ, পাকিস্তান এবং অধুনা বাংলাদেশের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অবস্থান, আন্দোলন ও সমস্যাদি তুলে ধরেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও চুক্তি বাস্তবায়নের পরিবর্তে সরকার কর্তৃক চুক্তি লঙ্ঘন করা, জুম্মদের উপর একের পর এক সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো, অব্যাহতভাবে সেনা শাসন বলবৎ থাকা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

এরপর কোর্ডিলেরা অঞ্চলের ইগোরোত জনগণের আন্দোলন-সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন সিপিএ'র মহাসচিব মিঃ উইন্ডেল বাংগুয়েট। তিনি বলেন যে, সমগ্র পিলিপাইনে অন্ততঃ ৬২টি আদিবাসী জাতির বাস রয়েছে। তন্মধ্যে কোর্ডিলেরা অঞ্চলে Ifugao, Bontoc, Kankanaey, Yapayao, Kalinga, Ibaloy, Tingian এবং Isneg প্রভৃতি অন্নতঃ ৮ ভাষাভাষি আদিবাসী জাতির বসবাস রয়েছে। কোর্ডিলেরা অঞ্চলের এসকল জাতিসমূহকে একত্রে 'ইগোরোত' নামে সমধিক অভিহিত করা হয়। তিনি বলেন, 'ই' অর্থ 'হতে' এবং 'গোরোত' অর্থ 'পর্বত'। অর্থাৎ ইগোরোত অর্থ পর্বতবাসী। ফিলিপাইনের সংবিধানে আদিবাসীদের অধিকার স্বীকৃত হলেও এবং ১৯৯৭ সালে আদিবাসী অধিকার আইন প্রণীত হলেও তার কোন বাস্তবায়ন নেই। আদিবাসী অধিকার আইনে আদিবাসী জনগণের ভূখন্ড, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তাদের অধিকার (ancestral domain) স্বীকৃত দেয়া হয়েছে। কিন্তু অপরপক্ষে দেশে বিদ্যমান খনিজ আইনের মাধ্যমে আদিবাসীদের উল্লেখিত ancestral domain-এর কর্তৃত্বকে খর্ব করা হয়েছে। খনিজ আইনের বদৌলতে সরকার আদিবাসীদের যে কোন ভূখন্ড যে কোন মুহূর্তে হুকুমদখল করে মাইনিং কোম্পানীর নিকট খনিজ দ্রব্য (যেমন স্বর্ণ, রূপা, কয়লা ইত্যাদি) উত্তোলনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ইজারা দিতে পারে। তিনি আরো বলেন, এভাবে মাইনিং কোম্পানীর নিকট আদিবাসী ভূখন্ড ইজারা দেয়া এবং খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের ফলে আদিবাসীদের আবাসস্থল ও জীবনযাত্রা এবং আদিবাসী ভূখন্ডের প্রাকৃতিক পরিবেশের মারাত্মক বিরূপ প্রভাব বিস্তার করছে। আদিবাসীদের হাজার হাজার হেক্টর ভূখন্ড এখন বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে। এছাড়া আধিবাসী অধ্যুষিত পর্বত এলাকায় জলবিদ্যুৎ বাঁধ দেয়ার ফলে আদিবাসীদের জাতীয় অস্তিত্ব ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিপন্ন করে তুলেছে।

তিনি আরো বলেন, ফিলিপাইন সরকার আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে দমনের জন্য আদিবাসী অধ্যুষিত প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপক ভিত্তিক সামরিকীকরণ করেছে। এতে করে আদিবাসী জনগণের উপর সামরিক দমন-পীড়ন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। তিনি আরো বলেন, ফিলিপিনো জনগণের লড়াকু সংগঠন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অব ফিলিপাইন (এনডিএফপি)-এর সাথে পিলিপাইন সরকারের মধ্যে শান্তি সংলাপ চলছে। এই সংলাপের ধারাবাহিকতায় সরকারের সাথে এনডিএফপি-এর মধ্যে ১৯... সালে কম্প্রেহেনসিভ এগ্রিমেন্ট সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত চুক্তি সরকার অব্যাহতভাবে লঙ্ঘন করে চলেছে বলে তিনি জানান।

পরিশেষে কোর্ডিলেরা অঞ্চলে আদিবাসী জনগণসহ মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আন্দোলনরত বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন এবং মহালছড়িতে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নিকট যৌথভাবে পত্র করা এবং ভবিষ্যতে এই আলোচনা ফোরাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে আলোচনা ফোরাম সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।□

থাইল্যান্ডে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন বিষয়ে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের কর্মশালা

গত ২৭-২৮ অক্টোবর থাইল্যান্ড এর ব্যাংককে অবস্থিত জাতিসংঘ দপ্তরে United Nations Economic and Social Commission for Asia and The Pacific (UNESCAP) কর্তৃক আয়োজিত এবং United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA) এবং UNDP এর সহায়তায় Regional Implementation Meeting for Asia and the Pacific on Water & Sanitation and Human Settlement এবং ২৯-৩১ অক্টোবর ২০০৩ 'National Sustainable Development Strategies for Asia and the Pacific' এর উপর পৃথক দুটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশসমূহের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও প্রতিটি মেজর গ্রুপের একজন করে পাঁচটি মেজর গ্রুপের (Farmers, NGOs, Trade Union, Business and Industries এবং Indigenous Peoples) প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করে। এ কর্মশালায় মেজর গ্রুপ 'Indigenous Peoples' এর প্রতিনিধিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে শ্রী মৃণাল কান্তি ত্রিপুরা।

প্রথম মিটিংয়ের উদ্দেশ্য ছিল ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডে জেনেরো'তে গৃহীত টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ বিষয়ক কর্ম পরিকল্পনা এজেন্ডা ২১ ও ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত World Summit on Sustainable Development (WSSD) এ গৃহীত Johannesburg Plan of Implementation এর (JPOI) ভিত্তিতে গত ২০০০ সালে ঘোষিত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এর একটি এবং কমিশন অন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এর ১২তম সেশনের মূল থিম 'ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন এবং হিউম্যান সেটেলমেন্ট' এর বাস্তবায়নে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশসমূহের অবস্থা, এচিভমেন্ট এবং চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা এবং এর ভিত্তিতে প্রধান ইস্যুসমূহ নির্ধারণ করা।

প্রথম কর্মশালার আলোচনায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি তার রিপোর্টে কেবলমাত্র পানীয় জল ও ল্যাট্রিন বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রতিনিধি মৃণাল কান্তি ত্রিপুরা বলেন যে, পানি শুধু খাবার বিষয় নয়। পানির সাথে আদিবাসীদের জীবন নিবিড়ভাবে জড়িত। কাজেই পানির ব্যবহার প্রসঙ্গটি যেন আদিবাসীদের জীবনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা, কাপ্তাই হ্রদের পানি দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করা হয়েছে।

এছাড়া হিউম্যান সেটেলমেন্ট বিষয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা কেবলমাত্র নগরের বস্তি সমস্যা তুলে ধরে তার সমাধানের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। কিন্তু শুধুমাত্র নগরের বস্তি নয়; উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে এবং সরকারী উদ্যোগে রাজনৈতিক অভিবাসনের কারণে বিভিন্ন দেশের আদিবাসীরা নিজ পৈতৃক ভিটেমাটি থেকে যে উচ্ছেদ হয়েছে এবং হচ্ছে সে বিষয়টিও হিউম্যান সেটেলমেন্ট আলোচনায় আসা উচিত বলে মৃণাল কান্তি ত্রিপুরা অভিমত প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে কাপ্তাই বাঁধ এবং পপুলেশন ট্রান্স মাইগ্রেসনসহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলে আদিবাসীদের বাস্তুভিটাচ্যুত হবার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয় কর্মশালার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ন্যাশনাল সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট স্ট্রাটেজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে ত্বরান্বিত করা এবং এ উদ্দেশ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি করা, অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময় করা এবং দেশীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা কাঠামো নির্ধারণ করা।

উপরোক্ত দুটি কর্মশালায় দেশসমূহের প্রতিনিধিরা তাদের নিজ নিজ দেশের অবস্থা তুলে ধরে, বিভিন্ন ইন্টার গভর্ণমেন্টাল অর্গানাইজেশন, জাতিসংঘ বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ এবং মেজর গ্রুপের প্রতিনিধিরাও প্যানেল আলোচনায় তাদের অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে এবং পরামর্শ প্রদান করে। এতে মৃণাল কান্তি ত্রিপুরা স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নে আদিবাসী জ্ঞান ও প্রথার স্বীকৃতি প্রদানসহ সকল কার্যক্রমে আদিবাসীদের সমভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দাবী জানান। এতে মেজর গ্রুপের প্রতিনিধিরা জাতীয় পর্যায়ের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জোর দাবী জানায়।

এ দুটি কর্মশালার ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত রিপোর্টটি জাতিসংঘ কমিশন অন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের ১২তম সেশনের জন্য প্রেরণ করা হবে। □

সেনাবাহিনী কর্তৃক মহালছড়ির ক্ষতিগ্রস্তদের ঘর নির্মাণ

১১ অক্টোবর ২০০৩ হতে সেনাবাহিনীরা মহালছড়ি সাম্প্রদায়িক হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের ঘরবাড়ী নির্মাণ শুরু করেছে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত জুম্ম গ্রামবাসীরা সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মাণাধীন ঘরবাড়ী গ্রহণ করছে না বলে জানা গেছে। উক্ত দিনে সেনা সদস্যরা গাছ, বাঁশ ও ঢেউটিন নিয়ে লেমুছড়ি গ্রামে গিয়ে বিতরণ করতে গেলে গ্রামবাসীরা গাছ, বাঁশ ও টিন কোনকিছু গ্রহণ করেনি। ফলে তারপর দিন থেকে সেনা সদস্যরা সেটেলার মজুর নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের জন্য ১২ ফুট প্রস্থ ১৬ ফুট দীর্ঘ সম্পন্ন ঘরবাড়ী নির্মাণ করে দিচ্ছে বলে জানা গেছে। কিন্তু এখনো ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মরা সেসব ঘরবাড়ী গ্রহণ করছে না।□

সিঙ্গিনালার বাজারটি সেনাবাহিনী বন্ধ করে দিয়েছে

মহালছড়িতে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা হওয়ার পর জুম্মরা মহালছড়ি বাজার বর্জন করে চলেছে। পাশাপাশি দ্রব্যসামগ্রী বেচাকেনার জন্য স্থানীয় লোকদের উদ্যোগে সিঙ্গিনালায় একটি বিকল্প বাজার বসানো হয়েছে। কিন্তু সেনাবাহিনী উক্ত বাজার বন্ধ করে দিয়েছে বলে জানা গেছে। এলাকাবাসীর অভিমত হচ্ছে যে, এলাকার জনগণের সুবিধার্থে তারা যেখানে ইচ্ছে সেখানে বাজার স্থাপন করতে পারে। এটা তাদের একটি মৌলিক অধিকার। এ অধিকারকে হরণ করে সেনাবাহিনী বাজার বন্ধ করে দেয়ায় স্থানীয় জুম্মদের মধ্যে চরম অসন্তোষ ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া হাট-বাজার বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত একটি বিষয়। সাধারণ প্রশাসনের কার্যক্রমের উপর সেনাবাহিনীর ন্যাক্কারজনক হস্তক্ষেপের ফলে সেনাবাহিনীর প্রতি জনগণের মধ্যে অধিকতর পরিমাণে বিরূপ ধারণা গড়ে উঠছে। □

জুম্ম শরণার্থীদের সড়ক অবরোধের মুখে রেশন প্রদান ও পুনর্বাসনে সরকারের সম্মতি

গত ১৩ অক্টোবর ২০০৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি খাগড়াছড়িতে ডাকা লাগাতার সড়ক অবরোধ কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নিয়েছে। মূলতঃ এদিন বিকেলে সরকারের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের রেশন প্রদান অব্যাহত রাখতে ও পুনর্বাসন করতে সম্মতি প্রদানের কথা জানতে পেরেই শরণার্থী কল্যাণ সমিতি তার এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

এদিন জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক সন্তোষিত চাকমা বকুল স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রধানমন্ত্রীর এই সম্মতি ও সমিতির সড়ক অবরোধ প্রত্যাহারের কথা জানানো হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, আজ ১৩ অক্টোবর ২০০৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদককে টেলিফোনে জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের জন্য রেশন(চাল) প্রদান অব্যাহত রাখতে এবং অবিলম্বে পুনর্বাসন করতে সম্মত হয়েছেন। তাছাড়া শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের সাথে সাক্ষাৎ করলে জানতে পারেন যে, জুম্ম শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিয়মিত রেশন(চাল) প্রদান করা হবে এবং সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেয়া হবে। তাই সমিতি 'লাগাতার সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করে নিল' বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

উল্লেখ্য, গত ২৯ আগষ্ট ২০০৩ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক সংবাদে সরকার কর্তৃক জুম্ম শরণার্থীদের রেশন বন্ধ করার কথা জানতে পারলে জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি এর প্রতিবাদে এবং শরণার্থীদের রেশন চালু ও পুনর্বাসনের দাবীতে প্রথমে সভা-সমাবেশ ও প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রেরণ করে। পরে ১৪ অক্টোবর ২০০৩ হতে একই দাবীতে লাগাতার সড়ক অবরোধের ডাক দেয়। □

ইউপিডিএফ ২ বাঙালী জেলে হত্যা করেছে

গত ৬ অক্টোবর রাঙামাটি সদর থানার বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়নের খারিক্ষ্যং এলাকায় ইউপিডিএফ কর্তৃক একজন বাঙালী জেলেকে খুন ও অপর একজনকে মারাত্মকভাবে আহত করা হয়েছে। এ নিয়ে সাম্প্রদায়িক মহল প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত না করে পাহাড়ীদের উপর নগ্নভাবে সাম্প্রদায়িক হামলার উস্কানি দিয়ে পরিস্থিতিকে নাজুক করে তুলবার চেষ্টা করেছে। বাঙালী ছাত্র পরিষদ উগ্র ও সাম্প্রদায়িক শ্লোগান দিয়ে গোটা রাঙামাটি শহরে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। তার পরদিন তারা জেলা প্রশাসকের অফিসের চত্বরে গুটিকয়েক লোকের সমাবেশ করে বিভিন্ন উত্তেজনাকর, সাম্প্রদায়িক বক্তব্য প্রদান করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিলের দাবী জানিয়েছে।

কিন্তু খারিক্ষ্যং এলাকার লোকজনের সাথে আলাপে জানা যায় যে, এই সন্ত্রাসী ঘটনাটি ইউপিডিএফ কর্তৃক সংঘটিত হয়েছে। কুতুকছড়ি এলাকা থেকে টেম্পো বোটযোগে একদল ইউপিডিএফ সশস্ত্র সদস্য খারিক্ষ্যং এলাকায় আসে। এরপর তারা নৌকাযোগে বিভিন্ন জেলেদের উপর চাঁদাবাজি করতে শুরু করে। তারপর তারা যে দুজন বড়শি দিয়ে মাছ শিকারকারী জেলেদের নাগাল পায় তাদেরকে চিনতে পারে। তারা দীর্ঘদিন ধরে সন্দেহ প্রকাশ করছিল যে, কিছুদিন আগে সেনাবাহিনীর সাথে হঠাৎ সশস্ত্র সংঘর্ষের আড়ালে এই দুজন জেলে জড়িত ছিল। ইউপিডিএফ তাদের কাছ থেকে পূর্বে চাঁদা আদায় করায় তারা ইউপিডিএফএর নাম না বলে উপজাতীয় সন্ত্রাসী বলে ক্যাম্পে রিপোর্ট দিয়েছিল। তখন আর্মীরা হ্রদে টহল জোরদার

করেছিল এবং ইউপিডিএফ এর সাথে ভুল বোঝাবুঝির কারণে উভয়ের মধ্যে গুলী বিনিময় ঘটে। এতে ইউপিডিএফরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই তারা এদুজন জেলের উপর খুব চটে ছিল। আর সেদিন তাদের নাগাল পেয়ে তারা কোন বাছ বিচার না করে তাদের উভয়কে হত্যা করার চেষ্টা চালায়।

পরে বন্দুকভাঙ্গার মুরুব্বীরা খারিক্ষ্যং ক্যাম্পের কমান্ডারের সাথে এ বিষয়ে আলাপ করার জন্য গেলে তারা তাকে বলে যে, ইউপিডিএফ সদস্যরা উক্ত জেলেদের হত্যা করেছে। এতে স্থানীয় লোকজনের কোন হাত নেই। শুধু তাই নয়, কোন জেলের সাথেও বাঙালী জেলেদের বিরোধ ছিল না। তাছাড়া তাদের পরস্পরের মধ্যেও কোন বিরোধ লোকজন দেখতে পায়নি বলে জানান। এসকল জেলেদের সাথে স্থানীয় জুম্মরা প্রায়ই পরিচিত। কিন্তু ক্যাম্প কমান্ডার তাদের মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলে যে, স্থানীয় জুম্মরা তাদেরকে হত্যা করেছে। তখন মুরুব্বীরা বলে যে, স্বয়ং বেঁচে যাওয়া জেলেটি বলেছে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে এবং তার বন্ধুকে হত্যা করেছে। তখন ক্যাম্প কমান্ডার রেগে যান এবং ইউপিডিএফ এই ঘটনায় জড়িত নয় বলে বারবার মুরুব্বীদের বোঝাবার চেষ্টা করেন।

সচেতন মহল মনে করে যে, বন্দুকভাঙ্গা এলাকাসহ গোটা নানিয়ারচর থেকে জনগণের প্রতিরোধের মুখে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী চক্র উৎখাত হওয়ার পর এলাকায় অশান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এবং এতে আর্মীদের অপারেশন চালানোর পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য তারা এই হত্যাকান্ডটি সংঘটিত করেছে। আর এই সুযোগে তারা যে উৎখাত হয়েছে সেই অবস্থাকে ঢেকে ফেলা ও সাহস জাহির করে সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় জনগণকে ভয় দেখানোর সুযোগ সৃষ্টির জন্য এসকল কাজ করে চলেছে। কিন্তু জনগণকে ধোকা দিতে পারেনি বলে ইউপিডিএফ বা সেনাবাহিনী উভয়েই তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে পারেনি।□

ইউপিডিএফ এর ভাড়াটিয়া সাংবাদিক

মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে কাউখালী উপজেলার কতিপয় সাংবাদিক ইউপিডিএফ এর পক্ষে সংবাদ প্রচার করছে বলে জানা গেছে। এই সাংবাদিকরা হলেন- আজকের কাগজ এর প্রতিনিধি ওমর ফারুক ও দৈনিক পূর্বকোণের সংবাদদাতা জসীম উদ্দিন। তারা ঘিলাছড়ি জুনিয়র হাই স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি অনিমেষ চাকমার সাথে যোগাযোগ করে এই লেনদেন করে আসছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনিমেষ চাকমার বাড়ী হলো ঘাগড়া ইউনিয়নের তালুকদার পাড়ায়। □

মহালছড়িতে মিথ্যা মামলায় জুম্মরা হয়রানির শিকার

প্রায় দুই মাস আগে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মহালছড়িতে সেটেলার বাঙালী ও স্থানীয় কতিপয় ব্যবসায়ীদের কর্তৃক জুম্মদের শত শত ঘরবাড়ী লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, নারী ধর্ষণ ঘটনার পর সেই সব দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার না করে এখন আবার উল্টো বিভিন্ন মিথ্যা মামলা দিয়ে জুম্মদের নানাভাবে হয়রানি ও ঘরছাড়া করবার পাঁয়তারা করা হচ্ছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মরা একদিকে মানবেতর জীবনযাপন করছে, অপরদিকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত ৬ অক্টোবর ২০০৩ রীনা মজুমদার স্বামী- মৃত বাদল মজুমদার, সাং- বাবুপাড়া এবং অর্জুন চৌধুরী পীং- মৃত দুলাল চৌধুরী, সাং- পাহাড়তলী উভয়ে বাদী হয়ে পৃথক পৃথকভাবে যথাক্রমে ১৭ জন ও ২৬ জন জুম্মর বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। মামলার এজাহারে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জুম্মদের বিরুদ্ধে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রকৃত দোষীদের আড়াল করবার জন্য এবং জুম্মদের স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করে তাদের জায়গা-জমি বেদখল করবার ষড়যন্ত্র হিসেবেই একটি মহল জুম্মদের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা মামলা করাচ্ছে। □

লংগদুতে সেনাবাহিনী বেপরোয়া গুলী ও সেটেলারদের লুটপাত

২৩ অক্টোবর বেলা ১ টায় লংগদুর রাঙাপানি ছড়া ও ভূইয় আদামের মাঝামাঝি বিলে সেনাবাহিনী বেপরোয়াভাবে গুলী চালিয়ে একজন ছাত্রকে আহত করেছে ও সেটেলার বাঙালীরা লুটপাত করেছে। তারা আহত ব্যক্তিসহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে। আহত ব্যক্তিটি হলেন লংগদুর আল রাবেতা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র গোপালাল চাকমা (১৮), পিতা- কিদিলাল কার্বারী, সাং- দাদীপাড়া। তার কাছ থেকে ঘড়িও কেড়ে নেয়া হয়। গ্রেফতারকৃত অপর ব্যক্তিটি হলেন- অনিল চাকমা (২২), সাং- রাঙাপানি ছড়া, লংগদু।

সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় সেটেলার বাঙালীরা এই এলাকার বড়াদম গ্রামের জুম্মদের কয়েকটি ঘরবাড়ীও লুটপাত করেছে। বিমল কান্তি চাকমা, পিতা- কদেয়্যে চাকমা, বড়াদম এর বাড়ী হতে ১১ হাজার টাকা, কাপড় চোপড়, জুতা লুট করা হয়। যোজন্যা চাকমা (৭০),সাং- বড়াদম এর বাড়ী হতে ২৮০ টাকা এবং মতিলাল চাকমা (৩৯), পিতা- রাঙা চাকমা, সাং- ঐ, এর বাড়ী হতে ১টি পিনোন ও ১টি খাদি লুট করা হয়। □

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কমিটি গঠিত

২৭ অক্টোবর ২০০৩ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকসু ভবনের ৩য় তলায় বেলা ২ ঘটিকার সময়ে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক মিথিলা তালুকদারের সভাপতিত্বে প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির সভাপতি হলেন মিথিলা তালুকদার এবং সম্পাদক হলেন ফ্লোরিতা তালুকদার। অপরাপর সদস্যরা হলেন সহসভাপতি সমাপ্তি চাকমা ও উমেচিং মারমা, সহ-সাধারণ সম্পাদক সঙ্গীতা চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক মিমিচিং মারমা, অর্থ সম্পাদক বৈশাখী ত্রিপুরা, দপ্তর সম্পাদক নীতু চাকমা, তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মাশৈখে মারমা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক হ্যাপী চাকমা, সদস্য স্মরণিকা খীসা, সাইংকিং মারমা, এমিথিং মারমা, এমি লুসাই, জয়া চাকমা।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্মরণিকা খীসা এবং উপস্থাপনা করেন মিমিচিং মারমা। এতে বক্তব্য রাখেন পিসিপির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক চঞ্চু চাকমা, ক্যক্য মং, আনন্দ জ্যোতি চাকমা, মংসিংঞো মারমা, উদ্ভাসন চাকমা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক পরানী চাকমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। শেষে নবগঠিত কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান পরানী চাকমা। □

সেটেলার বাঙালী কর্তৃক এক নিরীহ জুম্ম খুন

গত ২ অক্টোবর ২০০৩ খাগড়াছড়ি জেলাধীন মানিকছড়ি উপজেলার মঙ্গলীপাড়ায় নিজের জমির জন্যই সেটেলার বাঙালীর হাতে খুন হয়েছে এক নিরীহ জুম্ম। নিহত ব্যক্তির নাম- ক্যউজাই মারমা পীং-পাইশে মহাজন (গ্রাম সরকার প্রধান)। হত্যাকারী সন্ত্রাসী সেটেলাররা হল- ১. মোঃ সেন্টু, ২. মোঃ জাকির, ৩. মোঃ জাহাঙ্গীর এবং আরো অজ্ঞাত কয়েকজন। এরা সবাই মানিকছড়ি ও গচ্ছাবিল সেটেলার গুচ্ছগ্রামের বাসিন্দা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, উক্ত সেটেলার বাঙালীরা প্রথমে ক্যউজাই মারমার বন্দোবস্তীকৃত প্রায় ৩ কানি টিলা জমিতে মালিকের সাথে কোন আলাপ-আলোচনা ছাড়াই কচু চাষ করার উদ্যোগ নেয়। ঘটনাটি জানতে পেরে ক্যউজাই মারমা সেটেলারদের কর্তৃক এই অন্যায় উদ্যোগে বাধা দেয়। কিন্তু সেটেলাররা মালিকের কোন কথা না শুনে জোর করেই তাদের কাজ অব্যাহত রাখে। শুধু তাই নয়, গত ২ অক্টোবর ২০০৩ রাত প্রায় ১২ টায় সন্ত্রাসী সেটেলারদের একটি দল আগ্নেয়াস্ত্রসহ দরজা ভেঙে ক্যউজাই মারমার ঘরে প্রবেশ করে। সন্ত্রাসীরা প্রথমে তার স্ত্রীকে বিছানার লেপ দিয়ে ঝাপটে ধরে এবং মুখ চেপে ধরে। সাথে সাথে ক্যউজাই মারমাকে বেধে ঘর থেকে টেনে হেঁচড়ে বের করে এবং বাড়ী হতে আনুমানিক ৭৫ গজ দূরে কচুক্ষেতে নিয়ে গিয়ে দা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। হত্যা করে চলে যাবার সময় সন্ত্রাসী সেটেলাররা দুই রাউন্ড ফাঁকা গুলীও ছোঁড়ে। □

আরসি চেয়ারম্যানের সাথে ইসি'র রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশে ইউরোপিয়ান কমিশন (ইসি)-র রাষ্ট্রদূত এবং কমিশনের ডেলিগেশন প্রধান মিঃ এসকো কেনশিঙ্গকি ৩১ অক্টোবর ২০০৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের (আরসি) চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার সাথে তাঁর অফিস কক্ষে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের সময় মিঃ এসকো কেনশিঙ্গকি'র সাথে ইউরোপিয়ান কমিশনের উন্নয়ন উপদেষ্টা মিঃ গ্রাহাম টাইরি এবং শ্রী লারমার সাথে পরিষদের সদস্য শ্রী রূপায়ণ দেওয়ান উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকারের সময় আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রী লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন, মহালছড়িতে সেনাবাহিনীর সহায়তায় সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্ম গ্রাম হামলা ইত্যাদি বিষয়ে ইউরোপিয়ান কমিশনের রাষ্ট্রদূতের কাছে তুলে ধরেন। ইসি'র রাষ্ট্রদূত পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে পারে না।

ইউরোপিয়ান কমিশনের রাষ্ট্রদূত মিঃ এসকো কেনশিঙ্গকি ৩১ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর ২০০৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎকারের পরদিন তিনি মহালছড়িতে সেনাবাহিনীর সহায়তায় সেটেলার বাঙালী কর্তৃক ১৪টি জুম্ম গ্রাম হামলার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনে যান। পরিদর্শন কালে ইউএনডিপি'র পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ফ্যাসিলিটি'র কর্মকর্তারা ইসি'র রাষ্ট্রদূতকে গাইড করেন। □

সেনাবাহিনী ও সেটেলারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করায় সেনাবাহিনী কর্তৃক মারধর

১ নভেম্বর ২০০৩ ইউরোপিয়ান কমিশনের রাষ্ট্রদূত মিঃ এসকো কেনশিঙ্গকি-এর নিকট মহালছড়িতে ১৪টি জুম্ম গ্রামে হামলার ঘটনা সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় সেটেলার বাঙালী কর্তৃক সংঘটিত করা হয়েছে বলে সাক্ষাৎকার দেয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত রামেশু কার্বারী পাড়ার অধিবাসী কংজরী মারমা (২১) পিতা থৈংগ্য মারমাকে

১০ নভেম্বর ২০০২ খাগড়াছড়িতে ফানুসবাতি উড়ানো

তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ১০ নভেম্বর ২০০৩, কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৩০.০০ টাকা

Published by Information and Publicity Department of PCJSS from its Central Office, Kalyanpur, Rangamati, Bangladesh.
Phone : + 880-0351-61248
E-mail : pcjss@hotnail.com

Price : Tk. 30.00 Only

১০ নভেম্বর ২০০২ খাগড়াছড়িতে স্মরণ সভায় মৌনব্রত পালন